নাটকসংগ্রহ

নাটকসংগ্রহ

১

সাইমন জাকারিয়া

১৪১৭ জ্যৈষ্ঠ

নাটকসংগ্রহ ❖ সাইমন জাকারিয়া
প্রথম প্রকাশ ❖ মে ২০১০
প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০ বাংলাদেশ। ফ্যাক্স : ৯৩৬২৯৪৯ ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৪৬২৯
চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮, এন.এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ৪০০০। ফোন : ৬১৬০১০
মুদ্রণ ❖ প্যানটোন কালার পয়েন্ট এন্ড এক্সেসরিজ, ১১/৩, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব ❖ লেখক
প্রচ্ছদ ও নামলিপি ❖ আনওয়ার ফারুক
চিত্রাঙ্কন ❖ মাফরুহা বেগম
মূল্য ❖ পাঁচশত টাকা মাত্র

Natoksongroho ❖ Saymon Zakaria
A Collection of Plays
First Published in May 2010
Published by Syed Zakir Hussain ❖ Adorn Publication
22 Segun Bagicha, Dhaka 1000, Bangladesh. Fax : 9362949 Tel : 9347577, 8314629
website : www.adornbd.com e-mail : adorn@bol-online.com
Copyright : Author
Cover design & Lettering : Anwar Farook
Illustration : Mafruha Begum
Price : Tk. 500.00 US $ 15 UK £ 10

ISBN-978-984-20-0147-5
AP-347-2010

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Adorn Publication.

উৎসর্গ

বড়ু চণ্ডীদাস
বাংলা ভাষার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

সূচি

মুখবন্ধ *ix-x*
ভূমিকা *xi-xvi*

নাটক ১৭-৩১২
শুরু করি ভূমির নামে ১৭
বোধিদ্রুম ৪১
মহামানবসংহিতা ৯৫
বিনোদিনী ১৪৩
যুগান্তরো রূপালো নাচি ১৮৫
এ নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট ২২৭
বিদগ্ধ ডানার প্রজাপতি ২৫৭
সীতার অগ্নিপরীক্ষা ২৮৭

মুখবন্ধ

গত চৌদ্দ বছর ধরে আমার লেখা নাটকসমূহের মধ্যে নির্বাচিত আটটি নাটক নিয়ে 'নাটকসংগ্রহ-১' প্রকাশিত হলো। এর মধ্যে অধিকাংশ নাটক বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্য ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; এছাড়া মঞ্চস্থ হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন নাট্যসংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে। একটি নাটক বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতিম নাট্যনির্দেশক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব নাসির উদ্দীন ইউসুফ-এর নির্দেশনা ও আমাদের কালের মঞ্চকুসুম শিমূল ইউসুফ-এর একক অভিনয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিপাইনস্ ও ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। আরেকটি নাটক ভারতের নাট্যশিল্পীর অভিনয়ে ঢাকা ও দিল্লির নাট্যমঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে। এসব তথ্য উল্লেখ করা হলো এই কারণে যে, আমার রচিত নাটকগুলোর একদিকে যেমন সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি আছে তেমনি মঞ্চস্থ হবারও সাফল্য রয়েছে। বর্তমান খণ্ডে স্থান পাওয়া দুটি নাটক এখনও মঞ্চস্থ হয়নি। আমার বিশ্বাস অচিরেই সে নাটক দুটিও মঞ্চে প্রদর্শিত হবে।

পাঠক আমার নাটকসংগ্রহ পাঠে নিশ্চিতভাবেই অনুভব করবেন যে, আমি বহুবিধ বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেছি এবং নাটকের আঙ্গিক নিয়েও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। অধিকাংশ নাটক রচনায় আমি মূলত মিশ্ররীতির আশ্রয় নিয়েছি; তবে, কোথাও মুখ্যত বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির সঙ্গে সংলাপাত্মক নাট্যরীতির সমন্বয় সাধন করেছি– আবার কোথাও সংলাপাত্মক নাট্যরীতির সঙ্গে বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির সমন্বয় নির্মাণ করেছি। এর বাইরে আমার রচিত নাটকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– প্রায় প্রতিটি নাটক-শরীরে গবেষণাধর্মী প্রেরণা রয়েছে।

বিভিন্ন সময়ের নাটক রচনায় বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য অন্বেষণে আমাকে যেমন সচেষ্ট থাকতে হয়েছে তেমনি নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্য ভাষারীতি, শব্দ চয়ন ও যতিচিহ্নের ব্যবহারেও ভিন্ন ভিন্ন রীতি-পদ্ধতি নির্মাণ ও অনুসরণ করতে হয়েছে। সচেতন পাঠকমাত্রেই লক্ষ করবেন– আমার এক এক সময়ের এক একটি নাটকের ভাষারীতি, শব্দ চয়ন ও যতিচিহ্ন, এমনকি বানানরীতিতেও কোথাও কোথাও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো– সব কিছুই ঘটেছে সুনির্দিষ্ট সময়ে নাট্যকার হিসেবে আমার দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে।

আমি সাধারণত নাটক-শরীরে সমাজে প্রচলিত বাস্তবতা প্রকাশে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন চিন্তাকে স্থান দিয়ে থাকি, যা নিশ্চিতভাবে নাটকের পাঠক-দর্শকের চিন্তার স্তরে নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিতে সক্ষম। নাটক রচনায় একটি কথা সবসময় আমি বিবেচনায় রাখি, আর তা হলো– নতুন কোনো কথা বা নতুন কোনো ভঙ্গিতে নিজের বক্তব্য, ভাবনা বা চিন্তাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি তাহলে আমার নাটক রচনার প্রয়োজন কি?

আমার নাটকে চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের কথা যেমন আছে তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিপর্যয়, বাঙালি ও আদিবাসীদের আন্তঃসম্পর্কের দোলাচাল, এমনকি নগরকেন্দ্রিক পেশাজীবী নাট্যচর্চার প্রথম পর্যায়ের অভিনয়শিল্পীদের কথা, কিংবা বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বনাটকের বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তির ভিন্নতর ব্যাখ্যা লভ্য ।

নাটক রচনা ও নাট্য পরিবেশনার অপরাধে স্বাধীন বাংলাদেশে বাবা-মা-ভাই-বোনসহ আমাকে নিজের গ্রাম ছেড়ে আসতে হয়েছিল । আজ আমার নাটকসংগ্রহ প্রকাশ মুহূর্তে সেই উজ্জ্বল পিতার মুখ মনে পড়ছে– যিনি আমার নাটকের জন্য সবচেয়ে বেশি তিরস্কৃত হয়েছিলেন, কিন্তু দেখে যেতে পারলেন না তাঁর সন্তানের নাট্যকার জীবনের এই অনুপম অভিযাত্রা! মা, তুমিও তো আমার নাটকের জন্য বসন্তপুর গ্রামে নিগৃহীত হয়েছিলে । আজ তোমাকে স্পষ্ট করে বলি– আসলে সেই থেকে আমার ভেতর জেগে আছে সুতীব্র এক জিদ– নাটক নিয়েই আমাকে যেতে হবে বহুদূর, যদি পারি– তাহলে নিশ্চয় তোমাদের আত্মাই সবচেয়ে বেশি খুশি হবে ।

সেই যে আমাদের লালু নামের কুকুরটা– সেও তো আমার নাটকের শহীদ, কিংবা বড় আদরে পোষা তোতাপাখি কিংবা মাতৃস্তনের মতোই দুগ্ধদানী গাভী । একদিন বড় স্বার্থপরের মতো তোমাদের গভীর অনিশ্চয়তায় ফেলে গ্রাম ছেড়ে আসি । তারপর দিনে দিনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে একসময় গ্রামে ফিরি । কিন্তু আর তোমাদের দেখা পাইনি । আমার এই নাটকসংগ্রহ প্রকাশকালে তোমাদের নামে দুফোঁটা অশ্রু ঝরে আমার আঁখিমূল ভেঙে । ক্ষমা করো তোমরা– মরণের ওপার হতে– যে নাটকের অপরাধে একদিন আমাদের ভালোবাসা হারিয়েছিলে, আমি যদি সত্যিকারে সে নাটকের জন্যেই এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পাই– তাহলে তোমাদের ভালোবাসার ঋণ কিছুটা হলেও ধন্য হবে জানি ।

'নাটকসংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে স্থান পাওয়া নাটকসমূহ সম্পর্কে একটি কালানু□মিক ভূমিকা লিখে দিয়ে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচক ও নন্দনতাত্ত্বিক অরুণ সেন আমাকে অপরিশোধ্য ঋণের জালে বন্দী করেছেন । আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো তাঁর প্রতি । কেননা, আমার মতো এই সামান্য এক নাট্যকারকে অসামান্য সম্মানে আপনি ছাড়া আর কে কবে ভূষিত করেছে! আপনার মঙ্গল হোক ।

সবশেষে আত্মনাটকসংগ্রহ প্রকাশ উপলক্ষে আমার নাটকের সকল পাঠক এবং নাট্য মঞ্চায়নের সকল উদ্যোক্তা, নাট্যসংগঠন, নাট্যনির্দেশক, নাট্যকলার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, নাট্যকর্মী ও অন্যান্য কলাকুশলীদের প্রতি আমার ভক্তি, প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । একই সঙ্গে বলে রাখি– আমার সকল নাটকই যে কেউ মঞ্চস্থ করার অধিকার রাখেন । তবে, মঞ্চায়নের পূর্বে অনুমতি নিলে কৃতজ্ঞ থাকবো ।

জগতের সবার মঙ্গল হোক ।

২ ফাল্গুন ১৪১৬

সাইমন জাকারিয়া
saymonzakaria@gmail.com

ভূমিকা
সাইমন জাকারিয়ার নাট্য-অভিযান

সাইমন জাকারিয়ার কথা আমি প্রথম শুনি সেলিম আল দীনের কাছে । সেলিমের অনুগামী সহচর হিসেবে তাঁর কথা । ততদিনে সেলিমের সৃজনকর্ম সম্পর্কে আমার উৎসাহ সেলিমের সঙ্গে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতায় পৌঁছেছে । ঢাকায় এলেই অন্তত দিনকয়েকের জন্য ছুটে যাই তাঁর জাহাঙ্গীরনগরের কোয়ার্টারে । সে-রকমই কোনো এক সময়ে ।

সাইমন সম্পর্কে সেলিমের অপার স্নেহ ও প্রশংসাই শুধু নয়, টের পাই তাঁর বিকাশোন্মুখ প্রতিভা সম্পর্কেও দ্বিধাহীন সাধুবাদ । সেই সঙ্গে সাইমনের সম্পাদনা-কুশলতারও তারিফ । আর শেষোক্ত কারণেই হয়তো তাঁর হাতে দিয়েছিলেন নিজের রচনাবলির সম্পাদনার ভার । মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশিত খণ্ডে-খণ্ডে 'সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র' বের হতে লাগল । প্রথম দুটি খণ্ড সেলিম নিজের হস্তাক্ষরে লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে । তাঁর অকাল মৃত্যুর পর তৃতীয় খণ্ডটি পৌঁছে দেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু কলকাতায় এসে । অবশেষে চতুর্থটি পাই ঢাকায় এই সেদিন সাইমনের কাছ থেকে । একেক করে সমগ্র রচনার সবকটি খণ্ড পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকাটাই এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে আমার ।

দেখাসাক্ষাৎ হয়তো হয়েছে আগে, কিন্তু সাইমন জাকারিয়ার সঙ্গে আমার একান্ত জানাশোনার শুরু সেলিমের তিরোধানের পর, ঢাকা থিয়েটার আয়োজিত সেলিমের জন্মোৎসবে । সেই উপলক্ষে সেমিনারে অংশ নিয়ে সাইমন যে আলোচনা করেছিলেন, তাতেই প্রথম তাঁর মেধা ও মননের পরিচয় পাই । আর হাতে পাই প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি বই এবং তাঁর রচিত ও অপ্রকাশিত কিছু নাটকের পাণ্ডুলিপির একটি সংগ্রহ ।

ইতিমধ্যেই অবশ্য প্রথমত সেলিমের কাছে, এবং পরে আরও কারো-কারো কাছে, বস্তুত বিভিন্ন সূত্রে, লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণায় সাইমনের পারঙ্গমতার কথা কিছুটা বিস্তৃতভাবে জানতে পেরেছি । বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে এই তরুণ গবেষক কী বিপুল পরিশ্রমে শুধু লোকনাটকের সংগ্রহ নয়, তাদের পটভূমি তথ্য ও পরিবেশের বিবরণ জড়ো করেছেন– এবার তার পরিচয় পাই 'বাংলাদেশের নাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য' বইটিতে । লেখার গুণে জীবন্ত ও মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে তাঁর এই পারস্পরিকতায় সংলগ্ন চর্চা । এর আগে আমি জামিল আহমেদের 'অচিন পাখি ইনফিনিটি' বইটি পড়েছি– সেলিম আল দীনের মধ্যযুগের নাট্য বিষয়ক ইতিহাস ও তত্ত্বভাবনার কথা জেনেছি তারও আগে– আন্দাজ করি, সাইমন জাকারিয়ার ঋণ তাঁদের কাছে আছে অবশ্যই । কিন্তু তাঁর এই বইতে এ-সবেরই এবং হয়তো আরও কিছুর যে

বিস্তার ও বিশ্লেষণ আছে, তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ও ভাষার ধরতাইতে যেন বাঙালি পাঠকের কাছে আরও অন্তরঙ্গ, আরও প্রাঞ্জল হয়ে পৌঁছোয় ।

সেলিমের নাটকের বাইরে ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনা-তালিকায় আরও যে দু-চারটি নাটক মাত্র আছে, তার মধ্যে একটি সাইমন জাকারিয়ার লেখা 'ন নৈরামণি' ২০০২-এর প্রযোজিত এই নাটকের নির্বাচন থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় সাইমনের রচনাশক্তিতে এই নাট্যগোষ্ঠীর কতটা আস্থা । সেখানে চর্যাপদের কাহ্নু-ডোম্বী চরিত্রের রূপায়ণের এই অসামান্য প্রয়াসই তুলে ধরে প্রাচীন বাংলা ও বৌদ্ধ ইতিহাস বিষয়ে সাইমনের ঝোঁকার দিকটি । এই নাটকের প্রযোজনা আমি দেখিনি । কিন্তু জেনেছি ও পড়েছি 'চর্যাপদ অবলম্বনে একটি বর্ণনাত্মক নাটক' হিসেবে বিবৃত 'বোধিদ্রুম' – আগের নাটকটিরই পরিবর্তিত নাম, পরিমার্জিত রূপ । এবং সেটাই ২০০৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক' বইতে গৃহীত হয়েছে । 'বুদ্ধনাটক'-এর স্বরূপ সন্ধানে সাইমন ওই পদগুলির যথাসাধ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন– তার গায়নরীতি, তার নৃত্যগীত, তার সাজপোশাক, তার বাদ্যযন্ত্র, তার অলঙ্কার ইত্যাদি কোনো বিষয়ই বাদ দেননি । এই সূত্রেই নাট্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নির্বাচিত চর্যাপদের মূল পাঠ, তার বঙ্গানুবাদ, নাট্য-লক্ষণ ইত্যাদি । আর তারই বাতাবরণে চর্যাপদ অবলম্বনে তাঁর মৌলিক নাটক 'বোধিদ্রুম' । এবার এই বইতে না-দেখা নাটকটির টেক্সট পড়ার সুযোগ পাওয়া গেল । বুঝতে পারা গেল, সাইমনের কাছে গবেষণা ও সংকলন-কর্ম, সন্নিহিত তথ্যের সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা এবং তাঁর নিজের নাটক-রচনা– সবই অখণ্ড একটি নির্মাণ ।

আর সাইমন যে তাঁর রচনাকে চর্যাপদ অবলম্বনে একটি 'বর্ণনাত্মক নাটক' বলে উল্লেখ করেছেন, তারও তাৎপর্য টের পাওয়া গেল । সেলিমের শিষ্য সাইমন গোড়া থেকেই পাশ্চাত্যের দৃশ্যভাগ ও সংলাপসর্বস্ব নাট্যের অনুসারী যে হবেন না তা তো বোঝাই যায় । কাহিনীর বর্ণনা ও চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তির অঙ্গাঙ্গিতা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা নাট্যের স্বধর্ম– তাকেই তো বাংলাদেশের নিজস্ব নাটক বলে গণ্য করেছেন সেলিম আল দীন । তা নিয়ে তত্ত্বে পৌঁছেছেন, তার চেয়েও বড় কথা তার অনুপ্রেরণায় নিজে অবিস্মরণীয় নাটক লিখেছেন একের পর এক । এ সবই ঘটেছে সাইমনের চোখের সামনে, কিংবা বলা যায় জানার পরিধিতে– তাঁকে শিক্ষা ও প্রেরণা জুগিয়েছে নিয়ত । 'বোধিদ্রুম' নাট্য-আখ্যানটি পড়তে বসেও তা স্বতই টের পাওয়া যায় । নাটকটি শুরু করার আগে সাইমন যে ছোট্ট ভূমিকাটুকু লিখেছেন 'চর্যাপদের নাটক-সম্ভাবনা' এই উপ-শিরোনামে, তাতে সুন্দর ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, পদগুলির বিষয়বস্তুতে আপাততভাবে বিচ্ছিন্নতা থাকলেও, এর মধ্যে কোথাও কোথাও নাটকের উল্লেখ বা ইশারা আছে, কোথাও কোথাও কাহিনির মধ্যে রয়েছে নাটকের বীজ– অবশ্যই বাংলার নিজস্ব নাটক ।

আমরা জানি, 'বুদ্ধ নাটক' বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এই নাটকে শুধু বুদ্ধের জীবনকাহিনিই নয়, বাংলার লোকসমাজের সাধারণ নরনারীর জীবনকাহিনিও বিধৃত । তাই সাইমনের বুদ্ধ নাটক 'বোধিদ্রুম'-এর শবরশবরীর জীবন উঠে এসেছে চর্যাপদের ওপর ভর করে । তবে তার সঙ্গে অবশ্যই সবসময় মিশে থেকেছে বুদ্ধের মন্ত্র, বুদ্ধের অনুষঙ্গ । আর তারই পরতেপরতে পাই প্রাচীনকালের বাঙালির সুখ-দুঃখে ভরা প্রাত্যহিক, প্রেম ও দাম্পত্যের নানা ধরন, বিবাহের প্রসন্ন বিবরণ, আবার পাশাপাশি জীবনযাপনের নানা বিড়ম্বনা । সাইমন যে অসাধারণ কুশলতায় চর্যাপদ থেকে আহরণ করে তাদের সাজিয়েছেন, এবং প্রাচীন বাংলার পরিবেশ ও প্রাচীন বাঙালির সত্তাপরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার তুলনা নেই । চর্যাপদের ভাষাপ্রয়োগে এই সমন্বয় হয়ে উঠেছে আরও বাস্তব ।

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে লোকায়ত অনুভবের সঙ্গে বোধিচিত্তের অভিমুখীনতার যে নিরন্তর ঐক্য ঘটে, তাকেই নাট্যাবয়বে ব্যবহার করেছেন সাইমন । এতেই কাহ্নু ও ডোম্বীর সম্পর্কের বিভিন্ন স্তরের ব্যঞ্জনা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় পাঠকের কাছে, আন্দাজ করি দর্শকের কাছেও । ইন্দ্রিয়সুখের মধ্য দিয়েই বোধিচিত্তে পৌঁছোনোর যে নির্দেশ সহজিয়া গুরু বজ্রাচার্য দিয়েছেন, সেটাই এ-নাটকের পথ । বিবাহ-উৎসব ও আচার তাই একটা বড় স্থান জুড়ে থাকে । তারপর বিবাহোত্তর প্রণয়, আসক্তি– কাহ্নুকে গৃহে বেঁধে রাখার জন্য মায়ের চেষ্টা, ডোম্বীর চেষ্টা! সবকিছুকে ব্যর্থ করে সে কোথায় চলে যায় কোন মোক্ষলাভের লক্ষ্যে । ফিরেও আসে কবি পরিচয়ে ধনী আরেক কাহ্নু সমাজশাসনে লাঞ্ছিতা প্রেমিকা ডোম্বীর কাছে । তখন ভালোবাসার টানে, নিষ্ঠুর নিষাদকে তুচ্ছ করে, হরিণ ও হরিণীর রূপে, তার সঙ্গী পরস্পরের । এভাবেই গেঁথে তোলেন সাইমন জাকারিয়া চর্যার পদ থেকে আবহমান বাঙালির, বিশ্বের মানুষের, প্রেমগাথা । চর্যাপদকে নিয়ে অনেকেই তো লিখেছেন আধুনিক কবিতা বা কাহিনি, এ-বাঙলায় বা ও-বাঙলায়, কিন্তু সাইমনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বা সার্থকতার তুলনা নেই– যা অভিভূত করেছে আমাদের উৎপলকুমার বসুর মতো কবিকেও ।

তবে, এভাবেই চর্যাপদ নিয়ে তাঁর পরি□মণ যেন শেষ হয় না কখনই– এই সেদিনও নেপালে গিয়ে সে পদেরই অভিনয়ের কিছু কিছু সূত্র খুঁজে বেরিয়েছেন এবং পেয়েও গেছেন তার নানা উৎস নানা ভাবে । এরই অনুসরণ ঘটবে পরবর্তী প্রয়াসে তাও জানতে পারি তাঁর মুখে ।

সাইমনের 'বোধিদ্রুম' সম্পর্কেই আমার মুগ্ধতা অশেষ হলেও, তাঁর আরও কয়েকটি নাটককে বিস্ময়কর মনে হয় এ কারণে যে, কত বিচিত্র বিষয়কে তিনি তাঁর নাট্য-আখ্যানের আদর্শে রূপ দিয়েছেন অনায়াস কুশলতায় । অবশ্য এর আগেই, ১৯৯৭ সালে লিখেছেন তিনি 'শুরু করি ভূমির নামে', যাকে বলেছেন 'নতুন দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক দলিল' । আদিমাতা ভূমির বন্দনা দিয়েই এর শুরু । তারপর বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের প্রত্যক্ষতার সঙ্গে মেলানো হয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে । নদী, পথভোলা নৌকো, জল, রুমালের প্রতীকে ভাসমান নারীপ্রতিমা, মাঝিমাল্লার স্বপ্নের কন্যা এবং সে কন্যাকে নিয়ে বাসনা-কামনার দ্বন্দ্ব– এর মধ্য দিয়েই স্বদেশের বাস্তব ও মায়া যে ভূমির কাহিনীকে উন্মোচিত করে, তার শেষত পৌঁছোয় মুক্তিযুদ্ধের পরিণামী

স্বপ্নভঙ্গে। তা থেকে অন্য মুক্তির প্রেরণাও খুঁজে পাওয়া যায় 'ভূমির নামে' নাট্যকৃতীতে। একজন তরুণ নাট্যকারের প্রথম নাটকে কল্পনার এই বিস্তার ও স্বদেশচেতনার স্বচ্ছতা সত্যিই অকুণ্ঠ প্রশংসারই যোগ্য।

এর পরেই ২০০১-এ 'মহামানবসংহিতা' নাটকেও দেখি সমকালীনকে সাইমন এনেছেন পৌরাণিক কাহিনির পথ ধরে। বিশ্বম্ভর চৈতন্য, হযরত মুহম্মদ, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে শুরু হয়েছে তাঁর এই মহামানবসংহিতা। 'শুরু করি ভূমির নামে'-তে সংলাপ-নির্ভরতা ছিল স্পষ্ট। এখানে অনামা সংলাপেই কাহিনি এগোয়– সংলাপের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে ছাপিয়ে যায়। স্বনির্ভর কাহিনি, শব্দটীকা ও ব্যাখ্যাও চলে আসতে পারে। ক্রমশই তা রূপক হয়ে ওঠে সাম্প্রতিকেরও। এমন কী কমিউনিস্ট আন্দোলনের। সবাইকে সবকিছুকে একটা জমিতে দাঁড় করিয়ে দেখতে চান 'বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বাম রাজনীতি ব্যর্থ হবার কারণ অন্বেষণ'। যে-বিস্তারকে আমরা আগের নাটকেই দেখেছিলাম, তা যেন এখানে জটিল ও সাহসী রূপ পেল।

বেশ কিছু বিরতির পরই পরপর আরও কয়েকটি নাটক পেলাম সাইমনের কলমে। ইতমধ্যে তাঁর নাটকের কাঠামোও অনেক পরিণত হয়েছে। 'বোধিদ্রুম' থেকেই দেখেছি প্রথাগত সংলাপ বর্জনের ক্রমিকতায় আখ্যাননাট্যের আদলটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ২০০৬-এ 'যুগান্তরো রূপালো নাচি'-তে তাকেই আঁকড়ে ধরেন সাইমন। নাটকের নামটি অরণ্যবাসী উপজাতি ওরাওঁদের একটি গানের একটি চরণ থেকে উদ্ধৃত। এখানেও আবার সেই নতুন জমিতে পা বাড়ানো। বাংলাদেশের উপজাতিদের সুখ-দুঃখে ভরা জীবন ও অভিজ্ঞতাই বিষয়– তাদেরই ভাষায়, কথাবার্তায়, গানে। ক্ষয়িষ্ণু নৃগোষ্ঠীর অনেক সম্প্রদায়ের কথাই উঠেছে, তবে মূলত ওরাওঁ, গাঁরো ও চাকমা। সেই সঙ্গে দুই বাঙালি তরুণ-তরুণী গবেষক এই ওরাওঁদের মধ্যে এসে কী দেখল, কী অনুভব করল, হয়তো 'বিমূঢ় প্রহসনে ভরা' সেই বিন্যাস। এখানেও লেখকের ওই ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিতেই উপজাতিদের জীবনের লোকায়ত বাস্তব প্রাচীন থেকে অধুনায় পৌঁছোয়। অরণ্যবাসী উপজাতি পীড়নের আদ্যন্ত ইতিহাস, তাদের জীবন ও পরিবেশের ক্ষয়ের ছবি। পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় ১৯৯৭-এ লেখা সেলিম আল দীনের 'বনপাংশুল' নাটকটির কথা। সেখানেও লুপ্তপ্রায় ভগ্ন-অরণ্যের অধিবাসী নৃগোষ্ঠীদের নিয়েই লেখা। রচনাশৈলীর মানদণ্ডের তুলনীয়তার কথা ওঠেই না। তবু, সাইমনের লেখাটির স্বতন্ত্র চলনও উপেক্ষণীয় নয়।

এর পরেও সাইমনের নাট্যরচনায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈচিত্র্যের ঝোঁক বারবার আমাদের সচকিত করে। এক বছরের ব্যবধানে উইলিয়ম শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' এবং ফ্রানৎস কাফকার 'মেটামরফোসিস'-এর মতো দুটি বিদেশি এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের রচনাকে যে নাট্যরূপ দেওয়ার কথা তিনি ভাবতে পারলেন সেটাই তো যথেষ্ট বিস্ময়কর। দুই যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যকৃতিকে তিনি প্রাচ্যের গড়নে ঢেলে সাজাতে চাইলেন। শেক্সপিয়রের নাটকের সঙ্গে তাঁর নাটকের মিল

সামান্যই। তাই তো সাইমনের 'এ নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকে শেক্সপিয়রও একটি চরিত্র। ট্র্যাজিডির বদলে কৌতুক-মেশানো স্বরেই তার বিস্তার। আর আধুনিকতার কাফকার আখ্যানকে তাঁর নিজের নাট্যাদর্শের ধারাবাহিকতায় রূপ দেওয়ার ভাবনা তো আরও দুঃসাহসী। সে দুঃসাহস তাঁর আছে, তাঁর গ্রহণে বর্জনে ও স্বকীয় নির্মাণে। সমানই স্বাধীন তাই কাফকা অবলম্বনে 'বিদগ্ধ ডানার প্রজাপতি'। রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের টেস্টামেন্টে যে সংলাপ-নির্ভরতা আছে, তাকে বর্জন করে আখ্যানমূলক নাটকের গড়নেই ওই নাটকটি লিখলেন সাইমন– নিয়ে এলেন এমন কী কবিতা ও গান। গ্রেগর সামসা-র আত্মকথনের কাঠামোর মধ্যেই গড়ে উঠল অনেক নাট্যসম্ভাবনা। নাটকটির একেবারে গোড়ায় নজরুলের গান এবং শেষে জীবনানন্দের কবিতাংশের ব্যবহার যখন সামসা-র স্বপ্নভঙ্গকে নিয়ে যান নাট্যকার আরও ব্যাপক কোনো বোধে, তখন বুঝতে পারি সাইমনের তাগিদটা ঠিক কোথায়।

সবশেষে সাইমনের যে রচনাটি হাতে পাই, তা 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'। বিচিত্র নিরীক্ষার পর তিনি যেন আবার ফিরে এসেছেন আখ্যান-নির্ভর কথকতার জগতে– যেখানে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের, পরন্তু রামায়ণের লোকপরিবেশনায় গ্রাহ্য সীতা-পুরাণের সবচেয়ে অনিবার্য অংশটির বর্ণনা এবং সীতার স্বগত সংলাপ মিশে গেছে বাঙালির মৌল নাট্যরূপের বিন্যাসে, যার দিকেই প্রধানত দৃষ্টি সাইমনের। এখানেও প্রাচীন কাহিনির পুনরুক্তি শুধু নয়, তাকে দেখি লেখকের নৈতিকতা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে, বিশেষত যখন সীতাকে বলতে শুনি : 'হে কবি বাল্মীকি, তুমি আমার জীবনে স্বস্তি দাও, শান্তি দাও আর শ্রীরামচন্দ্রকে এনে আমার জীবনে মিলিয়ে দাও।' সার্থক দাম্পত্যের যে স্বপ্ন তারই বৈপরীত্যে নারীত্বের উপেক্ষা ও লাঞ্ছনার সত্য উঠে আসে যদিও হয়তো ততটা তীক্ষ্ণভাবে নয় যতটা আমরা পেয়েছিলাম ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনা 'বিনোদিনী'তে– সাইমনের গ্রন্থনায় ও মৌলিক রূপান্তরে। তবু, 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'-র সাম্প্রতিক অভিনয় দিল্লির দর্শকদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে এমনও শুনি।

এভাবেই সাইমন জাকারিয়ার গবেষণার কাজ ও সৃজনশীল রচনা থেকে নতুন নতুন প্রত্যাশা তৈরি হয় আমার কাছে। এক হিসেবে সৃজনকর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে প্রাথমিক যাত্রাই তো এখনও এই তরুণ লেখকের। তবু এরই মধ্যে যে বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের সাক্ষ্য রাখেন তিনি, তা আমাদের গভীর তৃপ্তি দেয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগে তাঁর নাটকের অভিনয় হচ্ছে এই খবর যখন পাই, তখন বুঝতে পারি, সাইমনের স্বীকৃতি বেশ প্রসারিত। প্রসঙ্গত দুটি নৃত্যনাটকের মঞ্চপ্রক্রিয়ার কথাও আমরা শুনি। এমনকী তাঁর বহুমুখীনতার প্রমাণ হিসেবেই সম্প্রতি চোখে পড়ে গল্প ও কবিতা রচনাতেও তাঁর পদক্ষেপ। এবং সেখানেও যে-সাইমনকে আমরা গবেষণা ও নাট্যরচনায় চিনি, যেন তারই অনুক্রম। 'কে তাহারে চিনতে পারে' আখ্যানে যে লালনপন্থী সাধুর কথা বলেন তিনি, তার সঙ্গেই মেলাতে পারি বিখ্যাত মোহিনী মিলের বেকার শ্রমিকের জীবনের দুর্ভাগ্যকে। এটাই তো তাঁর লেখক হিসেবে ব্যক্তিস্বরূপেরও

নিশানা– সাধকভাবনার সঙ্গে প্রত্যক্ষকে মেলানো। ‘সদানন্দের সংসারে’ কবিতার বই, এবং সেখানেও নাট্যকার সাইমনেরই উচ্চারণ। গবেষণা ও স্বাধীন রচনার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর যে জীবনবোধ, তার প্রতিধ্বনি।

অর্থাৎ, সৃজনে বা মননে কোনো কাজই তাঁর কাছে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর নাটকগুলির স্বভাব ও আঙ্গিক যে □মশই পরিণতির দিকে এগিয়েছে তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। অন্তর্বর্তী পাশ্চাত্য-অনুকৃতির যুগ ডিঙিয়ে বাঙালির নিজস্ব নাট্যরূপকে পুনরাবিষ্কারের যে অভিযান অনেকটা শুরু হয়েছে বাংলাদেশেই, তার নানারকম প্রকৃতি আছে, সেলিম শিষ্য সাইমনের শুদ্ধতাশ্রয়ী নাট্যভাবনা ও নাট্যকৃতিতে সেই ইতিহাসেরই একটা স্বতন্ত্র ধরনের সার্থকতা। নিজের তাগিদেই কালানু□ম পাঠের যে চেষ্টা হলো এখানে, তা-ও তো সে-কারণেই। সব কাজের মধ্যে একজন সাইমন জাকারিয়াই আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। আর সেখানেই গড়ে ওঠে এই অনুজের প্রগতিতে অগ্রজের গভীর আস্থা ও উন্মুখ প্রতীক্ষা।

২৬ নভেম্বর ২০০৯
কলকাতা

শুরু করি ভূমির নামে

প্রসঙ্গকথা : নতুন দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক দলিল

কেন *শুরু করি ভূমির নামে :* এ প্রশ্নের একটি যুতসই ফয়সালা নাটকটির বন্দনাংশে মিলবে। বন্দনার সরল উক্তিতে পুরাণ অনুসারে মানুষকে মাটি বা ভূমিজ সন্তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সেই ভূমিরই দখলদারিত্ব নিয়ে ভূমিজ মানুষের দ্বন্দ্ব ও আত্মক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রে ভূমির প্রতি অধীনতা স্বীকারে বলেছি—*শুরু করি ভূমির নামে*। কেননা, ভূমিজ ফসলে আমি বাঁচি, আমার বাবা এখনও এক ভূমিদাস—আর আমি নিজেকে স্বয়ং ভূমিপুত্র ভাবি।

শুরু করি ভূমির নামে নাটকে রজস্বলা ভূমি ও নারীর মধ্যে একটা গোপন ও অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা আছে। যে চেষ্টায় লবঙ্গ নামের একটি নারী চরিত্রের সৃষ্টি।

আমরা ভূমি হতে উৎপন্ন হয়েছি বলে ভূমিই আমাদের আদিমাতা, অন্যদিকে নারী হচ্ছেন আমাদের প্রত্যক্ষমাতা, মাতৃসম্পর্কে ভূমি ও নারীকে তাই এক ও অদ্বৈত সূত্রে দাঁড় করানো যায়। অত্র নাটকে আমি সেই কৌশলকেই ব্যবহার করেছি। ভূমির প্রতি মাতার মতো যে মমতার সম্পর্ক বা বোধ আমাদের থাকা উচিত, তা আজ প্রশ্নের মুখোমুখি, নারীর প্রতিও আমাদের অবস্থান একই—যেটা কিছুতেই স্বাভাবিক বা সম্মানের নয়। এইসব দেখে-শুনে আমি বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডকে বেছে নিয়েছি—যার আছে একটি গৌরবময় ভূমি-মাতৃ মুক্তির ইতিহাস। কিন্তু সেই ভূমি-মাতাকে আমরা কী আমাদের শিরস্থানে স্থান দিতে পেরেছি? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের জন্য লবঙ্গকে দাঁড় করিয়েছিলাম পথভোলা মাঝিদের পথপ্রাপ্তি বা মুক্তির উপায় হিসেবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে লবঙ্গ কন্যা তাদের লোভ ও কামনার স্বীকার হয়ে ওঠে। আজ এই বঙ্গমায়ের অবস্থানও কী একই নয়?

শুরু করি ভূমির নামে এবং মুক্তিযুদ্ধ : প্রচলিত পথে নয়, সম্পূর্ণ বিকল্প একটি পথে মুক্তিযুদ্ধকে দেখবার অভিপ্রায়ে এক সময়ে কত রাত যে নিদ্রাহীন কেটে গেছে তার হিসেব আজ আর আমার কাছে নেই। সেই নিদ্রাহীন রাতগুলোর কসম করে বলতে পারি—আমি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি ঠিকই, কিন্তু বহুবার শহীদের ছবি, রক্তাক্ত জামা-কাপড়, ভাঙা-চশমা, ঝর্ণা কলম, লুঙ্গি, সাইকেল, গামছা, টাইপ রাইটার, হস্তাক্ষর, জুতা-স্যান্ডেল, বই, চিঠি, ঘড়ি, ট্রানজিস্টার, গেঞ্জি, পাণ্ডুলিপি ও প্রতিজ্ঞার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের স্বপ্নের কথা ভেবে, ত্যাগের কথা ভেবে, এই দেশকে দেখে (!) কেঁদেছি, হাহাকার করেছি। তবুও আমি ভেবেছি তাঁদের কান্না-ঘাম-রক্তের অস্তিত্ব আজও এই ভুখ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নাই। তাইতো নাটকের মাঝিদের মতো একসময়

আমি বাংলার ঘাস-মাটির ঘ্রাণ ও স্বাদ নিয়ে ছুটে গেছি সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, টঙ্গি। আর বন্ধুদের অগোচরে এক এক চিমটি মাটি তুলে নিয়েছি জিভের উপর—সাথে সাথে মুক্তিকামী মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও স্বপ্নের প্রতিধ্বনিতে শিউরে উঠেছি। মুক্তিযুদ্ধের যদি কোনো টেরাকোটা না থাকে—তবে কী তার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ভূমির স্বাদ-ঘ্রাণকে গুরুত্ব দেওয়া হবে না? তখন নতুন দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক আলো লেগে মাটিতে লুপ্ত অস্থিগুলো কী ঝিলিক কেটে উঠবে না? কখনো মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের শ্রুতিকথার চেয়ে, ইতিহাসের কাগুজে পৃষ্ঠার চেয়ে আরও বেশি বিশ্বস্ত দলিল মাটি খুঁড়ে পাওয়া ওই অস্থিগুলো, রক্তমাখা কাপড়গুলো, মাটির ঘ্রাণ এবং স্বাদ। সেই সূত্রেই রচিত হয়েছে *শুরু করি ভূমির নামে*। উল্লেখ্য, নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে কুষ্টিয়ার গ্রামীণ জীবনের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমী (তরুণ লেখক প্রকল্প) কর্তৃক প্রকাশিত *শুরু করি ভূমির নামে*র মূল পাণ্ডুলিপি মঞ্চের প্রয়োজনে পুনর্লিখন করেছি। এটিই পুনর্লিখিত *শুরু করি ভূমির নামে*। বর্তমান রূপটি কুষ্টিয়ার বোধন থিয়েটার সেলিম আল দীন ও নাসির উদ্দীন ইউসুফের প্রযোজনা উপদেষ্টায় এবং সাইদুর রহমান লিপনের নির্দেশনায় ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চে আনে। বোধন থিয়েটার প্রযোজিত *শুরু করি ভূমির নামে* নাটকটি আইটিআই নাট্যোৎসবে ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে।

শুরুর আগে

যার পা মাটির যত গভীরে সে তত সৃজনশীল। যার হাত পা দুই-ই মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত সে আরও সৃজনশীল। যে বুক দিয়ে মাটির স্পন্দনে নিজের স্পন্দন মেলাতে পারে আর সেই অনন্ত বিস্তৃত স্পন্দনের অনুরণন অন্যকে শোনাতে পারে সেই-ই স্রষ্টা।

প্রার্থনা সঙ্গীত

চারিদিকের নীরব বাতাস–কথা কও
চারিদিকের নীরব বৃক্ষ পাখি–কথা কও
হে প্রকৃতি কথা কও। কথা কও। কথা কও॥
সকল প্রপঞ্চ খুলে আমাদের এই পথভ্রমের
মুক্তি দাও। মুক্তি দাও। কথা কও। কথা কও॥
হে সত্য হে সুন্দর আমরা তোমার দাস
আমাদের আমাদের তুমি করো না হতাশ॥

বন্দনা

বন্দনাতে করলাম আমি
ভূমিকে সালাম
ও ভাই–মাটিকে সালাম
এই মাটিতে মানব সৃষ্টি
কহিছে কালাম
সেই না মানব মাটির দেহ
ছিল যাযাবর
হাজার বছর ন্যাংটা ছিল
ছিল না যে ঘর
এমন করে হাজার বছর
পশুর পিছে ঘুরে
বনের পশু শিকার করে
আহারও যে করে
শিকার শিকার বনের পশু
শিকারও হলো
সেই না পশুর কাঁচা মাংস
তারা যে খেলো
বৃষ্টি হলে যায় কোথা
গুহাতে ঢুকিলো
দিন যায় রাত যায়
শীত যে আসিলো

সেই না মানব মাটির দেহ
শীতে কি করিলো
গাছের পাতায় গাছের ছালে
দেহকে ঢাকিলো
শিকার না হইলে শেষে
উপোসও থাকিলো
গুহার পাশের গাছের ফল
ছিঁড়িয়া খাইলো
দিনে দিনে হাজার হাজার
বছরও কাটিলো
পাথর ঠুকে শুকনো কাঠে
আগুনও জ্বালিলো
শিকার শিকার অনেক কিছু
শিকার হলো ভূমি
সেই ভূমিতে প্রথম মানব
আবাদ করো তুমি
এই না মানব মাটির দেহ
ছিলে যাযাবর
ভূমি ছিল পায়ের তলায়
ছিলে পরস্পর
এই ভূঁই আমার
ওই ভূঁই আমার
কাটাকাটি হয়
শুরু করি ভূমির নামে
অধীন সাইমন কয়
শুরু করি ভূমির নামে
সবারে জানাই॥

আখ্যান শুরু

একবার ওই গড়াই উপকূলে এক নৌকা বাইচের আসর বসেছিল—আসরের শত শত লোক সেদিন গড়াই বক্ষে বাইচ নৌকার ঘণ্টাধ্বনিতে-গানে-গতির উন্মাদনায় মাঝে মাঝেই 'হই হই' করে উঠছিল—কিন্তুক এরই মধ্যে সেদিন সন্ধ্যায় কোথা থেকে এক উন্মত্ত বায়ুচ এসে উড়ায়ে দেয় চরের রূপামুখীবালি—সাথে সাথে সাদা-শুভ্র চিকচিকে বালির আঘাতে সকলের চক্ষু রুদ্ধ হয়—আর তারা হস্তদলিত করতে থাকে নিজেদের চক্ষুদ্বয়—বালিতে-দলনে রুদ্ধচোখ ভেঙে পানি নেমে আসে—তারা অন্ধ হয়ে ওঠে—

সহসা আকাশে ছুটে আসে গাঢ় কালো কালো মেঘ—সে-মেঘের ছুটোছুটিতে হঠাৎ যেন রাত্রি নেমে আসে—সকল দর্শক এমন কি বাইচের মানুষও মেঘে-বাতাসে এবং বালিতে দিশেহারা হয়ে ফিরে চলে ঘরে—অথচ—অথচ একটি নৌকা গতিভ্রমে ছুটতে থাকে দূর থেকে দূরে—ওই যে পথভোলা সেই নৌকাটি—ওরা চলছে উন্মত্ত ঢেউ ভেঙে ভেঙে—কৌতূহলী চক্ষে ওদের আনন্দ-আগ্রহ যেন উছলে ওঠে বৈঠার ছলকে ছলকে—

হেইয়া হো-ও ... হেইয়া
হেইয়া হো-ও ... হেইয়া॥
বেগমতি নদীর বুকে
বৈঠা মারো ... হেইয়া।
নদীর যেমন ইচ্ছেরে ভাই
সেই দিকে যাও... হেইয়া॥

ধনুকতীরের গতিতে এরা ছিটকে পড়ে গড়াই থেকে পদ্মায়—পদ্মার উন্মত্ত স্রোত থেকে কিছুতেই ফেরানো যায় না একে—তাই তো সাহসী কণ্ঠে নৌকায় ওঠ গান—

আকাশ দেখে বাতাস দেখে
স্রোতের বুকে বুঝে-সুঝে
বৈঠা মারো ... হেইয়া।
হেইয়া হো-ও ... হেইয়া।
আঁধার কেটে সামনে যেতে
জীবন নদী ভেঙে ভেঙে
বৈঠা মারো ... হেইয়া।

কূল-কিনারাহীন এইপথ তাদের চোখে বুঝি বেঁধে দিয়েছে সন্ধানী এক ঘোর—তাদের সরদার একনিষ্ঠভাবে সামনে কিছু দেখার চেষ্টা করে—হঠাৎ যেন তার চোখে কিছু বাঁধে—তাই তো সকলকে তিনি সামনে দেখান—

করিম : ওই ও-ই দ্যাক... উ-ই সামনে...

রমজান : ওহো গামচা ভাসে কালা এক গামচা ভাসে

গাজী : হ' রে হ' পানির 'পার কালা দেকি... তয় উডা গামচা না শীতলপাটি বুঝতি পাত্তিচ-নে

হারু : আরে রাকো—উডা গামচা-উ না পাটি-উ না... পানির পার রা'ত ভাসে আমরা তাই কালা দেকি

গাজী : তা'লি ওই পানিই কালা

রমজান : অ্যা পানি কালা... পানি কালা হোবি ক্যা... পানি কি কালি খাইচে যে পানি কালা হোবি

করিম : তা খাবি ক্যা আর খাবিই-বা কোনতে... আমি কই কি উডা সেই রুমা'ল হোতি পারে—সাগরে ভাসা সেই রুমা'ল... যে রুমালি আঁকা ছিল সত্যি সত্যি গাচ পাকি আর গাঙ... সে রুমালির জ্যান্ত পাকিরা গান গায়—তাতেই যিন বাতাস হয়... রুমা'ল ভাসে আর ভাসে—সাত সাগরের গাঁও ছুঁয়ে ছুঁয়ে শ্যাষে যে সাগরে থামে... সে জা'গার রাজকন্যা ছুটে আসে—রুমালির ধারে... তার পাচে ছুটে আসে রাজ্যির লাটেল-বীর সব... রাজকন্যা পিচন ফিরে চায় আর দ্যাকে—রাজ্যির বীর-লাটেল সব তার পাচে... রাজকন্যা কয়—'তুমরা আয়েচো ক্যা... আমি কি তুমাদের ডাকিচি'—রাগে রাজকন্যা ফুসফুস করে আর কয়—'বড়বীর রুমালির পা'র যাও'—বড়বীর ঝাপায়ে প'ড়ে দোড়োতি যায়... পারে না... আলগোচে রুমালির বুকটা যিন পানি খাতি যায়... বড়বীর উপরি উঠতি চায়... পারে না... এক সুমায় তার পুরো শরীল পানির মুদি যায়... সে হাবুডুবু করে... তারপর আর তারে দেকা যায় না... হাবুডুবুও দেকা যায় না... ভুস করে ভাসে ওটে রুমা'ল... রাজকন্যা কয়—'মাজোবীর লাপিয়ে পড়ো'—মাজোবীর লাপায়ে পড়ে... তারেও দেকা যায় না... রাজকন্যা কয়—'ছোটবীর তুমিও ঝাপাও'—ছোটবীর কয়—'ঝাপাবো, কিন্তুক আমার যে ভয় করচে... বুক কাঁপচে'—রাজকন্যা কয়—'অ্যা ভয় করচে, ঝাপাও কচ্চি... ঝাপাও'—ভয়ে থুরথুর কাঁপে ছোটবীর... কিন্তুক উপায় দ্যাকে না—সেও লাপিয়ে পড়ে আর আগের মতোই রুমালির নিচে হারা যায়... সব বীর হারা গেলি রাজকন্যা ভাবে—রুমালি ঝাপায়া উরা কুতায় গেল রুমা'ল ওদের কুতায় দিলো... এমন সুমায় এট্টা পাকি আসে... সে রাজকন্যারে ডাকে আর কয়—'আরে ও রাজকন্যা... রুমালি আ'সো... রানি হবা... আরে ও রাজকন্যা'—পাকির ডাকে রাজকন্যা ঝুপ ক'রে ঝাপায়ে পড়ে রুমালির পা'র... ইবার রুমা'ল ডোবে না... পানির পা'র ভাসে... রাজকন্যা যিন সুলার নাহাল পাতলা... মনে তার রঙের বাহার... রাজকন্যা তাই রানির সাজে সাজে আর রানির সাজে ঘোরে... গাঙে না'মে গোচল করে গাছ তলায় ঘুমোয়... পাকির সাথে গান গায়—যিন সেও এট্টা পাকি... পাকিরা তা'রে পায়ে... তার নামে গান গায়– বঙ্গ বঙ্গ বঙ্গ...

রমজান : কাচে চলো কাচে চলো... দেকি গে উডা কোন রুমা'ল

করিম : চলো বোটে মারো

গতির আছে শক্তি- রে ভাই
গতির হরো ভক্তি
হেইয়ো হো-ও ... হেইয়ো॥

দূরে দেখা সেই রুমাল অথবা কালো রং এখন যেন ভেসে যেতে থাকে আরও দূরে—যে রুমালকে খুব দূরে নয় দেখা গেল—সে রুমাল যে এখন কেবলই দুরত্ব এনে দেয়—যতই তার দিকে ছুটে চলে গতি—ভাসমান সে রুমালের রঙ □মশ বাড়তে থাকে—মানে তার আকৃতি বাড়তে থাকে—যখন নৌকাটি রুমালের খুব কাছে এসে

যায়—তখন সে রুমাল আর রুমাল থাকে না—রুমালের আকৃতি তখন এনে দেয় আরেক ধাঁধাঁ—কারণ পানির সমতল থেকে সে রুমালকে বেশ উঁচু দেখা যায়...

রমজান : ইডা কি তালি পানার ঝাড়

গাজী : নাকি জমি—ভাসে থাকা জমি

হারু : না কুষ্টার জাগ

রমজান : না না ইডা ভাসে থাকা জমিই হ'বি

আকবর : চল তা'লি জমির 'পার যাই

হেইয়ো হো-ও ... হেইয়ো॥

করিম : ই ই লাগে গেলো লাগে গেলো

: আস্তে– আস্তে

তবুও নৌকায় ধাক্কা লেগে সকলে একটি ঝাঁকি খায়—ঝাঁকির প্রাবল্যে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে পড়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পায়—আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের চোখে অন্ধকারে এক নারীর প্রতিমা ভেসে ওঠে—

গাজী : এ কি দেখি... ও করিম চাচা ভাসে থাকা জমির 'পার একি দেকি...

রমজান : করিম চাচা এতো দেকি মিয়া-ছাওয়াল

করিম : হ' হ' আমিও তো তাই দেকি... কিডা গো তুমি... কতা কও না ক্যা... ভয় পায়চো... আরে ভয় পা'য়ো না... আমাগো কি মা-বুননি... তোমারে আমরা মা-বুনির নাহাল ভক্তি দেবো... ভয় পা'য়ো না

গাজী : শুনলিরে রমজান শালার বুড়োর কতা... মিয়া-ছাওয়াল দেকলিই খালি মা-বুন ক'বি... যুদি যুবতি হয়... তা'লি মা হয় ক্যাম্বা... ক' দেকি

আকবর : ঠিকই তো কয়চিস... সুন্দরী হলি কিন্তুক লাইন মারবো

রুস্তম : কি করবি

আকবর : লাইন... মানে এটটু ভাব-টাব আর কি

রুস্তম : তুই করবি ভাব... আরে রাক ভাব করবো তো আমি... চ' আমার সাত... দেকা দিচ্চি ক্যাম্বা ভাব ক'ত্তি হয়

নৌকা থেকে নেমে সে—সেই অন্ধকারে নারী প্রতিমার দিকে এগিয়ে যেতে চায়—কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে যখন সে খুব মনোযোগ দিয়ে নারী প্রতিমাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে—ঠিক তখনই মাঝি সরদার একটি জিজ্ঞেস ছুড়ে দেয়—কিরে কি দেকিস—এই জিজ্ঞাসায় সে পিছন ফিরে গান শুরু করে—

আরে তোমায় সাথী করবো আমি জীবনে মরণে রে
আঁধার মাঝে রইছো তুমি সুন্দর নারীর বেশে ।
অনেক নদী পাড়ি দিয়ে এসেছি এই দেশেতে॥
আঁধার মাঝে কে-বা তুমি কি-বা তোমার নাম ।

তোমার যদি পাই কন্যা পুরবে নমস্কাম॥
বাড়ি আমার শালদহে তোমায় জানাইলাম ।
তোমায় যদি না-পাই কন্যা বধিবো পরান॥
কার-বা কন্যা ক্যান-বা তুমি একলা নদীর ধারে ।
তোমার লাগি বন্ধু আমার অন্তর ক্যামন করে॥

গাজী : আরে রাক তোর গান ... আগে আমি দেকি ক্যামুন সুন্দরী ...

নারীটিকে জাপটে ধরতে যেয়ে একগুচ্ছ লতাপাতার ঝোপ সমেত মুখ থুবড়ে পড়ে যায় সে—তার এই অবস্থা দেখে সকল সাথী হো হো করে হেসে ওঠে—আর সে তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভূমিতেই লাথি মারে এবং হামা দিয়ে পায়ের নিচ থেকে কি যেন মুঠোয় পুরে ছিড়ে নেয়—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুঠো খুলে অন্ধকার হাতে চোখ রাখে—

গাজী : ধুর শালা না-দেকি সুন্দরী না-দেকি রোঙ... হা-রে রোঙ তো দেকি না... খালি কালা দেকি... গাঙ আর আকাশ দেকি

রমজান : রোঙ না দেকলি মুকি নিয়ে দ্যাক

গাজী : নে নে তুরাও দ্যাক

রমজান : বাস্‌না পাইরে—কাঁচা কাঁচা বাস্‌না

গাজী : নুনতা নুনতা স্বাদ—আবার জিবে জুড়ে কাঁচা কাঁচা লাগে

আকবর : এতো দেকি নম্বা নম্বা—ঘাস

রমজান : ঘাস

গাজী : এ তা'লি ঘাস

হারু : ঘাস

রমজান : আমরা তা'লি ঘাসের পা'র আইচি

গাজী : না ঘাসের রুমালি... করিম চাচা তুমার সেই রুমালি

হারু : না ঘাসের চরে

হঠাৎ কোন খেয়ালে যেন ছুটে যায় রমজান– দূরে-চতুর্দিক । একসময় সে হামা দেয় এবং পায়ের কাছে হাত দিয়ে দেখে দেখে ফিরে আসে একমুঠো ঘাস সুদ্ধ মাটি নিয়ে–

রমজান : ঘাস চাকলে মাটি চাকবা না—মাটি চিনবা না

গাজী : ঘাস চিনলিই মাটি চিনা

রমজান : না না মাটি চিনলিই ঘাস চিনা

গাজী : না না ঘাস চিনলিই মাটি চিনা

হারু : কথা থামা—একবার চাকেই দ্যাক না

রমজান সেই মাটি মুখে নেয় এবং দৌড়ে যায় নদীর কাছে—পানিতে নেমে সে কুলিকুচি করে... শব্দ হয়—অতঃপর সে ফিরে আসে

রমজান : পানি তো নুনা না... মাটি তো ঘাম-নুনতা... না রক্ত-নুনতা বুজিনেরে কিচ্চু বুজিনে

রুস্তম : রক্ত

রমজান : মাটি রক্ত-নুনতা... কিন্তুক কিসির রক্ত... চ' তো খুঁজে দেকি ...

তার এই কা ও কথায় সবাই থ মেরে যায়—মাটির স্বাদের সাথে রক্ত ও ঘামের কি সম্পর্ক থাকতে পারে—তা তারা ভেবে পায় না... অবাক হয়ে সবাই তার দিকে চেয়ে থাকে—সে হেঁটে যায় সামনে-বামে-ডানে—সবাই হ্যামিলনের সেই বাচ্চাদের মতো তার পিছে যায়—সেও যেন সেই বাঁশিওয়ালা—সে বাঁক নিলে সবাই বেঁকে যায়—সে যেতে যেতে হঠাৎ থামলে সবাই থেমে যায়—

গাজী : সব দাঁড়া সামনে যাবি না । রাত যাক । সামনে উঁচো উঁচো কালা দেকি

রুস্তম : আরে থাম... এই রা'ত-ই তো সব কালা ক'রে রাকেচে—ধলাও কালা কালাও কালা

হারু : শালার রা'ত না গেলি কিচ্চু দ্যাকা যাবি নানে... তালি দাঁড়া দাঁড়া দ্যাকবোডা কি

রমজান : দেকবা আবার কী... রা'ত দ্যাকো দাঁড়া দাঁড়া রা'ত দ্যাকো

করিম : তালি পারে বসে বসে তাই-ই দেকি... বসো সগোলি-

তাদের দাঁড়ানো দেখে রাতও কি দাঁড়িয়ে পড়লো... তারা যে রাতের বিদায়ের জন্য অপেক্ষা বেঁধে আছে... এখন মনে হয় সে-রাত অনড়-স্থির... আর তারা তো ক্লান্তিতে বসে... কাত হয়ে... শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে...

শুধু রমজান শোয় না—সবার ঘুমের সুযোগে সে কৌতূহলী চক্ষে ঘুরতে থাকে—ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় এক অচিন বনের পথে—সেখানেই সে ঘুমিয়ে পড়ে... এমন সময় কোথা থেকে দুই নারী এসে বৃক্ষ ছায়ায় ঘুমন্ত রমজানকে দেখে থমকে যায়—

লবঙ্গ : অচিন মানুষ দেকি... আজ এই বনের পতে এ কি দেকি... এমুন মানুষ তো দেকি নাই কোনোদিন

রেবেকা : ও বুঝচি

লবঙ্গ : কি বুঝচিস

রেবেকা : কি আবার... তুই পেরেমে পড়িচিস... পেরেমে... দাঁড়া আমি ঘুম ভাঙা দি'

লবঙ্গ : না রে... রেবেকা না... দোহাই তোর... দোহাই

কিন্তু রমজান চক্ষুপত্র খুলতেই সখী রেবেকা লবঙ্গের পেছনে আড়াল হয়—আর রমজান বিস্ময়ে লবঙ্গের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ায়

রমজান : একি... একি আমি সত্যি দেকচি... হ' হ' সত্যিই তো... নিজির চিমটিতি নিজিই যে ব্যথা পাচ্ছি

রেবেকা : ও রেবেকা... আমার যে খুব ভয় করচে... অচিন পুরুষ দেকি... আমার দিকি আগায়ে আসচে

রমজান : ভয় পা'য়ো না কন্যা... ভয় পা'য়ো না... গড়াই পাড়ে আমার বাড়ি... ভয় পা'য়ো না... যদি কিচু মনে না করো তা'লি তুমার পরিচয় জিজ্ঞেস করি...

রেবেকা : পরিচয়... লবঙ্গ এই মানষির মতিগতি ভালো ঠেকচে না... একানে আর না... চ' লবঙ্গ চ'

রমজান : যায়ো না... লবঙ্গ শোনো... লবঙ্গ—বঙ্গ—তার 'পার সবুজ শাড়িতি পুবি উটা সুজ্জের নাহাল টুকটুকে মুক... পরিচয় পা'য়া গিচি... আমি তুমারে চাই কন্যা... আমি তুমারে বিয়ে করবো...

ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে পদহরি চকিদার—তার খ্যা খ্যা করা বিকট হাসির শব্দে লবঙ্গ ও রেবেকা অপ্রস্তুত হয়ে কেটে পড়ে—আর রমজান বন্দী হয়ে যায় হাতে নাতে

পদহরি : খ্যা খ্যা খ্যা... বিয়ে... খ্যা খ্যা... তা তোর নাম কিয়ে... এইদ্যাশে তোরে তো দেকি নাই কোনোদিন... এইদ্যাশে যার নাম নাই পরিচয় নাই... সেই করবে বঙ্গরে বিয়ে... খ্যা খ্যা খ্যা... চ' বিয়ের আগেই তোরে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাই... চ' চ'

ওই দিকে রাত পেরিয়ে যায়... দিনও শেষ শেষ প্রায়... তবুও পথ-ভোলা বাইচ মাঝিদের ঘুম ভাঙে না... এতদিন তারা ঘুম ভেঙে সূর্যকে শুধু উপরে উঠতে দেখতেই অভ্যস্ত... অথচ আজ যে সূর্য নিচে নেমে যাচ্ছে... আজকের সূর্য তাই সেই নারীভ্রমের মতোই এনে দেয় আরেক প্রহেলিকা—

রুস্তম : হই... সুজ্জো আজ উপরে ওটচে না... দ্যাকো দ্যাকো

গাজী : হায় হায়... এতো দেকি সত্যি সত্যিই সুজ্জো উপরে ওটচে না...

হারু : হ হ... তাই তো দেকি... মনে হচ্চে সুজ্জো একুন-ই খসে পড়বি...

গাজী : এ্যা-সুজ্জো খসে পড়বি... তা'লি তো দুনিয়া উল্টো যাবি

করিম : দুনিয়া উল্টো গেলি আমাগের কি হবি চাচা

হারু : হায় হায়... বাতাসও দেকচি থমথম করচে... ও করিম চাচা কতা কও না ক্যা... কিচু এট্টা কও

করিম : আমি কি কবো... কিয়ামত-কিয়ামত... রোজ-কিয়ামত আয়চে রে... আল্লারে ডাকো... আল্লারে ডাকো

হারু : কিয়ামত...

রুস্তম : করিম চাচা মাটি মনে হচ্চে ঘোরচে

করিম : এ্যা... ক'স কী...

আকবর : চাচা ওই দ্যাকো কালা কালা ম্যাগের নাহাল কি যিন এদিকি ছুটে আসতেচে

করিম : হ হ তাই তো দেকচি

মুহূর্তে এক বায়ুচ□ এসে তাদেরকে আরও অধিক ভীত করে তোলে—আর তারা সকলে ভীতিতে এবং বায়ুচ□র প্রাবল্যে হই হই করে মাটি আঁকড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে—কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ তাদের একজন বোধ ফিরে পেয়ে মাটিতে কি যেন খুঁজতে থাকে এবং একপর্যায়ে সকলকে সে জাগিয়ে তোলে—

হারু : করিম চাচা... কিয়ামতের ভূমিকম্পে তো মাটির সগোল নামি-দামি সুম্পদ বারা আসবি

করিম : হ কতা আচে এই মাটি তার বুকির মুদ্দির সগোল সুম্পদ বমি ক'রে দিবি... তুমরা মাটিরে দ্যাকো... প্যাট ভরা এই জমিনরে দ্যাকো

ঠিক এই সময় বাতাস কি এমন আবেগে শো শো হিস হিস ফিসফিস করে—পাতায় পাতায়—সামনের বনে—আর ঝরা পাতাগুলো বায়ুপথে ছুটে আসে তাদের দিকে—সে-সব পাতার আঘাতে আঘাতে চোখ-মুখ বন্ধ হয়ে আসে—তবুও তাদের কেউ স্বভাববশত উচ্চারণ করে—

ইচিং বিচিং ছিচিং ছা
উটকো বাও কেটে যা

অমনি বাতাস হারিয়ে যায়—কিছুপর—অথচ একটি দোয়েল মাটিতে মুখ রেখে বুক রেখে পড়ে আছে কাছেই—তাকে কি এনেছে ওই উটকো বাও—হঠাৎ সে শিস দিয়ে ওঠে—কে যেন ছুটে যায়... হামা দেয়... ফুড়ুৎ করে উড়ে যায় দোয়েল—দোয়লের সাথে তার চোখ চলে যায় দূরে—দূরে দেখে উঁচু এক ঢিবি...

রুস্তম : ওই দূরি... ওই কি যিন দ্যাকা যায়—কালা উঁচো... মনে হচ্চে মাটি ওকানে পুয়াতি হয়চে

করিম : হ হ তাই তো দেকি... দাঁড়া—এট্টা ঢেল মা'রে দেকি... মাটির শব্দ ঝনাৎ...

রুস্তম : ঝনাৎ

আকবর : চাচা ব্যাপারডা কি...

করিম : মনে হচ্চে ব্যাপার ওকেনে আচে... চ' যায়া দেকি

সকলে মিলে সেই পোয়াতি মাটির কাছে যায়—এবং মাটির সেই ঢিবিকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে— ঘুরতে ঘুরতে এক পর্যায়ে থমকে যায়—

রুস্তম : করিম চাচা... তুমি না ক'লে কিয়ামতের ভূমিকম্পে উগ্‌রানে নামি-দামি সুম্পদির কতা... আমি কই কি—এই পুয়াতি মাটির মুদ্দিই সেই সগোল সুম্পদ থাকতি পারে

করিম : হ হ পারেই তো... আয় খুঁড়ে দেকি...
গাজী : করিম চাচা... রুপোর নাহাল ঝিলিক কাটে—উডা কি গো...
হারু : মণি-মুক্তো হ'তি পারে... আয় আরও খুঁড়ে দেকি...
গাজী : এ-কি মানষির হাড়...
আকবর : তাই তো দেকি... মানষির হাড়
করিম : হাতের হাড়
আকবর : ওই তো হাতের আঙুলির হাড়
খায়রুল : একুনো তো ঠিক ঠিক মুটো করে আচে
হারু : আর মুটোর মুদ্দি কাচির হাতল
গাজী : নিড়েনির হাতল
আকবর : কুড়োলির হাতল
করিম : খুন্তির হাতল
হারু : তা'লি কি মরার সুমায় এইসব হাতে ছিল... একুনো আচে
করিম : কিন্তুক মানষির আর হাড় কই। শুদু হাতের হাড় দেকি আর হাড় কই।
গাজী : করিম চাচা... কিয়ামত ক'রে তা'লি কি এই মাটি তার নামি-দামি সুম্পদির বদলি এই হাড় আর লুহা তুলে দিল...
করিম : তা'লি আমরা কিয়ামতিই পড়িচি রে... ও আল্লা গো...

না জানি-বা কোন-বা দেশে আসিলাম।
কোন-বা দোষে সবাই মিলে কিয়ামতে পড়িলাম॥
ছিলাম সবাই নিজের দেশে সুখেরও ঘরে।
সেই সুখ ভাঙল বুঝি হায়রে কিয়ামতে পড়ে॥
এই দেশেতে এসে সবার প্রাণ কান্দে হায়।
আসমানে তাকায়ে দেখি সুজ্জো নেমে যায়॥
ভূমি জোড়া হাড়ের ঢিবি কি-বা মানে হয়।
মাথারও করোটি দেখে মানে নাহি পায়॥
রক্ত রুমাল পেয়ে সবাই খেলাতে মাতি।
সকলেই হবে জানি নিশ্চিত বন্দী॥

সকলের এই উদ্ভ্রান্ত ছোটাছুটি আর অদ্ভুদ কথায়-গানে পদহরি খেই হারিয়ে ফেলে—সে তাই নিরুপায় হয়ে ছুটে যায় প্রভুজীর কাছে—প্রভুজী তখন বন্দিগ্রহে রমজানকে জিজ্ঞাসাবাদে ব্যস্ত–

প্রভুজী : কও লবঙ্গরে তুমি কি কয়চো...
রমজান : কিচুই কইনি
প্রভুজী : কিচুই কওনি... তা'লি বন্দি হ'লে ক্যা...

রমজান : আমার ভুল হ'য়া গেচে...
প্রভুজী : ভুল হ'য়া গেচে... কেনে ভুল হয়... আহা... মানুষ কেনে ভুল করে... স্বর্গেত্তে ছিটকে পড়েও মানষির ভুল ভাঙলো না...
পদহরি : প্রভুজী... প্রভুজী...
প্রভুজী : কি হয়চে
পদহরি : সব্বোনাশ হ'য়া গেচে প্রভুজী
প্রভুজী : কি সব্বোনাশ...
পদহরি : জীবনে আমি এমুন দেকিনি প্রভুজী। দেকিনি... সব্বোনাশ হ'য়া গেচে
প্রভুজী : প্যাচাল থামা... কি হয়চে ক'
পদহরি : প্যাচাল নয়গো... একদম সত্যি আমি নিজি চোকি দেকিচি...
প্রভুজী : আরে কি দেকিচিস তাই ক'
পদহরি : কচ্চি কচ্চি—দেকলাম—একদল অচিন মানুষ আমাগের ওই ঘাসে ঢাকা হাড়গোড় আগলা ফ্যালা কিয়ামত কিয়ামত ক'রে ছুটোছুটি করচে—আমি ক'লাম—কিয়ামত নয়গো এ-হাড় আমাগের বহুতসুম্মানির হাড়—আমার কতা কেউ শুনলো না... কোনো কতা না শুনে তারা ওই হাড় গাদার নিচে নামি-দামি সুম্পদ খুঁজতি চাচ্চে... এতক্ষুণ মনে হয় সব উল্টো-পাল্টে ফ্যালেচে...
প্রভুজী : এ কি ক'স ... চ' তো দেকি ... জলদি চ' ...

পদহরির কথায় প্রভুজী ছুটে যায় সেই ঘাসে ঢাকা হাড়ক্ষেত্রে—আর ফাঁকে সেই লবঙ্গকন্যা বন্দী রমজানের দিকে এগিয়ে আসে—রমজানের সেদিকে কোন খেয়াল নেই—সে এখন তার সাথীদের হিসেব মেলায়—

রমজান : আরও অনেক অচিন মানুষ... তা'লি কি উরা-ই ওই হাড়গোড় উল্টোয়চে... হ হ উরাই হ'তি পারে... আমি তো ওদের 'তে দলছুট হইচি আর শাস্তি পাচ্চি...
লবঙ্গ : উরা কারা...
রমজান : মনে হচ্চে উরা আমারই সাথী...
লবঙ্গ : তুমার সাথী
রমজান : হ হ আমরা একদল পথহারা মানুষ এক আন্ধারে এই ভূমিতি নামিচি... তারপর কি হ'তি কি হ'য়া গেলো... আমি দলছুট হ'য়া পড়লাম...
লবঙ্গ : তুমরা তা'লি কোনো লোভে একানে আসোনি... আয়চো পথ ভুল ক'রে...
রমজান : হ হ কোনো লোভে না... আইচি পত ভুল ক'রে...
লবঙ্গ : এই কতা... এই কতা তুমি আগে কওনি ক্যা... আমার যে কি ভলো লাগচে... এই কতা আমি পিতারে কবো... পিতা পিতা...

ওই দিকে করিম শেখের দলটি সেই হাড়-লোহার চারপাশে দল বেধে যে হাহাকার করছিলো তার অনেকটাই এখন স্তিমিত হয়ে গেছে—এখন তাদের দলের একজন সেই হাড়-লোহার স্তূপের দিকে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের চোখে চেয়ে আছে দেখে অন্যেরা তার দিকে জিজ্ঞাসা ছুড়ে দেয়...

করিম : কিরে কি দেকিস

গাজী : অম্বা চোক হিঙে এই হাড়-লুহার মুদ্দি কি দেকিস—ক'স নে ক্যা

খায়রুল : এর মুদ্দি আবার মিয়ালোকের রূপ পালি না-কি... এ্যা

রুস্তম : না হে না... রুমালির গাও মনে হচ্চে

করিম : রুমালির গাও...

রুস্তম : হ হ রুমালির গাও...

যে রুমালের কথা কেয়ামতের বশে তারা ভুলেই গিয়েছিল—আবার কেন সেই রুমাল... সবাই বিস্ময়ে কাছে যায়—দেখে মাটি আর চারদিকের ঘাসের সাথে তার দৃঢ় সমন্বয়—তাদের চোখে বুঝি এই প্রথম ঘাসের রং ধরা পড়ে—

রুস্তম : আমরা দেকি ঘাসের পার—সত্যি সত্যি দুবলো ঘাসের পার

হারু : হ হ দুবলো ঘাস... সত্যি সত্যি দুবলো... কাঁচা কাঁচা রোঙ...

রুস্তম : তা'লি দেকি এই নাক—এই জিবে—এই হাত—মিত্যে কয় নাই—সত্যি কয়চে

আকবর : ঠিক কয়চিস—নাক-জিবে-হাত সবাই সত্যি কতা কয়...

রুস্তম : আরে দেকো দেকো দুবলো তো রুমালিরতেই হয়চে... রুমালির গাও দিয়ে এট্টা এট্টা ঘাস বারাইচে

আকবর : হ হ কিন্তু রুমালডারে কেমন কেমন মনে হচ্চে...

করিম : আরে রুমালডারে ইট্টু উটায়ে দ্যাকো না—কোন কাপুড়ির

রুস্তম : দাঁড়াও আমি তুলে দিচ্চি

একটু শক্তি দিয়ে সে ঘস ঘস আর পট পট শব্দে মাটি আর ঘাস থেকে রুমালটাকে টেনে তুলতে থাকে—কিন্তু রুমালটার কাপড় যেন শেষ হতে চায় না—তার হাত থেকে রুমালটা ঘুরে ঘুরে সকলের হাতে হাতে চলে যেতে থাকে—হঠাৎ একজন রুমালের গন্ধ শুকে আকুল হয়ে ওঠে—

রুস্তম : বাসনা পাইরে—রক্তের বাসনা—তুমরা এই কাপুড়রে দ্যাকো...

হারু : এ-তো দেকি পুরোন কাপুড়—বহুত পুরোন—কিন্তুক আমের কষের নাহাল এতে এ-কি লা'গে আচে

গাজী : বাসনা যকুন রক্তের—তকুন রক্তই হ'বি...

রুস্তম : মানষির রক্ত জবর ঘন—কাপুড়ি সেই রক্ত লাগলি—সেই রক্ত মোচে না—সেই কাপুড় পচে না

গাজী : আরে ধোৎ... ওসব রক্ত-টক্ত কিচ্চুনা... এটা হচ্চে গি'য়ে আমার ল্যাজ

রুস্তম : ল্যাজ...

পদহরি : হ হ ল্যাজ...

রুস্তম : তা'লি এটা ল্যাজ...

ল্যাজ ল্যাজ ল্যাজ
ওরে ল্যাজ ল্যাজ ল্যাজ
এই হলো তোর ল্যাজ
আহা বেশ বেশ বেশ...
এই তো গরুর ল্যাজ
হাম্বা। হাম্বা।
না। না না। না না না।
ভ্যা। ভ্যা।
তাইলে ভেড়ার ল্যাজ।
ল্যাজ ল্যাজ ল্যাজ
এই হলো সেই ল্যাজ
আহা বেশ বেশ বেশ... ॥

পদহরি : এই থাম... থাম...

প্রভুজী : ইরা-ই সেই অচিন মানুষ

পদহরি : হয় হয় প্রভুজী

প্রভুজী : ওদের হাতে উডা কি

পদহরি : দেকচি প্রভুজী... দেকে কচ্চি... প্রভুজী... এত দেকি রক্ত-মাকা কাপুড়...

প্রভুজী : রক্ত-মাকা কাপুড়... ওই রক্ত-মাকা কাপুড় নিয়ে ল্যাজ ল্যাজ খেলা... আহ্ আর সহ্য হয় না... পদহরি... বন্দি কর বন্দী কর

পদহরি : তা-ই করচি

হারু : ও চাচা, এতক্ষণ তো দেকচি সত্যি সত্যি কিয়ামত হ'য়চে... ও চাচা একুন মনে হচ্চে বিচারও হ'বি... আমার কি হ'বি চাচা

গাজী : চুপ কর... কি হ'তি কি হ'য়া যায় কিচুই কওয়া যাচ্চে না

হারু : ও চাচা আমারও যে ভয় করচে... এই দ্যাকো আমার বুক ধুকপুক করচে... ঠ্যাং কাঁপচে...

আকবর : ও মামা... মামাগো... এই কান ধরচি আর ল্যাজ ল্যাজ খেলবো না...

পদহরি : অ্যা একুন এই কতা... একুন ঠ্যাং কাঁপচে... বুক ধুকপুক করচে... যকুন ওই আগপুরুষির হাড়গোড় উল্টালে... এই কাপুড় নিয়ে ল্যাজ ল্যাজ খেললে তকুন এই কাঁপাকাঁপি কোনে ছিল... তকুন কি একবারও তাদের আর আহাজারি শুনতি

পাওনি... আয় সগোলি... আয়...

***

বন্দীশালায় রমজানের পাশে এসে দাঁড়ায় লবঙ্গ।

লবঙ্গ : আমার জন্যি তুমার এই দশা... ক্যা তুমি আমার কাচে হা'রে গেলে... ক্যা ক্যা

রমজান : তা আমি জানিনে কন্যা জানিনে...

লবঙ্গ : আমার মনে হচ্চে—আমি জানি... মনে হচ্চে আমিই তুমারে মায়ার জালে এই বিপদে ফেলিচি... বিপদে... তুমি আমারে ক্ষমা করো...

রমজান : না কন্যা, না... সব দোষ আমার... এ আমার দলছুট হওয়ার শাস্তি... তুমারে দেকে মুগ্ধ হওয়ার শাস্তি...

লবঙ্গ : না না... তুমার কোনো দোষ নাই... সব দোষ আমার... সখী রেবেকা কয়—এই আমার কারণেই তুমার কপাল পু'ড়েচে... আমার মনে হচ্চে—এই কতাই সত্যি... মনে হচ্চে—এই অন্তরে-দেহে কেবলই মায়ার জাল... কিন্তুক এই জাল আমি ভাঙি ক্যাম্বা...

রমজান : ওই কতা ক'য়োনা কন্যা... ওই কতা ক'য়োনা...

লবঙ্গ : শোন গো অচিন পুরুষ... তুমি যদি আমার কতা মতো কাজ করো তা'লি পরে মুক্তি হতি পারে...

রমজান : ক্যাম্বা করে...

লবঙ্গ : আমার বাবা প্রভুজী যকুন পুবদিকির এট্টা কচুপাতা দেকাবি... তকুন সেই পাতার 'পার আগুনির শিষ দেকা যাবি... তুমি তার মানে ক'য়া দিবা—তা'লিই তুমার মুক্তি...

রমজান : এর মানে আমি কি কবো...

লবঙ্গ : সুমায় হ'লি ঠিকিই কতি পারবা... তোমাগের ভালোবাসা যদি খাঁটি হয়—তা'লিই কতি পারবা

***

রমজানের বন্দীশালায় এনে মাঝি দলের অন্যদের এনে ঢুকিয়ে দেয় পদহরি। সেখানে বন্দী অবস্থায় রমজানকে দেখে তারা বিস্ময়ে বলে ওঠে–

রুস্তম : রমজান... রমজানরে এ তোর কোন দশা... এ তোর কোন পাপের শাস্তি... কোন পাপের...

খায়রুল : ক' রমজান ক'... আমার যে খুব ভয় করচে

হারু : রমজান... তুই ক্যাম্বা একানে আ'লি... আমরা তো এই কাপুড়ি ল্যাজ ল্যাজ খেলতি খেলতি বন্দী হইচি

রমজান : কাপুড়... এই কাপুড় তুরা কোনে পা'লি

গাজী : ক্যা... পুয়াতি মাটি খুঁড়ে পাইচি

আকবর : এ না-কি কোন আগপুরুষির কাপুড়

রমজান : আগ-পুরুষির কাপুড়... দেকি দেকি... হ হ এই তো তাদের রক্ত লা'গে আচে... এই তো... মনে হচ্চে—এই কাপুড় সীতার ফ্যালে যাওয়া গয়নার মতো কিচু... হ হ রাবণসুমায় যাদের হরণ ক'রে নিয়ে গেচে—তারা পতের বাঁকে বাঁকে রাকে গেচে তাদের কাপুড়-লুহা আর হাড়ের গয়না... চাচা দ্যাকো দ্যাকো এ যিন সেই সতীর কাপুড়...

করিম : এ তুই কি ক'স... আমি তো কিচুই বুঝতি পাত্তিচনে... কোনকার এই পুরোন রক্তলাগা কাপুড় নিয়ে এই তুই কি শুরু করলি.. .ক' তো দেকি... এ-পাগলামির কোন মানে হয়... থাম বাবা পাগলামি করিসনে...

রমজান : পাগলামি না গো চাচা... পাগলামি না...

পদহরি : চুপ চুপ সব... প্রভুজী আসচে... সগোলি নক ক'রে ব'সে পড়ো...

রুস্তম : আমাগের ক্ষমা করো প্রভুজী...

প্রভুজী : ক্ষমা... আমি ক্ষমা করার কিডা... যে হাড়-লুহা-কাপুড়রে তুমরা অপমান করলে পারোতে তাদের কাচে ক্ষমা চাও... আমি ক্ষমা করার কিডা... আমি তো এই বহুত সুম্মানির হাড়-লুহা আর কাপুড়রে এই এতো বচর বুক দে' শুদু আগলে রাকলাম আর কাঁদলাম... আমি দেকি ওদের শোকে রাত আর দুপুর থমথম করে... বিকালডা ঝিম মা'রে সন্দ্যা হ'য়া যায়... কেউ জানে না... আমি জানি... আমি তাই মদ্দি-রাতি চুপিচুপি ওদের শোকে কাঁদি... আমার এই বুকখেন যিন খানখান হ'য়া যায়... ওই সব হাড়-লুহার অপমান আর সহ্য হয় না... আমি... ক্ষমা করি ক্যাম্বা

করিম : য্যাম্বায় হোক প্রভুজী আমাদের ক্ষমা করো

প্রভুজী : আমি তো ক্ষমা করতিই চাই... এই আমার দয়ার শরীল... কিন্তুক পদহরি... ওই কাপুড়-হাড়-লুহার অপমানরে ক্যাম্বা ক্ষমা করি

পদহরি : হ হ প্রভুজী প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া এর কোনো ক্ষমা হ'তি পারে না

করিম : প্রভুজী... তাই কও... এই অপমানের কি প্রাশ্চিত্ত... কি কও

প্রভুজী : প্রায়শ্চিত্ত... হ এট্টা ধাঁধাঁর উত্তর ক'তি পারলি তুমাগের প্রাশ্চিত্ত হ'তি পারে

আকবর : ধাঁধাঁ ...

প্রভুজী : হ হ ধাঁধাঁ... ওই যে সামনে তাকাও... কিচু কি দ্যাকচো

রুস্তম : প্রভুজী... কচুর পাতা

প্রভুজী : পাতার 'পার কি দ্যাকচো

রমজান : আগুনির ফুলকি প্রভুজী

প্রভুজী : আগুনির ফুলকি... আচ্চা একুন কেউ যুদি এর মানে ক'তি পারো তা'লি মুক্তি আর যুদি না-ক'তি পারো তা'লি মুক্তি নাই... মুক্তি নাই... আগে কিডা

ক'বা... ওই বুড়ো তুমি আগে আ'সো... এইবার নজর দিয়ে দ্যাকো... দ্যাকেচো... তা'লি কও...

করিম : দ্যাকলাম তো... কিন্তুক কিচুই যে বুঝতি পাত্তিচনে

পদহরি : বুঝতি না পারলি যাও... আরাকজন আ'সো

প্রভুজী : এই চুপ... বুলি তুই কতা ক'স ক্যা... আমার উপর মাতব্বারি... আচ্ছা বুঝতি পারোনি... তা'লি আরাকবার দ্যাকো...

করিম : আবারো কিচু বুঝি না... তয় মনে হচ্চে আমাগো রমজান বুঝতি পারে... না হ'লি রুস্তম বুঝতি পারে... ওদের ডাকি

প্রভুজী : চুপ... বলি তুমি ডাকার কিডা—অ্যা... মানে ক'তি পারো না আবার কতা... তুমাদের ক্ষমা নাই... সরো তুমি... ইবার কিডা আসবা কিডা

গাজী : ও রমজান তুই যা...

রমজান : হ হ আমিই তো যাবো... আমারই তো যাওয়ার কতা

গাজী : হ হ তুই-ই যা

রুস্তম : রমজানের সাতে চ' আমরাও যাই চ...

রমজান : পাতার পার পানি দেকি... পানির পার রক্ত—রক্ত... নৌকাবাইচইত্তে ছিটকে আ'সে আমরা এক ভূমিতি নামিচি... ভূমির মাটিতি পাইচি রক্তের স্বাদ... তারপর আমার যিন কি হ'য়া গেল ছুটতি ছুটতি হারায়া পা'লাম লবঙ্গকন্যা... লবঙ্গ... বঙ্গ... লবঙ্গ... হ হ তার জন্যি বন্দি হলাম আমি আর তুরা বন্দী হ'লি এক কাপুড় নিয়ে ল্যাজ ল্যাজ খেলতি খেলতি... সেই কাপুড়ির রক্ত... মাটির রক্ত আর পাতার রক্ত... এই রক্ত যে আগুনির ফুলকির মতো জ্বলচে... রুস্তম... সেই মাটির রক্ত... ওই কাপুড়ির রক্ত আর এই পাতার রক্ত এদের মুদ্দি সুম্পর্ক কুতায়... রুস্তম... তুই কি কিচু বুঝতি পারচিস

রুস্তম : হ হ বুঝতি পারচি... এই রক্ত-ওই রক্ত-সেই রক্ত আর ওই হাড়-লুহা-কাপুড়... আমি সব বুঝতি পাচ্চি রে রমজান... এ যে সেই কাহিনী—সেই ভূমির কাহিনী... পা'য়া গিচি... ধাঁধাঁর উত্তর প্রভুজী... আমি... আমি... ক'বো ধাঁধাঁর উত্তর...

প্রভুজী : ঠিক আচে কও

করিম : এক যে ছিল ভূমি শোন—শোন বিবরণ।
এক যে ছিল শোন—শোন দিয়া মন॥
ধনে গুণে পূর্ণ ছিল করি যে বর্ণন।
ভূমি ছিল রানি যে তার ছিল না রাজন॥
মনের দুঃখ ছিল তাহার ছিল না স্বাধীন...
রূপে তাহার মুগ্ধ ছিল হাজার জাতি।
তাকে নিয়ে ছিল রে ভাই সকলের মাতামাতি॥
সকল পায়ের গন্ধ আছে—সেই মাটিতে মিশে।
যবন-ধবল সব একাকার—সেই মাটিতে এসে॥

প্রভুজী প্রভুজী—কাহিনীর এখানেই শেষ নয়... যুগে যুগে বিচিত্র প্রজাতি ও নিষাদের ইচ্ছের হাতে বন্দী রাজনহীন সেই ভূমির কোনোদিনই মুক্তি ঘটে নাই... বারেবারে তার সম্ভ্রম খোয়া যায়... তবু যুগে যুগে নিষাদেরা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নেমে আসে... নেমে আসতেই থাকে... ওই যে... ওই যে ছুটে আসছে আরেক নিষাদ...

নিষাদ : আমরা আসি আকাশ পথে
এই পথে আসে দেবদূত
শোনো আমাদের ভাষা
... ...
আমাদের ভাষা
তোমাদের ভাষা

কোরাস : না। না। না

নিষাদ : অবোধ সকল শোনো
আমরা আসি আকাশপথে
যেই পথে আসে দেবদূত
জানো আমাদের ভাষা
... ...
আমাদের ভাষা
তোমাদের ভাষা

কোরাস : না। না। না
... ...
মায়েদের ভাষা
আমাদের ভাষা

নিষাদ : অবাধ্যকুল শোনো
আকাশপথে আমরা আসি
সেই পথে আসে দেবদূত
মানো আমাদের ভাষা
... ...
আমাদের ভাষা
তোমাদের ভাষা

কোরাস : না। না। না
... ...
মায়ের ভাষা
আমার ভাষা

নিষাদ : তবে রে অবাধ্যকুল... হই হই

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমাবধীঃ কামমোহিতম্॥

ভূমির আত্মারা কেঁপে ওঠে ক্রোধে-ঘৃণায়-এমনই অভিশাপ উচ্চারণে-প্রতিবাদে... ওই দেবদূত... ওই নারদ তার কিছু বুঝতে পারে কি ... দেখেছি তার শিউরে উঠে চুপসে যাওয়া...

না না না... তারা বুঝি চুপসে যায়নি কেউ... ভাষা রেখে শেষে তারা বুনতে চেয়েছে বীজ... সে বীজের বৃক্ষ হবে ফলবতী—পরসেবী... নিজের বলে পাবে না কিছুই কেবলই দান-দেবী... অনন্য অপরিসীম বৃক্ষ হয়ে থাকবে সেই ভূমি ... কিন্তু আর কতো ... ভূমি যখন বৃক্ষ... তখন বৃক্ষের পত্রকুল পক্ষী হয়... কেবলই অবলা নয়... কথা হয়... দফা হয়... আর একদিন বৃক্ষতলে নিষাদ নেমে এলে পক্ষীকুল আবার পাতা হয়... তবু তো দেবদূত বৃক্ষ নিয়ে হিমসিম... তাই বুঝি দেহবদল... কিন্তু মন ... সে তো চলে একই দোলায় খেমটা চালে...

নিষাদ : উহুম না উহুম না।
বৃক্ষ তোমায় ছাড়ুম না ॥

কোরাস : ছাড়তে হবে—নিশ্চিত ছাড়তে হবে...

নিষাদ : এই কে... কে কথা বললো কে... তা যে-ই বলো—আরে ভূখণ্ডের মধ্যে ছেদ থাকলে অসুবিধা কোথায়... কোথায়... আরে আকাশে তো আর ছেদ পড়বে না... আকাশটা অনন্ত একক থাক... একই সূর্য-চাঁদ-তারা... সকল আকাশেই আছে... নাকি নাই... আরে তাই যদি থাকে... তাহলে এই একক আকাশকে অস্বীকার করো না... করো না...

কোরাস : আমার তোমার নিজস্ব মাঠ নিজেদেরই থাক
তবেই আমরা বিশ্বাস করবো একক আকাশ

নিষাদ : অ্যা... বলি তা হবে না... এই বলে রাখছি... ভূমিদ্রোহী... আকাশদ্রোহী পক্ষী তোরা... তোদের মুক্তি নাই... হ্যাঁ হ্যাঁ এই বলে রাখছি... হই হই

নিষাদ বা দেবদূত কি খুব ভয় পায়... হুলিয়াতে ক্রৌঞ্চ বেঁধে দমাতে যায় স্রোত... তারা কি জানে না স্রোতের মুখে বাঁধ দিলে স্রোত ছোটে বাঁধ ভেঙে... আরও বেগে... তাহলে ক্রৌঞ্চের দলও কি সেই বেগ পায়...

দেবদূত হারায় কর্তৃত্বের সীমা... বুকে তার নিষাদের গান...

স্বপ্নের ফুল ক্রৌঞ্চের বুকে... এক স্রোতে নামা সে কার ডাকে—সেও কি ক্রৌঞ্চ... সেও কি জীবন... সে কি পয়গম্বর... না-কি তাদের মিলিত কণ্ঠস্বর... না মানুষ... আকাশের মতো।

এক রাতে নিষাদের গান বাজে... অজান্তে সবার... রক্তের নদীতে আকাশ ভাসে নিষাদ ভাসে না...

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমঃগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

মাঠের কাজ ফেলে যারা ছুটে আসে... রান্নার কাজ ফেলে যারা ছুটে আসে... তারা কি কেবলই ক্রৌঞ্চ... কেবলই ক্রৌঞ্চী।

ওই মাটি তাদের দেহের ঘাম চোষে... চোখের পানি চোষে... বুকের রক্ত চোষে... আহারে মাটি আর পারে না... মাটিতে নেমে আসে কচুর পাতা... ।

সেই দিন কি খুব বাতাস ছিল... বাতাসে খুব গান ছিল... যেদিন জয় হলো ... পাতাটির উপর গড়িয়ে যায় পানি... সে যে ঘামের পানি চোখের পানি তার সাথে গাঢ় লাল ... সে যে রক্ত... শুয়ে থাকে কচুর পাতা... সে কি মাটিতে সালাম করছে আজ... নাকি সে যুদ্ধের ক্লান্তির বশে এই মাটিতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চাচ্ছে কিন্তু ক'টা দিন যেতে যেতে পাতাটি যেন উঠতে থাকে... একটু একটু করে... সেই পাতা আজ আলো হাতে... আলোর বহুকোণী স্ফুলিঙ্গ হাতে...

করিম : আ'জ আমার ভুলাবুকি বাড়ি লা'গেচে রে... বাড়িলা'গেচে... আমার সব মনে আইচে... সেই রোজ-কিয়ামতরে আবার আমি চোকির সামনে দেকতি পাচ্চি... এতদিন পর সেই হাড়গোড় দেকে আবারও কিয়ামত মনে হয়েচিল... তবু কেন আমি সেইদিনকে মনে করতি পারিনি ক্যা... ক্যা... এতো সেই ভূমি... ভূমি

গাজী : চাচা এ তা'লি পানার ঝাড় না

হারু : কুষ্টার জাগও না

আকবর : ভা'সে থাকা রোঙ না

রমজান : ভা'সে থাকা জমিও না

করিম : না না... এ কোন পানার ঝাড় না কুষ্টার জাগ না ভা'সে থাকা জমি না রোঙও না... এ হচ্চে যুগ যুগ ধ'রে পায়ে দলা সেই ভূমি... এ আমার পবিত্র সেই ভূমি...

গাজী : কিন্তুক সেই দিনকে তো আমরা বেমালুম ভু'লে গিচি চাচা

রমজান : ভু'লে গিচি... হ হ ভু'লে গিচি... চাচাগো এই ভুলির শেষ কুতায়... পথ-ভুলা এই পতের মুক্তি কুতায়

হারু : হ চাচা... কও দেকি মুক্তি কুতায়

করিম : প্রভুজী তা'লি আমাদের মুক্তি কুতায়... ক'য়া দ্যাও...

প্রভুজী : মুক্তি... মুক্তি। তবে শোনো– আমি তুমাদের এক কন্যাকে দেবো তাকে যুদি তুমরা সগোলে সুমানভাবে ভালোবাসতি পারো তা'লিই মুক্তি পাবা। কিন্তুক সাবধান ভুল ক'রো না– তুমাদের ভুলির কারণে সেই কন্যা ঘাস-লাতা-পাতা আর ভূমিতি মিশে যাবি। কেউ তারে পাবা না... পাবা না। কিচুতিই পাবা না– এই নাও...

এইকথা বলে প্রভুজী কন্যাটির আবরণ খুলে দেয়—কন্যার রূপের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে তারা সব কিছু ভুলে যায়—

রমজান : এত দেকি লবঙ্গ... আমার সেই লবঙ্গ... লবঙ্গ... লবঙ্গ...

গাজী : ওরে থাম—তোর লবঙ্গ মানে

রমজান : মানে কিচু নেই... ও আমার...

গাজী : আমারও

হারু : অ্যা... আমারও... ক'লিই হলো... প্রভুজী যে ওরে আমাদের সকলরে দিয়ে গেলো... তাই যুদি হয় তা'লি তো ও আমারও...

খায়রুল : তা'লি তো ও আমারও... ও আমার...

রমজান : না না আমার... লবঙ্গ আমার... আমার... আমার... আমার...

গাজী : আমার...

এইসব কথার মধ্যে সকলে লবঙ্গকন্যাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে—আর লবঙ্গকন্যা ক্লান্ত হয়ে নিজেকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে—অথচ অনেকগুলো লোভী হাতের নিচে সে পরাস্ত হয়—সবাই তাকে খামচে খামচে ভোগ করতে চায়—তাদের 'আমার... আমার' ধ্বনির মধ্যে লবঙ্গকন্যা শেষ মুহূর্তে সীতার মতো আকাশ কাঁপিয়ে উচ্চারণ করে... 'হায় পৃথিবী'!! তার সেই উচ্চারণের পর সামান্য সময়ের জন্য তারা সব থমকে যায় আর পৃথিবীতে একটি থমথমে নৈঃশব্দের সৃষ্টি হয়—তারপর ভূকম্পনে আকাশ-বাতাস-আলো অথবা প্রকৃতি লবঙ্গকে তাদের শরীরে মিশিয়ে নেয়—তাই তাকে তার সপ্রতিভায় আর কোথাও দেখা যায় না।

সমাপ্তি সঙ্গীত

স্বপ্ন হইল লোভেতে নিঃশেষ
ওরে প্রাণের স্বপ্ন বঙ্গরে॥
ভূমি হইল মায়ের সমান
করি যেন তারেই সম্মান॥
ভূমির নামে জানাই প্রণাম
আছেন যারা আসরে।
লোভে হইল সবই মাটি রে
বঙ্গ গেল মিশিয়॥
ও বঙ্গ রে...
ভূমির নামে সবাই এবার
মিলে মিশে হইলে সবার।
দুঃখ কষ্ট যাইবে দূরে
সুখী হইব সবাই আবার॥
শুরু করি ভূমির নামে রে
ভূমির নামে করলাম শেষ॥
ও ভূমি রে...

রচনাকাল : ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ, পুনর্লিখন : ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

বোধিদ্রুম

চর্যাপদের নাটক-সম্ভাবনা
চর্যাপদ অবলম্বনে একটি বর্ণনাত্মক নাটক

চর্যার পদগুলো মূলত গানের সংকলন। গবেষকগণ মনে করেন– সংকলিত চর্যার পদগুলো নৃত্য-গীত আকারে পরিবেশিত হতো। আর সেই পরিবেশনার শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে থাকত সুনির্দিষ্ট কোনো কাহিনীর বর্ণনা এবং তার ব্যাখ্যা। এই মত বিবেচনায় এনে অনেক গবেষক-পণ্ডিতই চর্যাপদকে নাট্যমূলক পরিবেশনার একটি গীত সংকলন বলে উল্লেখ করেছেন।

চর্যাপদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক' সম্পর্কে গবেষকগণ মনে করেন–এই নাটকে বুদ্ধদেবের জীবনের কোনো বিশেষ ঘটনা বা বুদ্ধদেবের সমগ্র জীবন-কাহিনীকে নাচ-গান ও বর্ণনা-ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিবেশন করা হতো। এক্ষেত্রে অত্র গ্রন্থাকারের মত হচ্ছে– চর্যাপদ অভ্যন্তরস্থ কাহ্নু-ডোম্বী, শবর-শবরী'র নাটকীয় সম্পর্কের ইঙ্গিত একথাও প্রমাণ করে যে, শুধু বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনীকেই প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকে রূপ দেওয়া হতো না–তার পাশাপাশি বাংলার লোকজীবনের সাধারণ নর-নারীর জীবন-কাহিনীর অনেক ঘটনাকেও বুদ্ধ নাটকে উপস্থাপন করা হতো। চর্যাপদের অনেক পদের ভেতর সে রকম নাট্যাখ্যানের বীজ লুকিয়ে রয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে চর্যার পদগুলোকে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পদ মনে হলেও বিচ্ছিন্ন ঐ পদগুলোর অভ্যন্তরে একটা কাহিনীসূত্র আবিষ্কার করা যায়। যে কাহিনী বিকশিত হয়েছে নাটকীয় টানাপোড়েনের পথ অতি□মে □মপরিণতিতে। এতদ্ব্যতীত গবেষক মনে করেন–সংকলিত পদসমূহের পূর্ব, মধ্য এবং অন্তে কাহিনী বর্ণনা, ব্যাখ্যা বর্তমান ছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা চর্যাপদকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, এর কিছু পদ নাট্যমূলক সংলাপাত্মক গীত, বর্ণনাত্মক গীত এবং মিশ্র (সংলাপ ও বর্ণনা মিশ্রিত) গীত।

চর্যাপদ অভ্যন্তরস্থ কাহিনী বিচারে দেখা যায় যে, ১০ সংখ্যক পদে আছে, কাহ্নু জাত-পাত বিসর্জন দিয়ে নগর বাহিরের বা লোকালয় বহির্ভূত বা অচ্ছুত কোনো এক ডোম্বীর উদ্দেশে প্রেম নিবেদন করছে এবং ১৯ সংখ্যক পদে বাদ্য বাজিয়ে বিবাহ করতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ডোম্বীকে বিবাহ করে কাহ্নু পাচ্ছে নবজন্ম। কেননা, হারাচ্ছে জাত। কিন্তু তাতে কী, যৌতুক তো পেয়েছে! বিবাহ শেষে কাহ্নু বোধকরি বেশ সুখেই দাম্পত্যজীবন কাটাচ্ছে, ১০ সংখ্যক পদ হতে সেকথা জানা যায়। এ পর্যন্ত আমরা শুধু পুরুষ-কাহ্নুর দিক থেকে কাহিনী বিচার করার সুযোগ পেয়েছি। এবার নারী-ডোম্বীর দিকে কাহিনী বিচার করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে ২০ সংখ্যক পদে এক নারীর অন্তর্জাত আর্তি জানতে পারি, সেখানে নারীর বলছে–'আমি নিরাশী। (আমার) স্বামী ক্ষপণক

(অথবা, আকাশবৎ শূন্য মনের)। আমার সুরত-সুখ (এমন যে) বলা যায় না। ওগো মা, আঁতুড়ঘরের দিকে চেয়ে প্রসূত হলাম। এখানে যা চাই, তা এখানে নেই। আমার প্রথম প্রসব বাসনা-পুত্র। নাড়ি বিচার করতে গিয়ে দেখি সেও হতভাগ্য।'

এমন কথার ভেতর দিয়ে আমরা একটি প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ি যে, চর্যার রসিক পুরুষ প্রেম নিবেদন করে, বিবাহ করে, কিন্তু তার যথার্থ দাম্পত্যজীবন? সে জীবনে সে আসলে কেমন? এমন প্রশ্নটি যদি স্ত্রী ডোম্বীর দিক থেকে দাঁড় করিয়ে উত্তরটি উপর্যুক্ত ২০ সংখ্যক চর্যা থেকে গ্রহণ করি, তবে প্রমাণিত হয় যে, প্রেম নিবেদনে পুরুষ কাহ্নু সিদ্ধ হলেও সুরত জীবনযাপনে কোনো এক গূঢ় কারণে উদাসীন/ক্ষপণক বা অক্ষম। তাইতো বধূকে শ্বশুর-শাশুড়ির চোখে ধুলো দিয়ে অর্ধরাত্রে পরকীয়া প্রেমে মত্ত হতে হয়। অথচ বধূটি না-কি দিনের বেলা কাক দেখে ভীত হয় (তবে কি সে কাক লোকচক্ষু)! কিন্তু উপায় কী? স্বামী যার উদাসীন বা অক্ষম, পরকীয়াই কি তার শেষ ভরসা নয়? চর্যার ২ সংখ্যক পদে পদকর্তা সম্ভবত সে-ধূসর উদাসীন বা অক্ষম স্বামীকে নিয়ে রসিকতা করছেন– 'কুমিরে খেয়ে নিচ্ছে গাছের তেঁতুল। শোনো ওগো বাদ্যকরী, তোমার ঘর মধ্যে অঙ্গন।' একসময় হয়তো-বা কুমিরের তেঁতুল ভক্ষণ স্বামীরও দৃষ্টিগোচর হয়। তাই সে ১৮ সংখ্যক পদের ভাষায় তিরস্কৃত করে বধূ ডোম্বীকে– 'কেমন তোর নাগরীপনা! অন্তে কুলীনজন (অর্থাৎ স্বামী), মাঝে (অর্থাৎ ভিতরে) কাপালিক। ওলো ডোম্বী, তোর দ্বারা সবকিছু অশুচি হলো। বিনা কাজে, বিনা কারণে চন্দ্র বিচলিত হল।' এরই মাঝে হঠাৎ একদিন পদ্মার স্রোতধারা বেয়ে দস্যু আসে, তারা লুট করে তাদের দেশ। ৪৯ সংখ্যক পদে আছে, সোনা-রুপার সাথে দস্যুরা ঘরের বধূকেও অপহরণ করে নিয়ে যায়। এতে এক স্বামীর আকাশ বিদীর্ণ ধ্বনি উচ্চারিত হয়– 'ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী। জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেশ।' অর্থাৎ নিজ গৃহিণী চণ্ডালে নিয়ে গেল। এখন (আমার) বাঁচা মরায় (কোনো) পার্থক্য নিই।

অন্যদিকে ৫০ সংখ্যক পদে দেখা যায় ভিন্ন এক দাম্পত্যজীবন, সেখানে 'চমৎকার (কী সুন্দর) রে কার্পাস ফুল ফুটেছে। তদ্‌লগ্ন (তৃতীয়) বাড়ির চারপাশে জ্যোৎস্না, তখন দূর হলো অন্ধকার, আকাশকুসুমের (মতো)। কংনি দানা পাকলো রে, শবর-শবরী মাতলো; দিনের পর দিন শবর মহাসুখে থাকার জন্য কিছুই টের পায় না। চার বাঁশে (খাট) গড়ল রে চেঁচাড়ি দিয়ে, তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হলো, কাঁদল শকুন শৃগালী।' সেই সাথে যেন একটা দাম্পত্যজীবনের পরিসমাপ্তি রচিত হয়। সব মিলিয়ে চর্যাপদের অন্তরাত্মায় একটা পূর্ণাঙ্গ নাটকীয় কাহিনী আবিষ্কার করা সম্ভব।

এই কাহিনীতে আছে– প্রেম, বিবাহ, পরিশেষে দাম্পত্যজীবন এবং তার পরিসমাপ্তি। তাদের সে জীবনের একদিকে আছে সুখ-তৃপ্তি, অন্যদিকে অতৃপ্তি এবং সেই সূত্রে পরকীয়া এবং দাম্পত্যকলহ। তবু স্ত্রী অপহরণে স্বামী অন্তর্জাত বেদনার প্রকাশও লক্ষণীয়। অতএব এই সুষম কাহিনীতে যেমন ধারাবাহিকতা বর্তমান, তেমনই বর্তমান নাটকীয় টানাপোড়েনের যৌক্তিক ভিত্তি। যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে চর্যাপদের

নাটকসম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে তেমন কোনো বাধা থাকে না। আর সে সম্ভাবনার সূত্র ধরেই রচিত হয়েছে এই নাটক। এই নাটকটিতে মূলত চর্যাপদ অভ্যন্তরস্থ কাহিনী অনুসরণের চেষ্টা থাকলেও এতে পদকর্তাদের জীবনী ও রেখাচিত্রের দিকে যেমন, তেমনই সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার এবং তার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ সুবিন্যস্ত টেরাকোটাগুলোর প্রতি। এছাড়া বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রস্ফুটনে বাঙালির ইতিহাস পাঠ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে কল্পনার পেখম মেলে অনিবার্যভাবেই উড়ে যেতে হয়েছে সুদূর চর্যাযুগে। দেখতে হয়েছে কাহ্নু-ডোম্বীর বিবাহ-আসর, বিবাহ, দাম্পত্যজীবন, বিরহ, বিচ্ছেদ এবং বিধবা ডোম্বীর প্রতি ব্রাহ্মণ এক তরুণ পদকর্তার প্রেম ও বিদ্রোহ, সেইসাথে আরও দেখতে হয়েছে বিপন্ন দেশবাসীকে, ভুসুককে, এমনকি রহস্যময় কুক্কুরীকে। সময় ও প্রেক্ষাপটের বিচারে চর্যার কাহিনী সুদূর প্রাচীনযুগের হয়েও তা একই সাথে সাম্প্রতিক এবং শাশ্বতকালের। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই কিছুটা কল্পনা, কিছুটা বাস্তবে চর্যাযুগের চরিত্রদের সাথে বসবাস করে রচিত হয়েছে এই নাটক। উল্লেখ্য, এর আগে চর্যাপদের সময়কাল এবং চর্যাপদের কিছু পদকর্তা ও চরিত্রকে নিয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেনের মেয়ে' ও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন 'নীল ময়ূরের যৌবন' নামে দুটি উপন্যাস প্রকাশ করলেও গ্রন্থকারের জানা মতে– চর্যাপদ অভ্যন্তরস্থ কাহিনীকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় একটি নাট্য রচনা এই প্রথম।

এই নাটকটির অবলম্বন যেহেতু চর্যাপদ ও তার পদকর্তা এবং চর্যাপদ উদ্ধৃত সময়, সমাজ ও চরিত্রাবলি সেহেতু নাটক-শরীরের চর্যা-সমসাময়িক প্রাচীন বাংলার আবহ সৃজনে এর ভাষাভঙ্গিতে চর্যার প্রচুর শব্দ ও বাক্যকে ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ অন্বেষণসূত্রে রচিত এই নাটকের মাঝখানে 'বুদ্ধ নাটক' পরিবেশনার একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে।

একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য : ঢাকা থিয়েটারের ৩০তম প্রযোজনা হিসেবে সাইদুর রহমান লিপনের নির্দেশনায় নাটকটির পূর্বলিখন 'ন নৈরামণি' নামে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকার মহিলা সমিতি মঞ্চে প্রদর্শিত হয়। প্রথম ও একমাত্র প্রদর্শনীতে বর্ণনাকারী ও মুখ্য ভূমিকা ডোম্বী চরিত্রে অভিনয় করেন শিমূল ইউসুফ এবং অন্যান্য ভূমিকায় ঢাকা থিয়েটারের অভিনয়শিল্পী শহীদুজ্জামান সেলিম, রোজী সিদ্দিকী, জহিরুদ্দীন পিয়ার, পঙ্কজ বণিক প্রমুখ। নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন শিমূল ইউসুফ ও কমল খালিদ, কোরিওগ্রাফার ছিলেন আনিসুল হক হিরু।

নাটকশুরু

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥ ধ্রু ॥
দেহহি বুদ্ধ বসন্তে ॥

দেহ মন্দিরেই বুদ্ধের অধিষ্ঠান। এই সত্য উপলব্ধিতে বঙ্গালের বজ্রাচার্য প্রভু যেই মুহূর্তে গেরুয়া-হলুদ পাতা হয়ে অবিদ্যা-মোহের বৃক্ষশাখা হতে বিচ্যুত হন–সেই মুহূর্তে বাতাসে ভাসমান ঝরাপাতাদের মতো তার স্বকীয় সত্তার মধ্যেও প্রবল এক ঘূর্ণিপ্রলয় ওঠে–যে প্রলয়ে তিনি নৃত্যপর–নাচন্তি বাজিল...। সেই উত্তুঙ্গ নৃত্য ঘিরে ধ্বনিত হতে থাকে আরেক নৃত্য-সুর প্রকৃতির–তিনি দেবী। সহসা উভয়ের সুর-ছন্দের শংকরে সৃজিত হয় 'বুদ্ধ নাটক'। আসরে তাই গীত হয়–'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥'

এই পূর্ণিমায় নতুন কোন জন বোধিচিত্ত প্রার্থনা করবেন... সেই উত্তেজনায় অন্তরে থরথর কম্পমান সমগ্র বঙ্গালবাসী। বোধিচিত্তের এমনই শক্তি যে–অসীম এক আত্মার উপলব্ধিতে জাগতিক মৃত্যুকে খুব সহজেই উপেক্ষা করা যায়... সত্য-মিথ্যার দোলাচাল ভেঙে অসীম আত্মায় সসীম আত্মাকে লীন করা যায় এবং হাতের মুঠোয় ধরা যায় পরম শান্তি–যার নাম মহাসুখ। বোধিচিত্ত পেলে এ মরজীবনে আর কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকে না। কিন্তু হায়... কাম-ক্রোধ-মোহ-লোভ এতসব মায়াময় ইন্দ্রিয় দমন না করে কারো পক্ষেই বোধিচিত্ত অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই বঙ্গালের কে-ই-বা পারবে তার অতি মনোহর ইন্দ্রিয় দমন করতে... কে... কে সে... এমনই অভিব্যক্তিময় জিজ্ঞাসায় নৃত্যপর বজ্রাচার্য প্রভুর মধ্যে যখন পূর্ণরূপে বোধিচিত্ত দানের অধিকার ঘটে। আর যখন তিনি বোধিচিত্তের পথে নতুন কাউকে আকর্ষণ করবার অকৃত্রিম শক্তি অর্জন করেন তখন তার সংগীত-নৃত্যের চঞ্চলতা পরম চঞ্চলতায় উঠে ধীরে ধীরে শান্ত-স্থির হয়...।

অকস্মাৎ বজ্রাচার্য প্রভুর সাম্য মূর্তির সম্মুখে আছড়ে পড়ে এ পূর্ণিমার নতুন বোধিচিত্ত প্রার্থী। বঙ্গালের মানুষ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে তাকে। কেননা সে অতি তরুণ–সে কাহ্নু।

বোধিচিত্ত প্রার্থনায় আকুল কাহ্নু বজ্রাচার্য প্রভুর পায়ের কাছে পড়ে অস্থির আবেগে বলতে থাকে–

–প্রভু প্রভু বোধিচিত্ত চাই আমি... দাও দাও আমাকে বোধিচিত্ত।

কাহ্নুর এমন অস্থিরতার মধ্যে বঙ্গালের নর-নারীর মাঝে বিস্ময়ের গুঞ্জন ধ্বনিত থাকে–'কাহ্নু নেবে বোধিচিত্ত... এ কী করে হয়...।'

ততক্ষণে বজ্রাচার্য প্রভু তার পায়ে আছড়ে পড়া সম্মোহিত কাহ্নুর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কি যেন ভাবেন... তারপর হাঁটু গেড়ে বসে কাহ্নুর দুই বাহু ধরে তার মাথাটা একটুখানি উপরে তুলে ধরে চোখে চোখ রাখেন এবং কাহ্নুর চোখ দিয়ে তার

চেতনার গভীর থেকে আবেগের উচ্ছ্বলতা পাঠ করেন। সহসা নিজের মাথায় তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন–

–থির করি চল।

–প্রভু। বোধিচিত্ত দাও।

–দেহহি বুদ্ধ বসন্তে।

–না জানি প্রভু... না বুঝি দেহহি কথা–কোন পথে বোধিচিত্ত পাবো সেহি কথা কহ প্রভু... সেহি কথা কহ।

–চঞ্চল চিত্ত থির করো।

–প্রভু পুছমি সদভাবে–কেমনে থির করি চিত্ত...

–তোমার চেতনার গভীরে পিপাসা রয়েছে... বিস্তর পিপাসা।

–প্রভু।

–বিবাহ বিনা চিত্ত তোমার থির হবার নয়। তুমি বিবাহ করো।

–বিবাহ।

–হ্যাঁ হ্যাঁ বিবাহ... এটাই তোমার চিত্ত থির করার সহজ পথ।

–সহজ পথ... বিবাহ।

–হ্যাঁ তোমার লাগি বিবাহ-ই সহজ পথ।

–প্রভু।

–আগে বিবাহ করি ইন্দ্রিয় সুখ লহ... জীবনের পিপাসা মিটায়ে লহ।

–প্রভু পিপাসার কথা কেন কহ... আমি শুধু বোধিচিত্ত চাই... ইন্দ্রিয় সুখের ভেতর আটকা পড়তে চাই না প্রভু... আমায় বোধিচিত্ত দাও।

–হ্যাঁ হ্যাঁ বোধিচিত্ত পাবে... তার আগে বিবাহ করে চিত্ত মাঝে ইন্দ্রিয় সুখ জাগাও। মরজীবনের ইন্দ্রিয় সুখ মেটাও।

–প্রভু... প্রভু।

–আবার কেন...

–প্রভু আমি তো ইন্দ্রিয় সুখ দমন করতে চাই বোধিচিত্ত চাই। তুমি কেন ইন্দ্রিয় সুখ জাগাতে বলো... বলো প্রভু বলো।

–তবে... শোনো কাহ্নু যাকে দমন করবে তাকে না জাগলে দমন করবে কীভাবে।

–প্রভু।

–আমার কথা মনে রেখে বিবাহ করো। তারপর... তারপর তুমি বোধিচিত্তের পথে এসো। কাহ্নু এসো কিন্তু বোধিচিত্তের পথে... এসো কিন্তু...

–প্রভু... প্রভু... প্রভু

এইভাবে চিৎকারে কাহ্নু খুব বেশিক্ষণ প্রভুকে অনুসরণ করতে পারে না। কেননা বজ্রাচার্য প্রভুকে শাস্ত্রীয় আরও বহু করণ-কাজের জন্য দূরে ছুটে যেতে হয়। বজ্রাচার্য প্রভু চোখের আড়ালে চলে গেলে কাহ্নু নিজগৃহে ফিরে আসে।

দুই

কাহ্নুর চেতনা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বজ্রাচার্য প্রভুর কথাগুলো মুছে যায় না। বরং তা আরও সুতীব্র ধ্বনির আকারে তার শ্রবণে ফিরে ফিরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

–'বিবাহ... হ্যাঁ হ্যাঁ বিবাহ... তোমার চেতনার গভীরে পিপাসা রয়েছে... বিস্তর পিপাসা... বিবাহ করে সেই পিপাসা মেটাও... বিবাহ করে চিত্ত মাঝে ইন্দ্রিয় সুখ জাগাও... তারপর মরজীবনের ইন্দ্রিয় সুখ মেটাও... এবং ইন্দ্রিয় দমন করে বোধিচিত্তের পথে এসো... হ্যাঁ হ্যাঁ বোধিচিত্তের পথে আসতে বিবাহ করো... বিবাহ করো।'

কিন্তু কাকে সে বিবাহ করবে। সে তাকে বোধিচিত্তের পথে ইন্দ্রিয় সুখ দেবে। কোন সে মহৎ নারী... । কাহ্নু ভাবতে থাকে–

–কে সে। কে আমাকে দেবে বোধিচিত্তের পথে ইন্দ্রিয় সুখ... এমনকি অবাধ্য ইন্দ্রিয় দমনের পরমশক্তি... কে সে... কে।

এমনই ভাবনার মধ্যে বোধিচিত্ত প্রার্থী কাহ্নু যুগল চোখের অঝর ধারায় ভাসতে থাকে আবেগে–প্রভু তাকে নিলো না... তবে সে কেন গিয়েছিল বজ্রাচার্যের বোধিচিত্ত দানের আসরে... আর কেন-ই-বা সে আছড়ে পড়ল প্রভুর যুগল পায়ের উপর। এর আগে বোধিচিত্ত দানের আসর থেকে প্রভু তো কাউকে কোনোদিন বিমুখ করেন নাই।

কিন্তু কাহ্নুকে কেন বিমুখ করলেন তিনি। কেন। এই একটি মাত্র প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে কাহ্নু নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে ওঠে–

–হায় প্রভু... আমার নিশ্চয় দেহ শুদ্ধি ঘটে নাই। কিন্তু আমি। এই আমি কি করে আমার দেহ শুদ্ধি ঘটাতে পারি–হে প্রভু তোমার কৃপা বিনা। প্রভু হে প্রভু... ।

কাহ্নুর দেহ কাঁপানো নিঃশব্দ-□ন্দনের যন্ত্রণা দেখে কাহ্নুমাতা কেঁদে ওঠেন। আর এই □ন্দনের মধ্যে কাহ্নুপিতা উপায় খুঁজতে থাকেন মনে মনে। অকস্মাৎ তার চেতনায় উপায় এসে ভর করে। তিনি মাথায় আসা কথাকে মুখে তুলে এনে বলতে থাকেন–

–বিবাহ... হ্যাঁ বিবাহ। বিবাহ-ই একমাত্র উপায়... আমি তো বিবাহেই বেঁধে আছি সমগ্রজীবন... কাহ্নুকেও এই মন্ত্র বেঁধে ফেলতে হবে। বাঁধতে হবে বিবাহে... ।

স্বামীর এমন কথার মধ্যে কাহ্নুমাতা একটুও স্বস্তি খুঁজে পান না। তিনি আরও অধিক কেঁপে উঠে স্বামীকে বলেন–

–তুমি তো কোনোদিন বোধি চাওনি স্বামী... কাহ্নু তো বোধি চেয়েছে... যে বোধি চায় সে একদিন না একদিন গৃহত্যাগী হয়ই হয়। কাহ্নু তো সেই বোধিচিত্ত চেয়েছে। তোমার সাথে তাই ওর তুলনা চলে না। তোমার সাথে ওরে বিস্তর ফারাক।

–হ্যাঁ হ্যাঁ বিস্তর ফারাক। তবু আমার মন বলছে... ওকে বিবাহ দিয়ে মোহিনী কন্যার মোহে বাঁধতে হবে। একটা মোহিনী কন্যা যদি কোথাও পাই আমি... তার সাথে কাহ্নুর বিবাহ দিলে কাহ্নু আর কোনোদিন গৃহত্যাগী হতে চাইবে না...

–তা কি সম্ভব কোনোদিন?

–সম্ভব। আমি বলছি সম্ভব। কাহ্নুর বিবাহ হবে মোহিনী কন্যার সাথে... সেই কন্যাই কাহ্নুকে বেঁধে রাখবে গৃহে। আমি এখনই যাচ্ছি সেই মোহিনীর সন্ধানে। তুমি যাও বুদ্ধ মন্দিরে... ।

মোহিনী কন্যার সন্ধানে কাহ্নুপিতা বেরিয়ে যেতেই কাহ্নুমাতা পুত্রকে গৃহে ধরে রাখার আশা পেয়ে বুদ্ধ মন্দিরে ছুটে যান।

–হে ভগবান বুদ্ধ। আমরা তোমার বন্দনা করি। আমাদের গৃহেই যেন তোমাকে বারবার খুঁজে পাই। তুমি সুখ হয়ে আমাদের সংসারে থাকো... তোমারই আশীর্বাদে বোধিচিত্তের স্বাদ আমরা যেন নিত্যকর্মের মধ্যেই নিত্য খুঁজে পাই।

এভাবেই এক পরিবার পরিমণ্ডলে তিন তিনটি সদস্যের মধ্যে চলতে থাকে ত্রিবিধ প্রচেষ্টা এবং টানাপোড়েন। যার একদিকে বোধিচিত্ত প্রার্থনায় কাহ্নু নিঃশব্দ □ন্দনে ভেসে যায়–অপরদিকে তারই মাতা তাকে অন্তরতম পুত্র জ্ঞানে গৃহ-মন্দিরে ধরে রাখবার জন্যে অকৃত্রিম বুদ্ধ বন্দনায় সশব্দে কেঁদে চলেন আর তার পিতা তাকে গৃহে আসক্ত রাখতে পদব্রজে মোহিনী কন্যার সন্ধানে ঘুরে ফেরেন দেশে দেশে। অশেষ ক্লেশ তাকে ক্লান্ত করে না। মোহিনী কন্যাকে তার চায়ই চায়। অবশেষে এক দিন সুদূর জিনউরে সন্ধান মেলে মোহিনী কন্যার। নাম তার ডোম্বী। তার সঙ্গেই তিনি কাহ্নুর বিবাহ স্থির করে ফেলেন।

তিন

কাহ্নু-ডোম্বীর বিবাহ আয়োজনে বঙ্গাল আর জিনউরের মানুষের মাঝে উৎসব পড়ে যায়।

বিবাহ কি-জয়।

বাতাসে বাদ্য বেজে ওঠে। বাদ্যেরা বাতাস নাচায়। বাতাসেরা উম্মন উম্মাদ। বাজছে কশালা-দুন্দুহি। বাজছে শঙ্খ। বাজছে পড়হ-কর । এইসব বাদ্যের মধ্যে ধ্বনির মন্ত্রণা–বিবাহের।

বিবাহ কি-জয়!

বিবাহের এই আয়োজনে জিনউরের মোহিনী কন্যা ডোম্বীকে আনা হচ্ছে ময়ূরের বেশে। ময়ূরের ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি বহুবর্ণী পুচ্ছ পরিহানে আজ তার এই রূপ। দুলছে গুঞ্জার মালা। অধর দাড়িম্ব কুসুমরঙা আর এক আম্বল পাতা কী মনে করে উঠেছে ললাটে। আহা তার লাজুক সবুজ রঙে চমকিছে ভুবন... তুমি কোন বনের ফুল গো জুড়ে বসেছো চুলের ঝুটিতে।

এত সব সাজ বর্ণের মধ্যেও ডোম্বী তার বিবাহ পথে পাহাড় দেখে কেঁপে কেঁপে ওঠে–দেখো দেখো পাহাড়েরা কত একা। কেমন একা একা ছাড়া ছাড়া বধির দাঁড়িয়ে পাশাপাশি–তথাপি যেন কেউ কারো নয়। আর পাহাড় গাত্রের বৃক্ষকুল–তারাও একা... কেবলই একা। একা ওই সেগুন–ছায়াবৃক্ষ। ওদের কোনো শাখা-প্রশাখা নেই যে ছুঁয়ে দেখবে পাশের বৃক্ষটিকে।

হায় পাহাড় কেন তুমি এই পথে একাকিত্বের সংসার দেখালে। কেন। তুমি কি জানো না আমি যাচ্ছি বিবাহ আসরে–বিবাহে। আমার পিছনে ফেলে যাচ্ছি মায়ের সংসার। হায় পাহাড়িয়া ছড়া–তুমিও একা। পাহাড়ের রোদন হয়ে একা একা কোথা যাও তুমি।

আমাকে এরা নিয়ে যাচ্ছে বিবাহের আয়োজনে–এদের মধ্যে আমিও যে তোমার মতো একা... একা। নাকি এ বিবাহে আমি তোমাদের মতো একা হয়ে যাবো–চিরদিন তোমাদের মতো আমাকেও একা হয়ে থাকতে হবে।

না না... এ হতে পারে না... তাছাড়া বিবাহে কি কেউ কোনোদিন একা হয়। এ যে যুগলবন্ধনের ব্যাপার। একথা ভাবতেই ডোম্বীর মনে মৃদু আনন্দ হয়। আর তখনই কাহ্নুদের দুয়ারে ধ্বনিত উলুর বিস্তার–উলু উলু উলু।

কন্যাকে নিয়ে কন্যাযাত্রীকুল পৌঁছে গেছে কাহ্নুদের দুয়ারে। উলু উলু উলু।

বক্ষী এসে ডোম্বীকে নিয়ে বিবাহ আসরে বরের আসনে আসীন কাহ্নুপার্শ্বে বসায়। শুরু হয় অভিভাবকের বিবাহের মন্ত্রণা–

'পুরত্থিমায দিসায, দক্ষিণায দিসায, পচ্ছিমায দিসায, উত্তরায দিসায, পুরত্থিমায অনুদিসায, দক্ষিণায অনুদিসায, পচ্ছিমায অনুদিসায, উত্তরায অনুদিসায, হেট্ঠিমায দিসায, উপরিমায দিসায, সব্বে সত্তা, সব্বে পাণা, সব্বে ভূতা, সব্বে পুগ্গলা, সব্বে অত্তভাবপরিযাপন্না, সব্বে দেবা, সব্বে মনুস্সা, সব্বে অমনুস্সা, সব্বে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহারন্তু, দুক্থা মুঞ্চন্তু, যথালব্ধ-সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা। ইমিনা মেত্তানুভাবেন জযম্পতিনো সব্বে উপদ্দবা বিনাসমেন্তু।'

এই মন্ত্রের মাধ্যমে বরকন্যার ওপর থেকে সকল প্রকার উপদ্রব বন্ধ করা হয়। আর মন্ত্র শেষে বিবাহ-মন্ত্রণাদাতা অভিভাবক ভূমিতে নতজানু হয়ে গুরুকে প্রণাম করেন। সে সময়ে ভিক্ষুপ্রধানের মন্ত্রণা। তিনি নিজ আসনে বসেই বিবাহের মূল পর্বে প্রবেশ করে বলতে থাকেন–

'সম্মাসম্বুদ্ধং নমামি, দুতিযং আচরিযং নমামি, ততিযং ততিযং তিরতনং শরনং গচ্ছামি।'

'বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি
ধর্মং শরনং গচ্ছামি
সংঘং শরনং গচ্ছামি
সব্বে সত্তা সুখী তা হোন্তু।'

'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।'

ভিক্ষুপ্রধান আসন থেকে উঠে কাহ্নুর দক্ষিণ হস্তে একটি মঙ্গলতন্তর কিছু অংশ বেঁধে–বাকি অংশ ছিন্ন করে ডোম্বীর দক্ষিণ হস্তে বেঁধে দিতেই আসরে নারীকণ্ঠের উলুধ্বনি ওঠে–উলু লু লু।

কন্যা হলো বহুড়ী। উলু উলু উলু। এবারে মঙ্গলাচরণে বর-বহুড়ীর মাথার উপরে জল ছেটানো হয় হাতের আঙুল দিয়ে–

জয় জয় মঙ্গলং বোধিপল-ঙ্কং'ব
জয় জয় মঙ্গলং ধম্মচক্কং'ব
জয় জয় মঙ্গলং সব্বগুণ-পাণীনং'ব
জয় জয় মঙ্গলং ঞাণদিত্তিং'ব
জয় জয় মঙ্গলং সাধু সুপ্পতিট্ঠিতানং'ব।

এমনি মঙ্গলাচরণে ভিক্ষুপ্রধান কন্যা সম্প্রদানে কাহ্নুকে বলেন–

'তুযহং দীঘরত্তং হিতায সুখায ইমং কঞ্ঞং গণহাহি।'

কাহ্নুর হাতে ডোম্বীর হাত তুলে দিয়ে ডোম্বীর দক্ষিণ পায়ে কাহ্নুর উত্তর পা সংযুক্ত করে আরও বলেন–

'ইদং পাদদ্বযং সম্বন্ধ করণং তুমহাকং যাবজীবং অঞ্ঞমঞ্ঞগিহীধম্মং সমাদনায চেব কুসলকম্মং করণায চ অবিসংযোগস্স পচ্চযো হোতু।'

আজ হতে তোমরা একসাথে পথ চলবে একসাথে এগিয়ে যাবে এই অর্থে তোমরা দম্পতি হলে। বিবাহিতা আহরিউজাম। বিবাহ করে নবজন্ম আহরিলে।

উলু-উলু-উলু। বিবাহের আনন্দধ্বনি ওঠে বাতাসে। বিবাহ কি–জয়।

এবারে বর-বহুড়ী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিশোর-কিশোরী–তরুণ-তরুণী। তারা গায় বিবাহ-সংগীত-নৃত্যের ছন্দে দুলে আনন্দে অতিথি প্রণাম করে। বর-বহুড়ীকে ঘিরে তাদের সে নৃত্য-সংগীত হয় পুষ্প বৃষ্টিময়–

জয় জয় ধ্বনি পটহ-মাদলে
মন আর পবনেতে
কাঁশি আর ঢোল বাজিছে উছল
বিবাহে চিত্ত মাঝেতে
দুন্দুভি বাজে 'তাক ধিনা ধিন'
চিত্তজয়ের সাথে ॥
বিবাহ করল কাহ্নু যদি
ডোম্বী মোহিনীকে
মোহের মায়ায় বেঁধে গেল সে
ডোম্বীর দেহ-বুকে
রও কেন চুপ ডোম্বী মোহিনী
মোহে ডেকে দাও তাকে ॥

এমনই গীতি-নৃত্যের মধ্যে তারা কাহ্নুকে দিয়ে ডোম্বীর গলে আর ডোম্বীকে দিয়ে কাহ্নুর গলে মালা পরায়। কেহ-বা ডোম্বীকে দিয়ে কাহ্নুর মুখে–কাহ্নুকে দিয়ে ডোম্বীর মুখে মিষ্টান্ন তুলে দেয়।

এ আসরে বর-কন্যা পক্ষের কেউ কেউ আবার রস বিস্তার করতে বাক্য-যুদ্ধে মেতে ওঠে। বরপক্ষের একজন হঠাৎ দাবি করে বসে–বিবাহের মাধ্যমে ডোম্বী আজ বরপক্ষের হয়ে গেছে। সেখানে তাই কন্যাপক্ষের উপস্থিতি বেমানান এবং বিরক্তিকর। এমন কথার সূত্র বিস্তার করে বরপক্ষের একজন হঠাৎ বলে ওঠে–

–আমাদের বৌদিকে তোমরা বিরক্ত করো না।

সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপক্ষের ভেতর থেকে প্রতি□য়া আসতে দেরি হয় না। তাদের ভেতর থেকে একজন বেশ ঝাঝালো স্বরে বলে ওঠে–

–উহ দরদ যেন উথলে পড়ছে। বোনটাকে কষ্ট করে বড় করে তুললাম তখন কোথায় ছিল অমন দরদ...

–কথায় বলে না মার থেকে মাসির দরদ বেশি।

কন্যাপক্ষের এই সব কথার পিঠে জোড়া লাগাতে বরপক্ষের তরুণগণও কম দক্ষ নয়–তারা কন্যাপক্ষের কথার মধ্যে জেতার প্রত্যাশায় যোগ করে–

–বলি মাসি তো মায়েরই বোন।

–যদি সৎ বোন হয়...

কিন্তু না বরপক্ষের তরুণদের আর জেতা হলো না। কন্যাপক্ষের কিশোরীদের এমন কথায় তারা খেই হারিয়ে ফেলে। সাথে সাথে কন্যাপক্ষের কিশোরীরা বরপক্ষের তরুণদেরকে পরাস্ত করতে পেরেছে বলে উপহাসের স্বরে হো হো করে হাসির শব্দে ফেটে পড়ে।

সেই মুহূর্তে পরিহান আঁচল ভরে পুষ্প-খই-মিষ্টান্নকণা এনে বঙ্কী বৌদি উলু ধ্বনিতে ছিটিয়ে দেয় সবার মাথার উপরে।

উলু... লু... লু... ।

বিবাহ-অনুষ্ঠানে ছুটে আসা শিশু-কিশোরেরা ছিটানো সেই খই-মিষ্টান্ন পুষ্প বহু যত্নে কুড়িয়ে নেয় হাতে। তারা বিশ্বাস করে বিবাহ আসরে কুড়িয়ে পাওয়া খই-মিষ্টান্ন খেলে তারা সুস্থ দেহের অধিকারী হবে আর পুষ্প তাদের বৃক্ষে দিলে সেই বৃক্ষ ফল-পুষ্পবতী হবে।

চার

সন্ধ্যা অতি□ান্ত হয়। বঙ্কী বৌদি ডোম্বীকে ধরে শয্যাগৃহের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলে–

–আজ হতে আমি তোর বোন... দিদি বলিস... আমি কাহ্নুর বৌদি। এইদিনে তোর জন্যে আমার প্রার্থনা... বেদনা কষ্ট যেন তোকে স্পর্শ না করে...

–দিদি!

ডোম্বীর মায়া ছড়ানো বিস্ময়ের 'দিদি' উচ্চারণে বঙ্কী তার মুখের দিকে তাকায়। ডোম্বী সে ক্ষণে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে–

–দিদি... আমার অন্তর কাঁপে দিদি।

–কেন রে ডোম্বী।

–সুখ-শান্তির আশীর্বাদ বদলে তুমি কেনো বেদনা-কষ্ট...

–বেদনা-কষ্ট স্পর্শ না করার আশীর্বাদ করেছি–তাই তো।

–দিদি।

–কারো কারো জীবনে এই তো সত্য রে ডোম্বী... ।

–তুমি কি আমার কথা বলছ দিদি।

–ডোম্বী ভয় কিরে... তোকে দেখে আমার মন বলছে–কাহ্নু একবার তোর মায়ায় জড়ালে সে আর মুক্তি চায়বে না... বোধিচিত্ত চাইবে না।

–দিদি... আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

–সংসার-তরঙ্গে শক্ত করে হাল ধরে রাখবি... কাহ্নু যেন তোকে ভর করে ওপারে চলে না যায়... কাহ্নু যেন তোকে আশ্রয় করে কেবলই ভাসতে থাকে আনন্দ-সংসারে... তুই পারবি না।

–দিদি।

–আমার বিশ্বাস তুই পারবি... তুই-ই পারবি কাহ্নুকে চিরদিনের জন্য আঁটকে রাখতে... তোকে পারতেই হবে ডোম্বী... পারতেই হবে।

এমন সব কথা বলে বঙ্কী বৌদি নব বহুড়ী ডোম্বীকে তার বাসর-শয্যাগৃহে পৌঁছে দিয়ে দ্রুত বের হয়ে আসে।

ডোম্বী এবার একা। বাসর-গৃহের একাকিত্বে কেন যেন তার বঙ্কী বৌদির বলে যাওয়া কথাটাই শুধু মনে হয়। সাথে সাথে তার শরীরটা হিম হয়ে আসে। সে হিম শরীরে ডোম্বী থরথর করে কেঁপে ওঠে... কেঁপে ওঠে তার হৃদয় কুসুম।

পাঁচ

শয্যাগৃহের পূর্বপার্শ্বের খোলা জানালা দিয়ে পূর্ণিমার একা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ডোম্বীর চোখে পড়ে সেই একা চাঁদ। চাঁদের সেই একাকিত্ব ডোম্বীর বুক আরও অধিক কম্পন এনে দেয়। সেই কম্পনে ডোম্বী ওই চাঁদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই খোলা দুয়ারে হাস্যরত কাহ্নুকে দেখতে পায়।

কাহ্নু ঘরে ঢুকে দুয়ার বন্ধ করে পূর্বদিকের খোলা জানালায় চোখ রেখে বলে–

–জানালাটা খোলা কেন–দাঁড়াও বন্ধ করে দেই–আজ আমাদের প্রথম শয্যা।

কাহ্নু এগিয়ে গিয়ে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দেয়। ডোম্বী এতক্ষণে যেনবা স্বস্তি খুঁজে পায়। তাই সে মনে মনে বলে–'জানালা দিয়ে দেখা ওই একা চাঁদ আমার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল... আমাকে তুমি বাঁচালে স্বামী একান্তে প্রথম সাক্ষাতে... এখন আমার বুকে অনাবিল স্বস্তি ফিরে এসেছে... কেননা তুমি ওই জানালা দিয়ে দেখা একা চাঁদকে আড়াল করেছো।' ডোম্বীর এমত ভাবনা আর মনকথার মধ্যে কাহ্নু তার মুখের দিকে চায় এবং বলে–

–আমি আকাশের চাঁদকে আড়াল করে দিয়েছি কেন জানো ।

কাহ্নুর এমন কথায় ডোম্বী মনে মনে নিঃশব্দে উত্তর করে–

–তুমি জেনে গেছো ওই একা চাঁদ আমার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল ।

–বলতে পারলে না । আমি বলি শোনো... কেননা আমার ঘরে আজ তুমিই চন্দ্র । আকাশের চাঁদে আর কি হবে আমার ।

কাহ্নুর কথায় ডোম্বী খুশি হয়ে যায় । তবু তো আকাশে চাঁদ । তারই আলোকে এই গৃহে আজ জোছনার মৃদু মায়া । আর আকাশ বিধাতা জরির পোশাকে সেজে সারা বঙ্গালকে রাঙিয়ে রাখে একটি নব বাসরের আনন্দে । এই আকাশ আলোর আনন্দ কুসুম বা আলোক ঝলকানির কিছুই দেখে না নব দম্পতি কাহ্নু-ডোম্বী । কেননা তারা আছে বাসর-শয্যা পেতে গৃহের আনন্দ রসে ॥

কাহ্নু মোদিত ডোম্বীকে পেয়ে । ডোম্বী তার কাঁচা সোনা । ডোম্বী তার প্রস্ফুটিত চন্দ্রমা । ওই ডোম্বী কাহ্নুকে মন্ত্র করেনি তো । কাহ্নু তার কেশাগ্র তুলে নেয় চোখের উপর । নাকে... ঠোঁটে সে আঙুল ছুঁয়ে দেখে । ঠোঁটের পাপড়ি যদি-বা ঝরে যায় সেই ভয়ে সে কি মধু নিতে ভুলে যায় । ও বৃক্ষ ডোম্বীদেহ এত পত্র এত সবুজ পেলে কোথায় । কাহ্নু তাকে প্রার্থনার বলয়ে কোনো মন্ত্রে যেন সম্মোহিত হয়ে যায় । আর সেই দশার মধ্যে বলতে থাকে–

–ও বৃক্ষ ডোম্বী । এত পুষ্প তোমার দেহে । কাহ্নু তোমার অধম ভোমর... তাকে তুমি গ্রহণ কর ।

এমত প্রার্থনায়-পূজায় রাত্রি অতি□ান্ত হয় । কাহ্নু তবু ঘর ছাড়ে না । তাই তো ডোম্বী বহুড়ী মুগ্ধ কাহ্নুকে বলে–

–এইভাবে যদি গৃহবাসী থাকো... ও স্বামী কী বলবে লোকে... আমায় রেহাই দাও ।

–আহারে আমার সোনা বহুড়ী প্রস্ফুটিত চন্দ্রমা... আমি যে তোমার আঁচলে বান্ধা তা কি তুমি চোখে দেখো না...

–কই আঁচল তো ফাঁকা

–শাড়ির আঁচলে আমি বান্ধা না । আমি বান্ধা মনের আঁচলে... দেহের আঁচলে ।

বাইরে তখন পাখিরা ডাকে । সূর্য হেসে মৃদু হয়ে আলোয় ভরিয়ে তোলে বৃক্ষ-লতা গৃহের সকল কোণ ।

ছয়

সকালে বঙ্গালের সকলে জেগে পূর্বাহ্ন কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । এই ব্যস্ততায় গৃহ নারীরাও পিছিয়ে থাকে নেই । বঙ্কী বৌদি ব্যস্ত হয়ে গৃহকর্ম করতে করতে কাহ্নু-ডোম্বীর বন্ধ দুয়ারের দিকে তাকায় এবং ভাবে–'কাহ্নু-ডোম্বী এখনও ঘরে । ওদেরকে ডেকে তোলা দরকার ।' এই ভাবনার ভেতর হঠাৎ সে এক সময় উচ্চস্বরে ডেকে ওঠে–

–আরে ও নয়া-বহুড়ী রাত কি তোমার গেল ।

উঠানের কণ্ঠে বাসরে মত্ত কাহ্নু-ডোম্বীর রসচারিতা ভেস্তে যায় । উভয়ে লজ্জিত হয় । নিজেকে সংযত করে খড় খড় করে দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসে ডোম্বী । বেরিয়েই লজ্জার রঙে লাল হয়ে সূর্যকে দেখে প্রণাম করার ভঙ্গিমায় । যার ফলে সে বিভঙ্গ । যেন কোনো দেবী লাল টুকটুকে বস্ত্র ভেদিয়া জ্বলছে সূর্যের সম্মুখে । সে কি তবে সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী... না-কি আরেক সূর্য । সে যদি সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকে–তবে সে আসলে কে । সূর্য যে হেলে পড়ে আর সে জ্বলতেই থাকে প্রেমে মুগ্ধতায় অপ্রেমে কিংবা বিপন্নতায় । কিন্তু আজ সে কথা নয় । আজ সে বিনীত লজ্জায় রাঙা ।

–লজ্জার কিছু নেই... নতুনকালে এরকম হয়... যা স্নান-ধ্যান করে আয় । তারপর কাজে-কর্মে আমার সাথে একটু হাত লাগাবি...

–আচ্ছা দিদি । আসছি...

ডোম্বী স্নান করতে এগিয়ে যায় কুয়াপাড়ে । কুয়াপাড়ে কদলীপত্রের শুকনো ঘের । এখানে এমন ছিল না বিবাহ উপলক্ষেই এই ঘের । কারণ নয়া বহুড়ী কি খোলা স্থানে স্নান করতে পারে... ।

সাত

কাহ্নু-ডোম্বীর সুখমিশ্রিত দাম্পত্য জীবন চিরসুখী হোক । সমগ্র জীবন তারা বেঁধে থাক গৃহে । এই একটাই কামনা কাহ্নুমাতার মনে । কিন্তু কাহ্নুর যদি বোধিচিত্তের কথা মনে আসে–তাহলে... তাহলে তো কাহ্নু গৃহত্যাগী হবে ডোম্বীর মায়া ছেড়ে । 'ভগবান বুদ্ধ তা যেন না হয়... ভগবান তুমি আমার কথা রাখো ভগবান ।' এই ভাবনার মধ্যে তিনি বড় ছেলে ভুসুকুকে ডেকে বলেন–

–ভুসুকু রে । ও ভুসুকু ।

–কিছু বলছো মা ।

–তুই এইবার সেই ব্যবস্থা কর ।

–কীসের ব্যবস্থা ।

–এই ভুলে গিয়েছিস ।

–বলো মা... কী করতে হবে বলো ।

–শুনেছি সূর্যমেলায় গৃহদেবীর মূর্তি পাওয়া যায় ।

–মেলায় তো মূর্তি পাওয়া যাবেই... ।

–গৃহদেবীর গোপনে স্থাপন করতে পারলে গৃহের মায়া কাটে না ।

–ও বুঝছি । কাহ্নুর ব্যাপারটা তো ।

–হয় রে বাপ হয়... তুই সূর্যমেলায় গিয়ে একটা মূর্তি এনে দে না... ।

–কিন্তু সূর্যমেলা তো বহু দূর ।

–যত দূরই হোক... তুই সূর্যমেলায় থেকে আমাকে একটা মূর্তি এনে দিবে... আমি মূর্তিটা ডোম্বীকে দিয়ে কাহ্নুর অজান্তে গৃহে বসাবো। তাহলে কাহ্নু কোনোদিন গৃহত্যাগী হতে পারবে না। তুই আমাকে একটা দেবী এনে দে রে ভুসুকু।

মায়ের এমন আকুল দাবীকে এড়িয়ে যেতে পারে না ভুসুকু। সে রাজি হয়ে যায়–

–ঠিক আছে মা। আমি যাচ্ছি... এক্ষুনি যাচ্ছি।

মায়ের কথামতো ভুসুকু দূর পথে ঘুরে ঘুরে সুদূর সূর্যমেলায় যায়। মেলার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে সে মন্ত্রের গৃহমূর্তির দোকান খুঁজে পায়। সেখান থেকে একটা মূর্তি কিনে গৃহে ফিরে আসার পথে মূর্তির দিকে বারবার তাকায় আর ভাবে–'এই হচ্ছে গৃহমূর্তি। এটা গৃহে স্থাপনে কাহ্নুর সাথে আমাদের কারোরই গৃহসাধ কখনই সমাপ্ত হবে না... এমনকি বোধিচিত্ত প্রার্থী কাহ্নু এর কারণেই সমগ্র জীবন গৃহে বেঁধে থাকবে। মাগো মা তোমার এই বিশ্বাস যেন সত্য হয়।' এমন মনকথার মধ্যে ভুসুকু বাড়ি ফিরে মাকে ডেকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে–

–মা মা। এই দেখো সেই গৃহদেবী মূর্তি...

ভুসুকুর ডাক শুনে মা বুদ্ধ মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন। আঙ্গনে ভুসুকুর হাতে গৃহমূর্তি দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। আর মুহূর্তের মধ্যে বুদ্ধ মন্দিরের দুয়ার থেকে আঙ্গনে ছুটে এসে ভুসুকুর হাতে ধরা গৃহমূর্তিকে প্রণাম করেন এবং বলেন–

–দেবী তুমি সুন্দর। দেবী গো তোমার মায়ামন্ত্রে কাহ্নু যেন আমার গৃহে বেঁধে থাকে চিরদিন।

গৃহমূর্তির উদ্দেশে বলা এই কথা আর প্রণামে মায়ের চোখে আবেগের জল চলে আসে। এর মাঝে তার পাশে দাঁড়ায় গৃহের বড় বহুড়ী বঙ্কী। তাকে কাছে পেয়ে মা চোখ থেকে নেমে আসা আবেগের জল মুছে বলেন–

–বহুড়ী মা।

–বলো মা।

–তুমি এ গৃহের জ্যেষ্ঠ বহুড়ী। নব বহুড়ী ডোম্বীকে বুঝিয়ে এই মূর্তি তুমি কাহ্নুর অজান্তে গৃহে বসাও।

–কেন মা।

–এটা গৃহমূর্তি। জানো না গৃহমূর্তির মন্ত্রের কথা। এই মূর্তির মন্ত্রে সকলে গৃহে থাকে। এর মন্ত্রের কারণেই কাহ্নু আমাদের গৃহে বেঁধে থাকবে। ওর আর বোধিচিত্তের কথা মনে হবে না।

–ও সেই কথা।

–আর শোনো পবিত্র হয়ে এই মূর্তি স্থাপন করতে হবে... ডোম্বীকে তুমি পবিত্র করে নিও... সাবধান এই মূর্তি স্থাপনের কথা ডোম্বী যেন কাহ্নুকে কিছুতেই না বলে... কাহ্নু জেনে গেলে মূর্তির ক্ষমতা লোপ পাবে... যাও বঙ্কী যাও... ডোম্বীকে নিয়ে আমাদের গৃহের অশ্বত্থ তলায় মূর্তি বসিয়ে দাও।

–আচ্ছা যাচ্ছি মা...

বঙ্কী স্বামী ভুসুকুর হাত থেকে মূর্তি নিয়ে পরম ভক্তিতে এগিয়ে যায় ডোম্বীর দিকে। ডোম্বী তখন পবিত্র ছিল। বঙ্কী তাকে বুঝিয়ে মূর্তিটিকে গৃহকোণের অশ্বত্থ ছায়ায় স্থাপন করে দেয়। এতে কাহ্নু মাতার মনের সংশয় দূর হয়। আর একটি মূর্তি স্থাপনের তৃপ্তিতে ডোম্বীর মনের আনন্দ পৃথিবী বিস্তৃত বায়ুতে মিশে অশ্বত্থ পাতার সাঁইসাঁই করে নড়ে ওঠে–বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি ॥

আট

ডোম্বীর হাতে গৃহমূর্তি স্থাপনে এ গৃহের দিবারাত্রি যেনবা বেশ সুখে সুখে অতিক্রান্ত হতে থাকে। এরই মাঝে প্রগাঢ়তা আসে এই গৃহের দুই বহুড়ীর। একজন ভুসুকু বহুড়ী বঙ্কী। অন্যজন আমাদের কাহ্নু বহুড়ী ডোম্বী। আর বোধিচিত্ত প্রার্থী কাহ্নুর কী দশা।

উত্তর একটাই–আর তা হচ্ছে–ডোম্বীর সঙ্গে যো কাহ্নু রত্ত। খনহ ন ছাড়াই সহজ উন্মত্ত। ডোম্বীর প্রেমে সহজ উন্মত্ত কাহ্নু তাকে ধরে রাখে নিত্য-নব প্রেম-আলিঙ্গনে।

পৃথিবীতে সে-ই সুন্দর প্রেম। যে প্রেমে মানবাত্মার অন্তরশীর্ষ স্বদেহের পোশাকি ছন্দে ধরা দেয় এবং দেহ জোড়া প্রসারতায় হতে থাকে সূর্যের উদয়–মধ্যাহ্ন ও অস্তের অনিন্দ্যলীলা। এর নাম কামার্থ প্রেম। এতে করে প্রেমময় যুগল একাঙ্গরূপ হয়–আর সেই একাঙ্গরূপ লীলার নাম দেওয়া যেতে পারে শস্য সাধন। অথবা তার রূপক বর্ণনায় নদী আর নাঙ্গিয়ের তুলনা করা যেতে পারে। কেননা–যুগলের একাঙ্গ হওয়াকে নদীতে নাঙ্গি ভাসার মতোই মনে হয়।

তাছাড়া তখন কাহ্নু ভাবে–সে এক প্রমত্ত পারগামী কাহ্নু। আর তাকে নিয়েই ডোম্বী-মাঝির নাঙ্গি ভেসে ভেসে যায়। কখনো কাহ্নুর মনে হয়–জীবনের সুরতসঙ্গের নদীতে ডোম্বী-ই নাঙ্গি আর সে নিজে মাঝি হয়ে প্রমত্ত নদীর ঢেউরাশিকে অতিক্রম করে যেতে চায়। সুরতসঙ্গে ভেসে কাহ্নুর মন-পবনে নিঃশব্দে যুগল ছন্দের সুর মাহাত্ম্যসূচক গান হয়ে বাজে–

দুটি অঙ্গ এক হলে পৃথিবীতে আসে আলো
দেহ-মন-প্রাণ সেই আলোতেই
করে ওঠে ঝলোমলো।
নদী বয় ঢেউয়ে টল টল
চলে অবিরল কলকল।
যেইজনা তুমি বেয়ে যাও নাঙ্গি
কাহ্নুস্বামীরে রেখো গো খেয়াল।
কূলে না ভিড়িয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাঙ্গি
ডোম্বী মাঝি গো বেয়ে যাও ছলাৎছল ছলাৎছল ॥

নয়

ডোম্বী-কাহ্নুর যুগল দেহের একাঙ্গরূপের মধুময় ীড়ার মধ্যে অবসর বুঝে বঙ্কী একদিন রসের কথা পাড়ে–

–এই যে ডোম্বীফুল। দেখ দেখ–মধু তুই থির করি চাল।

–দিদি কি যে বলঅ তুমি।

–ঠিকই কই রে ফুলের মধুর সবটুকু যদি পান করে ফেলে রসের ভোমর... তবে কি সে আর ফুল থাকে।

–দিদি

–ভোমরকে তোর ফুলে ধরে রাখা চায়। এর লাগি মধুটার কিছু লুকিয়ে রাখিস তোর দেহ-ফুলের ভাঁজে ভাঁজে।

কথার মধ্যে কাহ্নু চলে আসে–

–বৌদি ডোম্বীরে আবার কি কথা বলঅ?

–ডোম্বীরে শুধু নয়... তোকেও বলি।

–কী বৌদি।

–ওরে কাহ্নু ফুলের মধু তুই রেখে রেখে খাইস–এতেই তৃপ্তি... একেবারে নিঙড়ে খেলে পরে কি খাবি-বলতো।

–বৌদি না বলঅ এমন কথা... ডোম্বী ফুলের মধু শেষ ন হবার।

কাহ্নু তার কথার মধ্যে একবার আপনার বহুড়ী ডোম্বীর দিকে তাকায় এবং ডোম্বীকে লক্ষ করে বলে–

–বৌদিকে বলে দাও বহুড়ী... রসপানে আমরা আজ পাবত প্রাঙ্গণে যাবো।

–তা বেশ... ধন্য মানি তোদের...

–আমরা আনন্দ জানি... প্রকৃতির ভেতর মিশে যাবার আনন্দ ভালোবাসি...

প্রায় প্রায়ই তারা বেরিয়ে পড়ে গৃহ ছেড়ে প্রগাঢ় প্রকৃতির সান্নিধ্যে... যেখানে সেই 'নানা তরুবর মৌলিলরে গঅনত লাগেলী ডালী'... সেখানে তাদের মহাসুখের রাত্রি পোহাই। যে মহাসুখ কাহ্নুর হৃদয়-দেহকে প্রসারিত করে নিয়ে যায় দিগন্তের কাছাকাছি।

ওই তো আকাশে জেগেছে বর্ণিল তারকা-চন্দ্র। কাহ্নুর ডোম্বী সঙ্গের ভ্রমণক্ষণ সমাগত। ভ্রমণ প্রস্তুতিতে বৌদির কাছে রসিক কাহ্নু অনুমতি চেয়ে বলে–

–বৌদি পূর্ণিমা বয়ে যায়... আমরা আজকে পাবত প্রাঙ্গণে যাবোই...

–যা যা... রসের সময় কাহ্নু রসিকের তো আবার পুরোটাই উপলব্ধি করা চায়... যা...

–চলো বহুড়ী... চলো তাহলে...

দশ

রাতের অন্ধারিতে তারা পথ চলে। আহা অন্ধারি নয় চন্দ্র উঠেছে। তার মোহনীয় মুদ্রায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে মায়া। যে মায়ায় এক অভ্রান্ত স্বপ্নে মিশে কাহ্নু-ডোম্বী একাকার হয়ে যায় পাহাড়িয়া পথে যেতে। তাদের কোনো ক্লান্তি নাই... বিরাম নাই... হাঁটছে তারা আকাশ দেখে দেখে সপ্তর্ষির জিজ্ঞাসা পেরিয়ে শুকতারার মুখোমুখি। হেঁটে হেঁটে যেখানে এসে দাঁড়ায় সেখান থেকে স্পষ্টত বৃক্ষদের মাথার উপর দিয়ে শুকতারা দেখা যায়।

কাহ্নু-ডোম্বী সেই পাবত প্রাঙ্গণের নির্জনা বনমধ্যে চন্দ্রিমার মোহনীয় ঢেউয়ে ভেসে মায়ায় যেনবা পাখি হয়ে যায় অথবা হয়ে যায় চন্দ্র-তারকার ভ্রাতৃ-ভ্রাতা বা পুত্র-কন্যা। তাই তো তারা কথা বলে ওঠে শুকতারাটির সাথে আকাশের সাথে–

–কে এই আকাশ... জানো বহুড়ী।

–না তো

–আমি জানি। আকাশ হচ্ছে চাঁদ-তারাদের পিতা... আকাশের তাই মৃত্যু নাই।

–কেন।

–আকাশের মৃত্যু হলে চাঁদ-তারা কোথা যাবে। ওদের জন্যেই তো আকাশের মৃত্যু নাই কোনোদিন। জানো–বহুড়ী ঠাকুরদা বলতো মৃত্যু হলে মানুষেরা তারা হয়ে যায়। আর আমার মনে হয়–জন্মের আগেই আমরা তারা ছিলাম... চাঁদ ছিলাম। তাই তো চাঁদের প্রতি তারার প্রতি গভীর মমতায় বারবার ফিরে ফিরে চাই আকাশ পিতার দিকে... তারকা ভ্রাতৃর দিকে... চন্দ্রের দিকে। এ আমার কথা। কিন্তু ঠাকুরদার মতো আমি মৃত্যু হলে আকাশে ফুটে উঠবে আরেকটি তারা।

–না...

–কি না।

–মৃত্যু না... তারা না... না।

ডোম্বীর এই কথার মধ্যে ভীষণ অস্থিরতা বোধ করে। তার চোখে-মুখে যার প্রতিবিম্ব দেখে কাহ্নু বিস্মিত হয়–

–কি হলো... অমন করছো। নিশ্চয় দুর্বল হয়ে পড়েছো... আগে জানলে তোমাকে এতো দূর...

–না... আমার কিচ্ছু হয়নি... তুমি শুধু তোমার ওই কথাটা ফিরিয়ে নাও।

–কোন কথা... ওই যে মৃত্যু... তারা...

–কেন... ও কথায় আবার কি হলো।

–বুঝতে পারছো না... আমার গর্ভে তোমার সন্তান...

–সন্তান। সত্য বলছো তো।

–হ্যাঁ সত্য...

–আহ্ বহুড়ী... এ আনন্দে আর এখানে নয়... চলো গৃহে ...

কাহ্নুর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যেই বঙ্গালে চলছে আরেক আয়োজন।

এগারো

বঙ্গালে এসেছে বুদ্ধ নাটকের দল। এবারে বুদ্ধ নাটকে বজ্রাচার্য প্রভু বোধিনৃত্য করবেন। বঙ্গালে তাই আনন্দ-উত্তেজনার ঢেউ প্রবহমান।

বঙ্গালের ছেলেরা দল বেঁধে গৃহে গৃহে নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানায় কর -কশালা বাজিয়ে নৃত্য ও গানে। আমন্ত্রণ-গানের সাথে তারা বুদ্ধের নামে নাট্যশিল্পীদের জন্যে প্রসাদ-অর্থ সংগ্রহ করে গৃহে ঘুরে ঘুরে। ওই তো তারা এসেছে কাহ্নুদের গৃহে–

এই যে এসেছি মা ভিক্ষা নিতে
বুদ্ধের নামে তোমার দ্বারে ॥ বুদ্ধ গো...
এই এসেছি মা ভিক্ষা নিতে
বুদ্ধ নাটক হচ্ছে গ্রামে ॥ বুদ্ধ গো...
এই যে কুলোয় করে প্রসাদ এনে
দাও আচলে তুলে ॥ বুদ্ধ গো...
এই যে নাটকেরও আসর হবে
সন্ধ্যাকালে বৃক্ষ তলে ॥ বুদ্ধ গো...
এই যে বলি যে বিনয় করে
এসো সব দলে দলে ॥ বুদ্ধ গো...

গ্রামের বহু গৃহ ঘুরে তারা যখন কাহ্নুদের গৃহে আসে তখন ডোম্বীর অনুপস্থিতিতে কুলো ভরে নাটকের প্রসাদ নিয়ে এগিয়ে আসে বঙ্কী। সহসাই কর-কশালা নিনাদিত নৃত্য-গীত বঙ্কীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। যেন-বা পৃথিবী আরাধ্য প্রকৃতির সন্ধান পেয়ে নাচিছে গাহিছে করুণা-পুরুষ। অথচ এই গীতি-নৃত্যে-বাদ্যের মধ্যেই বঙ্কী-প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ তার কম্পমান হাত থেকে পৃথিবী পিষ্ঠে কুলাসমেত প্রসাদ পড়ে যায়। সাথে সাথে গীত-বাদ্য-নৃত্য থেমে যায়। সে সময়ে প্রগাঢ় অপরাধবোধে বঙ্কী যেন নিজেকে নিয়ে নিজের ভেতর প্রবেশ করতে চায়। পারে না।

প্রসাদ না নিয়ে বঙ্কীকে অতি□ম করে চলে যায় গীতি-নৃত্যের দল। বঙ্কীর হাত হতে বুদ্ধ নাটকের প্রসাদ পড়ে গেছে। এ যে গুরুতর অন্যায়। নীরব কষ্টে বঙ্কী ঝিম মেরে বসে পড়ে গৃহের দাওয়ায়। এসময় কার্পাস ফোটা জোছনায় কাহ্নু-ডোম্বী বহন করে আসে পরম সুখসংবাদ–'তাদের ঘরে সন্তান আসছে'। গৃহে পৌঁছে কাহ্নু উচ্ছ্বাসে বৌদির কাছে বলতে থাকে–

–বৌদি বৌদি... জানো ডোম্বী আজ কী সংবাদ দিয়েছে আমার...

কাহ্নুর উচ্ছ্বাসে বঙ্কীকে নির্বিকার দেখে ডোম্বী বলে ওঠে–

–দিদি কী হয়েছে তোমার।

ডোম্বীর কথায় বঙ্কী সহজ হয়ে কথা বলতে চেষ্টা করে–

–না। কিছু না... বল কাহ্নু কী বলতে চাচ্ছিলি বল... আমার কিচ্ছু হয়নি।

–না বৌদি আগে তোমার কথা বলো... আমার মনে হচ্ছে তুমি কী যেন কী লুকাতে চাচ্ছো...

–হ্যাঁ দিদি বলো... কী হয়েছে তোমার। গ্রামে আজ বুদ্ধ নাটকের আনন্দ... অথচ তুমি এমন করে আছো কেন।

–ডোম্বী। ডোম্বীরে আমার হাত হতে বুদ্ধ নাটকের প্রসাদ পড়ে গেছে।

–প্রসাদ পড়ে গেছে... তোমার হাত থেকে... বৌদি...

–থামো। দিদি শুনেছি বুদ্ধ নাটক দেখলে সব অপরাধ খণ্ডন হয়... চলো আসরে যাই... ওই তো আসর বসেছে... বাদ্য বাজছে... চলো...

ডোম্বীর কথায় বঙ্কীর অপরাধ খণ্ডনের প্রত্যাশায় বাড়ির সকলে মিলে দল বেঁধে বুদ্ধ নাটক দেখতে যায়।

বারো

বুদ্ধ নাটকের আসরে চলছে প্রার্থনাপর্ব। বিচিত্র বাদ্য-বাদনের মধ্য দিয়ে সুরে গানে প্রার্থনা পর্ব চলতে থাকে।

আসরের সবাই জানে একটি কথা–আর তা হচ্ছে–'বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥' কেননা এই নাট্যে পাত্র-পাত্রীকে হতে হয় পরিশুদ্ধ। দেখো ওই বীণাপাদ বীণার তন্ত্রিতে তোলে ধ্বনি। যে ধ্বনিতে নর্তক বজ্রাচার্য গায়ক দেবী এমনকি বীণাপদও ধ্যানী হয়ে মেঘগম্ভীর ধ্বনি করে। ওম্ ওম্ ওম্ ॥ এই ধ্যানে তারা পাখি হয়। উড়ে যায় দূরে। দূর থেকে আপনাকে দেখে। দেখে আপনার অগ্র-পশ্চাৎ। দেখে পঞ্চ ইন্দ্রিয়। তারপর ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে হয়ে ওঠেন পরম শূন্য। এ যেন নির্বাণ। দেখো তাদের মুখে ভাসে শান্তি রেখা। আর তারা নেমে পড়েন বুদ্ধ নাটকে।

ওম্ ওম্ ওম্ ॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥ ধ্রু
আগুন হয়ে সূর্য যে যায় পাটে
সেই আগুনে চন্দ্র জেগে ওঠে
সেই আগুনের হলুদ হলুদ রঙ
উছলে পড়ে রাতের প্রদীপ হয়ে ॥
বাজছে হেরুক বীণা
সুর যে তাহার চেনা
তার করুণা ছড়িয়ে পড়ে
আকাশে বাতাসে ॥
আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে

কাঁদে সকল তারা
তার করুণা ছড়িয়ে পড়ে
বাজছে হেরুক বীণা ॥
বজ্রাচার্য নৃত্য করেন
দেবী করেন গান
বুদ্ধ নাটক হয়ে যে বিষম
বলেন পাদগণ ॥
–শোন শোন মন্ত্রীগণ শোন মন দিয়ে ।
কুমার বাহিরে যাবে রাখি যে জানায়ে ।
নগর সাজাও তাই দুঃখ সরায়ে ।
কেবল সুখের ছবি রাখবে বিছায়ে ।
–সুখে সুখে ভরে দিয়ে নগরের পথ ।
কুমারকে দেয় রাজা সাথি আর রথ ।
রাজ্যের সুখের ছবি কুমার যে দেখে ।
পিতাকে প্রণাম জানায় হৃদয়ের থেকে ।
হঠাৎ কুমার চোখে ওই কাকে দেখে ।
শুধায় আগ্রহ ভরে চলার সাথিকে ॥
–কে যায় শ্বেতকেশী দ ধারী লোক ।
কীভাবে এমন হলো জানাও কন্থক ।
–জরার ফসল এটা জানো হে কুমার
–জরা... কী সেই জরা তবে বল বিস্তার ।
–বল রূপ হানিকর শোকের আকর ।
এই জরা সুখ-হরা নাশক স্মৃতির ।
জরা দ্বারা ওই লোক জীর্ণ এখন ।
শিশু ছিল সেও জানো সবাই যেমন ।
হামা হাঁটি দিয়ে সেও হয়েছিল যুবা ।
যুবাকাল কেছে গেল জরা দিল থাবা ।
–আমাতেও কী এমন হবে না-কি সাথি ।
–দিনে দিনে বয়স বাড়ে সন্দেহ কি বাকি ।
বয়েসের এ খেলাতে কে দিয়েছে ফাঁকি ।
–বল রূপ হানিকর শোকের আকর ।
যেই জরা সুখ-হরা নাশক স্মৃতির ।
সেই জরা দেখে লোকে এখনো উদাস ।
হায় হয় জরা ভয় না হই উদাস ।

উদ্যানে যাব না আমি রথটি ঘোরাও ।
জরা ভয়ে শান্তি নাই শীঘ্র গৃহে ধাও ।
কুমারের আদেশে সাথি রথকে ঘুরায় ।
স্বর্গীয় প্রাসাদ আজ শূন্য মনে হয় ।
জরা সুখ-হরা আকুল চিন্তায় ।
কুমারের দিনক্ষণ যেতে নাহি চায় ।
অনুমতি পেয়ে তাই হয় সে বাহির ।
এবার বাইরে দেখে ব্যাধির শরীর ॥
এ যৌবন জলে বিম্বিত চাঁদের মতো ।
কেমনে তারে মিথ্যা ভাবি কেমনে সত্য ।
আছে জরা আছে ব্যাধি আছে সত্য মৃত্যু ।
এ-ভেবে অধীর হলো কুমারের চিত্ত ॥
–আমাকে বেষ্টিত এ রমণীকুল যত ।
রূপরাশি হারা হবে শিউলির মতো ।
যদিও শিউলি গাছে ফিরে আসে ফুল
নারীর রূপ গেলে ফেরে না এক চুল ।
প্রকৃতির রূপ গেলে ফেরে বারবার ।
মানবের রূপ গেলে ফেরে না তো আর ।
ওইদিকে পিতৃ মনে ঋষিদের বাণী ॥
–এ কুমার হবে জানি সত্যের সন্ধানী ।
যৌবনে যেতে পারে অরণ্যে কোথাও ।
অথবা উদার রাজা হবে জেনে নাও ।
দুঃখের সাগরে দেখ ভাসছে সংসার ।
এসেছে নাবিক এ যে করবে উদ্ধার ।
–না না তা হয় না ।
রাজার কুমার রাজাই হবে ।
অন্য কিছু না । না ।
আদেশ করেন পিতা তাই অতি দ্রুত ।
–কুমারের চারিদিকে দাও তন্বী শত ।
কুমার তাদের সাথে ভোগে থাক রত ।
রাজার আদেশ মত তন্বী ও রূপসী ।
কুমারের চারিদিকে জুটলো যে আসি ।
কুমার পায় না তবু শান্তি-সুখ-ঘ্রাণ ।
মনে তার প্রশ্ন ভারি কেন যাবে প্রাণ ।

কেন-বা যৌবন এসে হয় অবসান ॥
–কেন জরা কেন ব্যাধি কেন হয় মৃত্যু ।
হবে আর কোথা পাই জীবনের সত্য ।
এই দেহ পুষ্পতুল্য ব্যাধি কেন হবে ।
মৃত্যু কেন এসে শেষে জয়ধ্বনি দেবে ।
কেন কেন কেন কেন উত্তর কে দেবে ।
উত্তর সন্ধানে শেষে অধীর কুমার ।
ছুটে যায় অন্তঃপুরে সকাশে রাজার ॥
–জরা ব্যাধি মৃত্যু কথা আমাকে না বলে ।
কেন পিতা রেখেছিলে শুধু ভোগে ফেলে ।
–রাজার কুমার তুমি কেন ভাবো মিছে ।
যুবক কুমার কবে ভোগ ছেড়ে আছে ।
–ভোগ নয় যাবো আমি সত্যের সন্ধানে ।
মিছে আর নয় পিতা ভোগের বন্ধনে ।
–এইবুদ্ধি ত্যাগ কর বলি যে তোমার ।
যুবক বয়েসে বনে যেও না কুমার ।
এ বয়স নয় পুত্র সাধক হবার ।
বয়স খেয়ালে জানি মুনি করে ভুল ।
তুমি তো সামান্য পুত্র না হও আকুল ।
বয়সের দোষে জানো সব প্রতিকুল ।
এমন বয়সে তুমি কেন কর ভুল ।
যুবক বয়সে জানো ভোগ অনুকূল ।
–যদি না থাকতো পিতা মৃত্যু ব্যাধি জরা ।
আমারও আসক্তি হতো ভোগেরই দ্বারা ।
–তোমার বহুড়ী ঘরে রাজ্য পড়ে আছে ।
কেমনে যাইবি ছেড়ে পুত্রও কি মিছে ।
বিচ্ছেদ পরম সত্য পিতা জানো নাই ।
তবে কেন মিছে ভাবো মিথ্যেএ মায়ায় ।
এই কথা শুনে রাজা ছেলের মুখের ।
পুনরোপি মায়াজাল বিছান ভোগের ।
সে ভোগেও মাতে নাই রাজার কুমার ।
একরাতে চলে যান অজান্তে সবার ॥
গেরুয়া চীবর পরে রাজরূপ খুলে ।
মাথার কেশের ঝাপি মুড়ে দেন ফেলে ।

কুমার হয়েছে যেন সন্ধানী শ্রমণ ।
সতত করতে চায় সত্য অন্বেষণ ।
সত্যের ঠিকানা পেতে দিন কেটে যায় ।
শেষে তাই ধ্যানে বসে গাছের ছায়ায় ।
ধ্যান দেখে সাধারণ অতি খুশি হয় ।
এলাকার মার-রাজ শুধু ভীত হয় ।
ধ্যানে যদি সত্য কথা সবে জেনে যায় ।
মানবে না কেই তাকে মার ভয় পায় ।
ছুটে এসে মার শেষে শর ছুড়ে মারে ।
ধ্যানের কুমার বসে বধিতে না পারে ।
পাথর সাপের ভয় মার যে দেখায় ।
সাপেরা বাঘেরা শেষে ব্যর্থ হয়ে যায় ।
এরপর মার সে খোঁজে আরেক উপায় ।
ঝড় করে বৃষ্টি করে সেই এলাকায় ।
ধ্যানের কুমার তবু নিরাপদে বসে ।
পুষ্পময় বৃষ্টি হয় কুমারের দেশে ।
এক্ষণে কুমার দেখে পূর্বজন্ম স্মৃতি ।
নির্বাণ লভিল যেন নাই মৃত্যু-ভীতি ।
ফুটেছে সম্মুখে তাঁর এক সরোবর ।
তার জলে হাত দিলে রাজার কুমার ।
হাত ধরে উঠে আসে কে যেন তাহার ॥
–কে-বা তুমি বল ওহে সত্য করে বল ।
–আমি সত্য তুমি মিথ্যা আমাতেই মেলো ।
–তুমি যদি সত্য হও কেন থাক জলে ।
পার যদি আসো তুমি আমার এ স্থলে ।
–শোন তবে ভক্তি করে তোমাকেই বলি ।
তুমি সত্য আমি রিপু আমি মিথ্যাকলি ।
আত্মা যে চিনেছ তুমি আজি আমি চলি ।
আগুন উঠল জ্বলে জলের উপর ।
পুড়ে যায় রিপু তার শিখার ভেতর ।
তাই দেখে বলে হেসে রাজার কুমার ॥
–আত্মাই পরম সত্য আত্মা মৃত্যুহীন ।
আত্মাকে চিনিলে হয় সব ব্যথা লীন ।
ওম্ ওম্ ওম্

জলের চাঁদ নয় সত্য
জলের চাঁদ নয় মিথ্যা ॥
কেন এই আশঙ্কা ছড়ায়
জলের চাঁদ ওই সুদূর আকাশে উদিত ॥
ভবনদীর জল তরঙ্গ
পেরিয়ে যেতে পেরিয়ে যেতে ।
স্বপ্ন মায়ার বাঁধন কেটে ভেসে তরঙ্গে
না তাকিয়ে ডানে বামে হেসো আনন্দে
আনন্দে আনন্দে ॥

এখানেই বুদ্ধদেব মাহাত্ম্যের এই নৃত্য-নাট্য-গীত সমাপ্ত করেন বজ্রাচার্য প্রভু । আর তখন তিনি আত্মা-সংবোধের পরম শূন্যতায় উঠে কেবল একটিই ধ্বনি করেন–ওম্ ওম্ ওম্ । তার এই ওম্ ধ্বনি উচ্চারণে পৃথিবীর সকল সম্মোহন–একবিন্দু মায়া শক্তিতে মিলিত হয় । সাথে সাথে কারো মনে আত্মার চৈতন্যের বোধ জেগে ওঠে । এই বোধ চন্দ্রাকর্ষী জোয়ারপ্রবণ সমুদ্রের মতন । কাহ্নু আজ সেই জোয়ার-বোধে সংসার-সমুদ্র থেকে উছলে উছলে পড়তে চায় দূরে বহু দূরে । তার চৈতন্যসত্তায় কূল ভাঙা নব জাগরণ ।

বুদ্ধ নাট্যের আসরে নিজেকে অতি□ম করে যাবার যে জটিল এবং দুরূহ যুদ্ধে কাহ্নু অবতীর্ণ । সেই যুদ্ধের ভেতর সে যেন সহসাই প্রচ ক্ষিপ্রতায় উথাল-উচ্ছল ঢেউয়ের সংসার বা ডোম্বী প্রকৃতির মোহ-মায়া থেকে দূরে অনেক দূরে আছড়ে পড়ে । তাই তো কাহ্নু আজ প্রভুর নির্দেশিত ইন্দ্রিয় জাগরণ ও দমন কৌশল বিবাহ-কামের সার্থকতায় পৌঁছে গেছে । কাহ্নু এখন ইন্দ্রিয় দমনের দিকে যেতে চায় । কেননা অনুভব করেছে কাম-মোহের বিচরণ সমাপ্তিতে পৌঁছে যাবার যোগ্য হয়ে উঠেছে সে । এখন তার বোধিচিত্তের সময় এসেছে । এমন ভাবনার মধ্যে সে হঠাৎ প্রভুর পায়ে নুয়ে পড়ে বলে ওঠে–

–প্রভু আজ আমার আত্ম-সংবোহের মোহ ভেঙেছে...

কাহ্নু এই কথায় প্রভুর কাছে ছুটে যেতেই তার পিছু নেয় বন্ধী... ডোম্বী এবং ভুসুকু । তারা সকলেই কাহ্নুকে আগলে রাখতে চায়–

–অমন কথা বলে না কাহ্নু...

–কাহ্নু ওই জীবনের ভার তুই বহন করতে পারবি না-তার চেয়ে গৃহে চল...

–চলো তুমি গৃহে চলো স্বামী...

–না বহুড়ী না... বৌদি-দাদা তোমরা ওকে নিয়ে যাও

–তুই যাবি না । তুইও চল কাহ্নু...

–না বৌদি না... আমার আর ফেরা হবে না

–কেন ।

–আমি আমার আত্মাকে চিনবার-উপলব্ধি করবার যোগ্য হয়ে উঠতে চাই...

–প্রভু বলে দিন সে যোগ্যতা কি সংসারের মধ্যে থেকে অর্জন করা যায় না... যদি যায় তাই বলুন... প্রভু বলে দিন কাহ্নু আমাদের সাথে ফিরে যাক...

–হ্যাঁ প্রভু ওকে ফিরতে বলুন... ডোম্বীর গর্ভে এখন সন্তান...

–প্রভু ফেরান আমার স্বামীরে এই গর্ভের সন্তান মিথ্যে নয়... ফেরান প্রভু...

–সো এথু নাহি... কাহ্নুর দৃঢ়তা দেখে বলছি-আত্মার শপথ ফিরে যাও তোমরা...

–প্রভু ।

–তুমি পরম প্রকৃতি-তুমি নারী... তুমি আমাদের ধর্ম জীবনে দেবী হয়ে থাকবে-

–না প্রভু । না... এ আমি চাই না... আমি চাই ওই কাহ্নু স্বামীরে...

–একটি কথা শুনে রাখো । কাহ্নুর এখন বোধিচিত্তের সময়... সে তোমার মহিমাতেই আত্মা আর মোহ বুঝেছে...

–আমাকে কি বোঝে নাই প্রভু । প্রভু প্রভু আমাকে বোঝে নাই...

–কাহ্নু আমাদের যেতে হবে বহুদূর... আমি পা রাখছি পথে...

–আমিও প্রভু আপনি এগিয়ে যান... আমি আসছি ।

বজ্রাচার্য প্রভু এগিয়ে যেতেই কাহ্নু ডোম্বীর কাছাকাছি এসে কিছু কথা বলে যায় । যে কথায় কাহ্নু তার মৃত্যুহীন আত্মাকে বিস্তারিত করবার মোহ ডোম্বীর মধ্যে এমনভাবে জাগ্রত করতে চায়... যেনবা ডোম্বী ইচ্ছে করলেই কাহ্নুর আত্মার সাথে অন্যরকম শূন্যতার এক সংসার করতে পারবে । কাহ্নু বলে–

–ডোম্বী । মনে রেখো আত্মার উপলব্ধিতে আমি একদিন মৃত্যুহীন হয়ে যাবো... সেদিন আমার আত্মা বিস্তারিত হবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এমনকি কিছু কিছু মানুষের আত্মাতেও... ডোম্বী তুমি আমাকে ইন্দ্রিয় আস্বাদ দিয়েছো... এই আস্বাদ না পেলে আমি হয়তো কোনোদিনই বোধিচিত্তের যোগ্য হয়ে উঠতে পারতাম না... ডোম্বী আমার এ প্রণাম-শরণ তোমার কাছে নিশ্চয় ফিরে ফিরে আসবে... যাও ডোম্বী গৃহে যাও... প্রভু অনেক দূর এগিয়ে গেছে... এখন সেই আমার অবলম্বন... আমি গেলাম ।

আত্মা উপলব্ধির গূঢ় বচন-বাক্যের প্রবোধ দিয়ে ডোম্বীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাহ্নু বজ্রাচার্য প্রভুর পরম পথ অনুসরণ করে । প্রথমে সোমপুর বিহারের সিদ্ধাচার্য ও শ্রমণদের সাক্ষাৎ নিয়ে প্রাচীন পুণ্ড্র নগরের একঘেয়ে পথ ধরে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় বন্ধুর পথে পথে নেপালে ।

তেরো

কাহ্নুর নেপাল গমনের সুদীর্ঘ পদযাত্রার মধ্যেই স্বামী বিরহিণী ডোম্বীর একদিন গর্ভ যন্ত্রণা ওঠে । সে যন্ত্রণায় কাহ্নুমাতা বোধিচিত্তের পথে প্রিয় সন্তান চলে যাওয়ার বেদনা ভুলে আনন্দিত হয়ে ওঠে । কেননা কাহ্নু নাই অথচ বহুড়ী প্রসব করলেই জ্বলে উঠবে কাহ্নুরই রেখে যাওয়া বংশ-দীপ । বলা তো যায় না সে দীপের আকর্ষণে কাহ্নু একদিন

ফিরেও তো আসতে পারে। তাইতো যন্ত্রণা এসে ডোম্বীর পেটে ধাক্কা দিতেই সাসু শয্যা রচনা করে পরমযত্নে–

–উহু উহু। মাগো

–ভয় পাসনে-পূড়া ভীতু হবে। একটু কষ্ট হয়... সহ্য কর।

–পারছিনে আর... উহু... আ হা হা...

–সহ্য কর সহ্য কর... এক্ষুনি কষ্ট ঝরে যাবে।

সাসুর এই সান্ত্বনা বাক্যের মধ্যে ডোম্বীর অন্তরে কারা যেন যন্ত্রণা ঝরানো নৃত্য-গীত শুরু করে–

মা...
বুদ্ধের কাছে মিনতি রাখি
মিনতি রাখি বোধিবৃক্ষের তলে
ঝরুক ঝরুক বেদনা বহুড়ীর
পুত্র প্রসব-কালে ॥
আকাশ দেখেছি মাথার উপর
ছড়ায়ে দিয়েছে আলো।
বহুড়ী আমার বেদনা ছড়িয়ে
বংশের দীপ জ্বালো ॥

–উহু হু। আহ্

উঙআ উঙা। ওঙ্কারের সুতীব্র ধ্বনিতে পৃথিবীতে নতুনেরা এসে জানান দিতে থাকে সেই আদিমকাল থেকে। আর আজ এই পৃথিবীর এই সদ্যপ্রসূত শিশুটি কেন নিরুত্তাপ ওঙ্কা ধ্বনিতে থেমে যায়। ডোম্বী বিস্মিত। আশঙ্কায় প্রসূতা কষ্ট থেকে পূড়ার নাড়িতে হাত দেয়। তার বক্ষ বিশুষ্ক... কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ। ঠোঁট ফেটে যায় আরেক শুষ্কতায়... কণ্ঠে স্বর আসে না। তবু তার বেদনার্ত উচ্চারণ–

–মা আমার পূড়া।

–এই তো-অমন করিস কেন...

এই কথার মধ্যে পূড়ার গাত্রে হাত দিয়ে সাসু হঠাৎ শিউরে ওঠে এবং ডোম্বীর প্রতি গভীর আ□াশ-অভিমানে সে বলে ওঠেন–

–দূর দুর্ভাগা... এ গৃহের সব দুর্ভাগা। যে জন্মে সেও দুর্ভাগা। তুই কি রাক্ষসী নিজের পূড়ারেও খেয়ে নিলি। হা দুর্ভাগা শুধু আমার মৃত্যু নাই।

□ন্দন মিশ্রিত বিলাপে সাসু বেরিয়ে যায় অন্তউড়ি থেকে। আর সে সময়ে বহুড়ীর কষ্টে সান্ত্বনা দিতে চায় বঙ্কী। কিন্তু তার সে সান্ত্বনাও যেন যথার্থ ভাষা খুঁজে পায় না। বরং সে যা বলে তা কাব্যের সমতুল্য হয়ে যায়। আসলে সংসারের অনিত্যতায় কারো কারো মুখের সান্ত্বনা কখনো কাব্য হয়। ডোম্বীর ক্ষেত্রে বঙ্কীর সান্ত্বনা বাক্যের আজ সেই নিয়তিই হয়। বঙ্কী বলে–

–কাঁদিসনে ডোম্বী... কাঁদিস নে... তোর এই মুহূর্তের কষ্টের ভার আমি বুঝতে পারছি... আমিও তো আমার পূড়ারে হারিয়েছি একদিন... আমার সেদিনের কষ্ট তোর কষ্টে আবার জেগে জেগে উঠছে।

–দিদি আমার কেন এমন হলো–দিদি।

–এ বড় শক্ত প্রশ্ন। এ প্রশ্ন আমারও। হয়তো জগতের সবারই এই একই প্রশ্ন... আমার কেন এমন হলো।

–দিদি এ প্রশ্নের উত্তর কী...।

–আমার মনে হয়... আমাদের চাওয়াটাই ভুল। তাই এতো ভুল পাওয়া–'যা এথু চাহমি সো এথু নাহি।'

–'যা এথু চাহমি সো এথু নাহি'... এই কি তবে জীবনের সত্য দিদি।

–জানি না... জানি না... হঠাৎ আমার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে এই কথা... এর সত্য-মিথ্যা জানি না আমি...

স্বাভাবিক জীবনের কথাই কখনো কখনো কাব্য হয়ে ওঠে–সাধারণ হয় অসাধারণ জীবন-কথার আশ্চর্য ছোঁয়ায়। ডোম্বীর কষ্টে নিজের কষ্টের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে বঙ্কীর অন্তরের যে ধ্বনি মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে তাই তো কাব্য–'যা এথু চাহমি সো এথু নাহি'–যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই। যাহা পাই তাহা চাই না ॥

চৌদ্দ

ওইদিকে এক মাতাল বাতাস চরাচরের ঘাস লতা-পাতা বৃক্ষদের শরীরে উম্মত্ত ঢেউ তুলে দেয়। তারই মধ্যে নাট্যদলের কুক্কুরীও সীমাহীন আনন্দবার্তায় বাতাসের মতোই চঞ্চলতায় ছুটে আসে কাহ্নুদের গৃহে–

–কাহ্নু বোধিচিত্ত পেয়েছে। এই দেখো নেপাল হতে সে তার বাহুবন্ধন পাঠিয়ে দিয়েছে...

–তাহলে কি কাহ্নু আর ফিরে আসবে না...

–বোধিচিত্ত পেয়ে বাহুবন্ধন পাঠানোর অর্থ তো তাই-ই... কাহ্নু আর ফিরবে না...

–দিদি

–ডোম্বী থির হ...

–ডোম্বী তোমাকে আমি দেবীর সম্মান জানাতে এসেছি। এই নাও দেবী... তুমি মোক্ষদাত্রী–এই অর্ঘ্য তোমার–এই মুক্তাহার-নেউর তোমার জন্যে...

কুক্কুরী তার হাতের অর্ঘ্য ডোম্বীর পায়ের কাছে নিবেদন করতেই ডোম্বী তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়–

–না না... এর কিছু আমি চাইনে... চাইনে

–ডোম্বী এ তুই করলি।

–কষ্ট পেলাম... এই মুক্তাহার-নেউর অর্ঘ্যের অপমান বড় কষ্টের...

কুক্কুরী ভীষণ কষ্টে মাটি থেকে ডোম্বীর ছুড়ে দেওয়া মুক্তাহার-নেউর অর্ঘ্য হাতে তুলে নেয় এবং পরম বেদনার অনুভূতিতে প্রস্থান করে নিজস্ব নাট-মন্দিরে। সেখানে সে অপমানিত অর্ঘ্যকে বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে রেখে যুক্ত করে ক্ষমা ভিক্ষায় কাঁদতে থাকে–

–আহ ভগবান বুদ্ধ। আমারই ভুল। ভুল না হলে কেউ কি অর্ঘ্য প্রত্যাখান করে। আমাকে ক্ষমা কর ভগবান... ক্ষমা কর...

যতক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনার ক্রন্দনে সে হালকা হয়ে না ওঠে ততক্ষণ তার এমত ক্ষমা ভিক্ষা চলতেই থাকে।

পনেরো

দুই দুইটি রাত ডোম্বীর ঘুম আসে না। ডোম্বীর সাথে বঙ্কীরও রাত যায় নিদ্রাহীন। দেবীর অর্ঘ্যের অপমান করেছে ডোম্বী আর বঙ্কী নিজ চোখে দেখেছে তা। আহ্ এমন গুরুতর অপরাধের শাস্তি কি তবে নিজের অন্তরে নিজে দহিত হওয়া। আহ্... ডোম্বী কিছুতেই স্বস্তি খুঁজে পায় না। ডোম্বীর কষ্টে বঙ্কীও কষ্টপ্রবণ–'আমি উপস্থিত থাকতে ডোম্বী কেন এমন একটি অপরাধ করল... আমি কেন ডোম্বীকে বোঝাতে পারলাম না- এ অর্ঘ বুদ্ধমন্দিরের... '। দুই দুইটি রাত্রি তাদের এইভাবে আত্মযুদ্ধে নিদ্রাহীন কেটে যায়- তৃতীয় রাত্রিতে দুজনার চোখেই গত দুই রাতের ক্লান্তি জাগরণের ঘুম চলে আসে।

ঘুম চলে আসে সমগ্র গ্রামবাসীদের চোখে। সে রাত্রেই হঠাৎ দূরে ধ্বনিত হয়- 'আবা আবা আবা'। 'আবা আবা আবা'। পদ্মাখাল বেয়ে সে ধ্বনি দ্রুত নিকটবর্তী হয়। আবা আবা আবা আবা আবা।

ঠোঁটেতে হাতের তালু দিয়ে চিৎকারে যেই ধ্বনি হয় এ সেই ধ্বনি। সে ধ্বনিতে বাতাস কেঁপে ওঠে। দেশ কেঁপে ওঠে। অথচ নিদ্রালগ্ন দেশবাসীর ঘুম ভাঙে না। কেমন মরণ ঘুমে পেয়েছে তাদের। তারা কি বোঝে না। না না। কেউ কেউ জেগে ওঠে। ক্লান্তি আর নেশার ঘুম থেকে অকস্মাৎ জেগে উঠে দ্রুত দুয়ার খুলে নেমে পড়ে উঠানে।

উঠানে দস্যুদল। কিছু বোঝার আগেই যেন ঘটে যায় ধ্বংসযজ্ঞ। দেশ জুড়ে শুরু হয় ওলটপালট পলায়ন। কিছু যুবা প্রতিরোধে নেমে দস্যুদের মুখোমুখি হয়। এক দস্যুকে ভূলুণ্ঠিত করে ছোটে তারা অন্য দস্যুর দিকে। সে দস্যুকেও পরাস্ত করে ছুটে যায় আরেক দস্যুর মুখে। কিন্তু সে যে পরাস্ত হয় অন্য দস্যুর আঘাতে।

কুরাড়ী হস্তে দাঁড়িয়ে যায় বহুড়ী বঙ্কী। ডোম্বী তাকে নিয়ে পালাতে চায়।

–পাগলামি করো না দিদি। এসো পালাই

–না না না তোরা পালা। আমি পালাবো না।

না ডোম্বী। বঙ্কী পালাবে না। যে-দস্যুরা বছর দুই আগে তার পূড়াকে হত্যা করেছে তারই সম্মুখে। সে-দস্যুর ভয়ে সে আর ভীত নয়। আজ তার প্রতিশোধের সময়। ভুসুকুও বুঝি প্রতিশোধ নিতে চায়। সাসুর টানে কাহ্নুর অনুরোধে ডোম্বী ও সাসুরা পালিয়ে যায়। বঙ্কী দাঁড়িয়েই থাকে কুরাড়ী হস্তে। দাঁড়িয়ে থাকে ভুসুকু।

এক দস্যু তাদের গৃহে ঢুকতেই ভুসুকুর আঘাতে পেছনে ফেরে ঠিকই কিন্তু চোখের নিমিষে তারা আরও একদল দস্যু নিয়ে তাদের বাঁধা অতিক্রমে গৃহে ঢোকে। সাথে সাথে দস্যু ও ভুসুকুর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধ মধ্যে এক দস্যু বঙ্কীর কুরাড়ী ছিনিয়ে নিয়ে জাপটে ধরে। ভুসুকুর তা সহ্য হয় না। তাই সে যুদ্ধ ভুলে বঙ্কীর দিকে ধায়। অথচ দস্যুর আঘাতে ছিটকে পড়ে চিৎকারে অন্ধকারে গড়াগড়ি খায়। এই ফাঁকে ভুসুকুকে ঘিরে ফেলে দস্যুদল। দস্যুরা তার হাতের লাঠি ছিনিয়ে তাকে বেঁধে বঙ্কীকে নিয়ে মেতে ওঠে।

বঙ্কীর বস্ত্রহরণে দস্যুদের অসম উল্লাসে বাতাস কেঁপে ওঠে। বিবস্ত্র বঙ্কীকে নিয়ে তাদের আদিম ক্রীড়ায় আর্তচিৎকার ধ্বনিত হয়। আর সেই আর্তচিৎকারে ভুসুকুর পৃথিবী বুঝি দ্বিধা হয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বজ্র নিক্ষিপ্ত হতে থাকে মস্তকে।

বন্ধনকে উপেক্ষা করে ভুসুকু এক সময় মাটি আঁকড়ে বঙ্কীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে গিয়ে দস্যুদের আঘাতে আবার ছিটকে পড়ে। বঙ্কীর আর্তচিৎকার ও দস্যুদের উল্লাসে সে অস্থির হয়ে চক্ষু বন্ধ করে। এবং শ্রবণও রুদ্ধ করতে চায় প্রাণপণে... সে কোনো দৃশ্য দেখবে না কোনো ধ্বনি শুনবে না। অথচ কিছুক্ষণ পরে চক্ষু-শ্রবণকে মুক্ত করে সে দেখে তার চারিদিকে আগুন জ্বলছে। কিন্তু বঙ্কী কোথায়।

সহসা ভুসুকুর ক্রন্দন মিশ্রিত অভিব্যক্তিতে বেশ বোঝা যায় বঙ্কীকে ওরা নিয়ে গেছে। ভুসুকু তাই উঠানে পড়ে গড়াগড়ি খায়। আর চোখের সম্মুখে অসহায়ের মতো গৃহকে পুড়তে দেখে।

লুণ্ঠিত সম্পদ আর নারী নিয়ে 'আবা আবা আবা' ধ্বনি করে দস্যুরা চলে যায় সেই পদ্মা বেয়ে। তখনও গৃহভস্মের ধোঁয়া ওড়ে রাতের আকাশে। অন্ধকার থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে ডোম্বী ও পিতৃ-মাতৃ। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তারা দৌড়ে যায় ভুসুকুর কাছে। পিতা-মাতার আবেগের পাশে ডোম্বী দ্রুত গতিতে ভুসুকুর বাঁধন খুলতে যায়। ভুসুকু তাতে অস্থিরতা প্রকাশ করে বলে ওঠে–

–কী হবে বাঁধন খুলে। আমাকে আগুনে দে ফেলে

–না দাদা না। তোমাকে বাঁচতে হবে

–কেন বাঁচতে হবে। কেন কেন... ওরে 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।... জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।'

–দাদা...

পিতৃ-মাতৃ ও ডোম্বীর বাঁধন অতিক্রম করে ভুসুকু লাফিয়ে পড়ে আগুনে। আগুনের ভেতর সে নৃত্য করতে থাকে।

–ওম্ ওম্ ওম্। আমি নির্বাণ পেয়ে গেছি। দেখো আগুন আমাকে পোড়াতে ব্যর্থ। ওম্ ওম্ ওম্ ॥

–দাদা বেরিয়ে আসো। বেরিয়ে আসো।

—হায় হায় রে। ভুসুকু যায়। আমার ভুসুকু যায়।

—আহারে... ভুসুকু যে পুড়ে গেল।

হঠাৎ মাতা এই ভূকম্পিত আর্তিতে ছুটে যেতে চায় আগুনে নৃত্যমান ভুসুকুকে বাঁচাতে। ডোম্বী তাকে জাপটে ধরে।

—পাগল হলে নাকি। আগুন থেকে আনতে পারবে দাদাকে। পারবে না। বরং নিজেও পুড়ে মরবে।

—মরবো তো কী হয়েছে। আমার সামনে ভুসুকু আমার পুড়ে মরবে আর আমি কিছু করতে পারবো না।

ডোম্বীকে জড়িয়ে ধরে মাতা কাঁদতে থাকে। অকস্মাৎ আগুন থেকে বেরিয়ে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় ভুসুকু। সারাদেহে তার তকতকে আগুন। আগুন ভুলে জড়িয়ে ধরে পিতা। জড়িয়ে ধরে মাতা। আর সচেতনতায় ডোম্বী বলতে থাকে—

—দাদা বেঁচে আছে বাবা-মা। ওভাবে জড়িয়ে ধরো না... দাদার কষ্ট হচ্ছে। বাতাস করো পরিহানের আগুন নেভাও। মাটিতে গড়াও এইভাবে।

মাটিতে গড়িয়ে ভুসুকুর দেহে থেকে জ্বলন্ত আগুন নেভাতে চায় ডোম্বী। তাকে সাহায্য করে পিতা-মাতা। ভুসুকুর দেহের আগুন তাতে আর বাড়তে পারে না। তার মধ্যে ডোম্বী লক্ষ করে—যে সময়টুকু ভুসুকু আগুনের মধ্যে ছিল। সে সময়ে আগুন ভুসুকুর পরিহান বস্ত্রের বক্ষ পর্যন্ত পুড়িয়ে নিয়েছে। আর চুলের ক্রমবর্ধমান অংশগুলো থোপ থোপ হয়ে ছাই হয়ে গেছে এবং ঝলছে তার পদদ্বয় উরু ও উদরভাগের কিছু অংশ। ঝলসে গেছে মুখমণ্ডল।

পিতা-মাতা আর ডোম্বীর তৎপরতায় আগুন নিভে যায় ঠিকই। কিন্তু ভুসুকুর জ্ঞান ফেরে না। ডোম্বী তাই দৌড়ে গিয়ে জল এনে ভুসুকুর মুখে ছিটায়। বারবার জল ছিটায়। সে জলের ছিটানিতে এক সময় কম্পন দিয়ে ভুসুকু জ্ঞান ফিরে পায় এবং বীভৎস এক চেহারায় যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে। মাতা তাকে শান্ত করতে চায়। নিজেদের পরিহান বস্ত্র দিয়েই বাতাস করে।

পিতা ছুটে গিয়ে এই আগুনে রক্ষা পাওয়া বিচ্ছিন্ন ভিটার রন্ধনশালার চালায় গোজা তালপত্রের পাখা খুঁজে পায়। দৌড়ে এসে সে পাখাতে বাতাস করতে থাকে। ভুসুকু তবু শান্তি পায় না। কেঁদে যন্ত্রণায় মাতাকে জড়িয়ে ধরে—

—আমি যে আর না পারি... মাগো মরে যাচ্ছি যে...

—না না... ও কথা বলে না।

এই ফাঁকে ডোম্বী কোথা থেকে একটি কদলীপত্র এনে রস করে ভুসুকুর আগুনে পোড়া তকতকে ক্ষতস্থানগুলোতে নিঙড়ে দিতে থাকে। এবার যেন যন্ত্রণার কিছুটা কমতে শুরু করে। তাইতো ভুসুকু মাকে জড়িয়ে ধরে ডোম্বীকে যন্ত্রণার ক্ষতগুলো দেখাতে থাকে। ডোম্বী কদলীপত্রের রস নিংড়ে দেয় ক্ষত স্থানে।

সকলের শুশ্রূষায় ভুসুকু একটু একটু করে সুস্থ হয় ঠিকই। কিন্তু সে পায় এক বীভৎস চেহারা। সারাদেহে ফোসকা আর মুখের পোড়া অংশটুকু ফুলে ফোসকায় হয়েছে

যেন বুনোওল। যার ভেতর থেকে সে চোখ পিটপিট করে কথা বলে ভাঙাস্বরে। অথচ কিছুই খেতে পারে না। খেতে তার ভীষণ কষ্ট। খাদ্য মুখে দিলে মুখ উগরে বেরিয়ে আসে। তবু তার মনে আসে বহুড়ী বঙ্কীর কথা। ‘হায়—ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী। ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী’। মাথা তার কেমন করে ওঠে। তাইতো সে নিজের মাথাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এলোমেলো ভাবে কথা বলতে থাকে। ডোম্বী তাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। কিন্তু সে অবোধ শিশুর মতো বলে চলে—

—আজি ম জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি

—কী বলেছো দাদা। তুমি কি পাগল হলে

—ন আজি ম পাগল ন। আজি ম মএল রঅণি

—না দাদা। তুমি বেঁচে থাকবে প্রতিটি প্রভাতে। আজই শুধু নয়। তোমার প্রতিটি প্রভাত যেন জীবন্তে হয়।

—না ডোম্বী। আপনা মন ভণই মএল রঅণি... অন্ধারি পইসহিনি।

—তুমি কি জানো না দাদা মন কত চঞ্চল। মনের কথা মনে নিও না। তুমি তো জানোই মনের কথা সব সময় সত্য হয় না।

—তা হোই। তবু ম মএল রঅণি... অন্ধারি পইসহিনি।

—তা হয় না দাদা। তুমি মরবে না অন্ধকারেও যাবে না। তুমি বেঁচে থাকবে আমাদের সাথে। বঙ্কীদি যদি ফিরে আসে... তুমি যদি মরে যাও... তাকে তবে কী বলবো দাদা...

—তোরা তাকে আশ্রয় দিবি... আর বলবি আমি মৃত্যু নিয়েছি... বলবি তো ডোম্বী কথা দে... দিদি আমার কথা দে... বঙ্কীকে তোরা ঘরে তুলে নিবি। ঘরে...

—দাদা...

যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে কথা শেষ না করতেই ভুসুকুর মৃত্যু হয়। ডোম্বীর গগন বিদারী ‘দাদা’ উচ্চারণে এবার সে-গৃহে যে ক্রন্দন ধ্বনিত হয় একদিন হয়তো সে ক্রন্দনও থেমে যায়। সবাই ক্রন্দনশূন্য সব হারানোর বেদনায় পাথর বনে যায়। তবে কি ক্রন্দনও তাদের সব হারানোর তালিকায় ঢোকে। আর এই ক্রন্দনহারা মানুষগুলো একেবারে শূন্য হয়ে প্রগাঢ় বেদনায় বিষণ্ন রন্ধনশালার দাওয়ায় বসে থাকে ॥

ষোলো

এইদিকে আকাশের দিকে চেয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে আসে বঙ্কী। কোথা তার লাবণ্যরাশি। দেহ তার নখক্ষত আর মুখ ক্ষতবিক্ষত। কদিনেই সে হয়ে গেছে কৃশ। হায় তার পরিহানের অস্তিত্ব ভাঙা ভাঙা পায়ের গতিতে দোল খায়। লজ্জারঙে এই পরিস্থিতিতে কবে কার লক্ষ থাকে। হোঁচট খেয়ে খেয়ে মাটি আঁকড়ে আঁকড়ে যেন এক কষ্ট নদী... নদী নয় এক সমুদ্র সাঁতারে সে এসেছে তার নির্ভরতার কাছে। অথচ স্বামীগৃহের নমুনা খোঁজে ভস্মরাশির মাঝে। আর ভস্মরাশিকে অতিক্রম করে দুই হাতে ভস্মকেই এলোমেলো করতে থাকে। যেন-বা ভস্ম নিঙড়ে পেয়ে যেতে পারে কোনো

সোনা-মাণিক্য কিংবা স্বামীগৃহের অস্তিত্ব। হঠাৎ পশ্চিমে তাকিয়ে দেখে রন্ধনশালা দাঁড়িয়ে। ভেসে ওঠা খড়কুটার মতো সে যেন রন্ধনশালাকে ধরতে যায়। ছুটে এসে দেখে দাওয়ায় বসে সাসু আকাশ দেখে। সাসুরা নির্বাক দুয়ারের দক্ষিণে। অন্যদিকে ডোম্বী মুখে হাত রেখে কী যেন ভাবে।

তাকে কি দেখেছে কেউ। দেখলেও তারা ভাবান্তরহীন। বহুড়ী ভাবে-যেন থম থম আকাশ মাথার উপর এক্ষুনি খসে পড়বে। বাতাসও ভারি হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে চায়। আর বৃক্ষকুল কীসের প্রতীক্ষায় ওইভাবে স্থির। বহুড়ী ভেবে পায় না। সে দেখে ঘরের চালায় ঝুলছে অসংখ্য ছন-খড়। একটু বাতাসেই যাদের অনেকেই খসে পড়বে অথবা উড়ে যাবে দূরে। কোনো পক্ষীও যে ডাকে না। কী এক ধ্যানে যেন থেকে আছে সবাই ঝিম মেরে। নির্বাক। এমতাবস্থায় বহুড়ী অস্থির হয়ে ওঠে–

–ডোম্বী তোর দাদা

ডোম্বী কোনো কথা বলে না। টলমল নয়নে কেবল বঙ্কীর দিকে চায়। বঙ্কী কোনো জবাব না পেয়ে আরও অস্থির।

–বাবা মা তোমরা বলো। ডোম্বী তুই বল।... ও বলবি না। কেউ বলবে না। আমি কি তোমাদের কেউ না... ।

হঠাৎ ঝরনার মতো ডোম্বীর চোখ ভেঙে জল গড়িয়ে পড়ে। তাতেই যেন ঝরনা হয়ে কথা বলে ওঠে ডোম্বী–

–তোমার শোকে দাদা পাগল হয়ে... পাগলের মতো... পাগল... বলতে পারি না দিদি... না না।

–পাগল হয়ে আগুনে ঝাপ দিয়ে স্বর্গে গেছে।

–দিদি

–তবে আমি কেন নরকে জ্বলবো। আমিও আগুনে যাবো। কোথায় আগুন।

ছুটে সে ভস্মরাশির মাঝে গড়াগড়ি দেয়। দৌড়ে যেয়ে ডোম্বী সান্ত্বনা দেয়–

–আমি না তোমার দিদি। তুমিই তো বলেছিলে সে কথা কি ভুলে গেলে। দাদা নেই তাতে কী হয়েছে। আমাদের সাথে থাকবে। তোমার এ দিদির কাছে...

–না

ডোম্বীর কথা শেষ না হতেই দুয়ার থেকে উঠে আসে স্বর। দুয়ার থেকে উঠে আসে চোখ। 'না' । সসুরার চোখে মুখেও ওই একই প্রতিধ্বনি। বঙ্কী তাই বেগবান হয় আত্মচিৎকারময় এক কথায়–

–আমি কোথায় যাবো।

তার সে ন্দন মিশ্রিত চিৎকারে পাথর মানুষেরাও ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়তে পারত। কিন্তু সেই লুণ্ঠিত দেশে বুঝি কোনো মানুষ পাথর ছিল না। ছিল মাত্রাতিরিক্ত ভোতা লোহা। নাকি সেই দেশে মাগত এমন ন্দনে মানুষের মন ভোতা হয়েছিল লৌহ অস্ত্রেরও অধিক । তবু তো মানুষের বিপন্ন ন্দন থামে না। ঠিকই তারা বেদনায়

বেলা দ্বিপ্রহরের কোমল ফুলের ন্যায় কুঁকড়ে যায়। ডোম্বীর মন সেই ফুল কোমলতায় বিপন্ন আর প্রত্যাখ্যাত বঙ্কীর জন্য সহমর্মী হয়ে ওঠে। তাই সে প্রত্যাখ্যাত বঙ্কীকে থামিয়ে দেয়–

–দাঁড়াও দিদি। যে জীবন তোমার... আজ থেকে জেনে রাখো তার পাশে আছি আমি... চলো দিদি... চলো... এই গৃহ সংসারে আর নয়... চলো...

–ডোম্বী।

–হ্যাঁ দিদি চলো...

যে সমাজ-সংসারে বিপন্নের কোনো স্থান নাই... আছে কেবল বিপন্নের অপমান-প্রত্যাখ্যান। সেই সমাজ-সংসারের প্রতি ডোম্বীর মনে জাগে তীব্র অভিমান। সে তাই বঙ্কীর বিপন্নতার সাথে স্বামী কাহ্নুর বোধিচিত্ত প্রাপ্তিতে নিজের একাকিত্বের বিপন্নতা আর মৃত-সন্তান প্রসবের বিপন্নতাকে মিশিয়ে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে বঙ্কীর সাথে।

এই অনিশ্চিত পথে তারা সকল নির্ভরতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে আকাশে তাদের মায়া নাই... পথ পার্শ্বের বৃক্ষছায়ায় মায়া নাই... মায়া নাই উড়ন্ত পাখিতে... পাখির গানে... মায়া নাই সায়াহ্নের আলো আঁধারিতে... মায়া নাই পথধূলিতে... কোথাও মায়া নাই... মায়া নাই মায়া নাই... । পৃথিবীতে সংসারের সমাজের নির্ভরতা থেকে প্রত্যাখ্যাত হলে এরকমই হয়। প্রত্যাখ্যাতের কাছে সকল কিছুই এক বাক্যে হয়ে ওঠে মায়াশূন্য... মায়াহীন।

সতেরো

বঙ্কী আর ডোম্বীর মায়াবিচ্ছিন্ন পথ যখন বঙ্গাল পেরিয়ে বুদ্ধমন্দির সংলগ্ন নাটম পের উত্তরপার্শ্বে সামান্য বেঁকে যায় তখন রাত্রি আগত অন্ধকারে নাটমণ্ডপের প্রদীপ জ্বালানো দাওয়া থেকে কুক্কুরী দুইটি ছায়ামূর্তির চলন দেখতে পায়। এরকম অন্ধকারে নিতান্ত বিপদ না হলে কেউ কখনো চলে না। কুক্কুরী তাই তাদের চলনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। আর তাই সে তখন নাটমণ্ডপের স্বপ্লালোকিত প্রদীপটি উচ্চে তুলে একটুখানি সামনে এগিয়ে কথা বলে ওঠে–

–কে... কে যায়।

–আমরা...

–আমরা কারা... এ কী বঙ্কী তুমি ফিরে এসেছো... কিন্তু এই এতো রাতে তোমরা কোথায় যাচ্ছো।

–ফিরে এসে আবার ফিরে যাচ্ছি... কোথায় যাচ্ছি জানি না...

–কী বলছো বঙ্কী। মেসো-মাসি গ্রহণ করে নাই।

–এই প্রশ্ন আমাকে... আহ্...

–উত্তরটা আমি দিচ্ছি কুক্কুরী... এই অবস্থায় কেউ কাউকে গ্রহণ করলে সে কি ফিরে যেতে পারে... পারে না... চলো দিদি...

–অ্যা। না তোমরা যাবে না... এই বুদ্ধ মন্দির... এই নাটমণ্ডপ থাকতে তোমরা কোথাও যাবে না...

–কুক্কুরী।

–হয় বঙ্কী তুমি থাকবে... তোমরা এখানেই থাকবে... ডোম্বী তুমি আর অন্যমত করো না... । এই মন্দির-মণ্ডপ অপমানিত হবে তোমরা যাদি এইভাবে ফিরে যাও...

–কুক্কুরী এ দোহাই তুমি কেন দিলে।

–না ডোম্বী। এ কোনো দোহাই নয়... এই তো সত্য... চলো চলো... চলো তোমরা...

–কুক্কুরী আমি যে সেদিন মন্দিরের অর্ঘ্যকে অপমান করেছিলাম...

–ডোম্বী বুদ্ধ মন্দির ক্ষমাশীল... মন্দিরের সেবায় নিশ্চয় তুমি তোমার সেই অপরাধকে খণ্ডন করে নিতে পারবে... চলো চলো শিঘ্রি চলো...

সমাজ-সংসারে যাদের কোনো স্থান নাই তাদের জন্য বুদ্ধ-মন্দির প্রসারিত। মন্দিরের স্বপ্নালোর প্রদীপ হাতে সুগভীর অন্ধকারকে মাগত আলো করে কুক্কুরী সামনে হাঁটতে থাকে। তার পিছে হাঁটতে থাকে বঙ্কী আর ডোম্বী।

মন্দিরে পৌঁছে প্রথমে তারা বুদ্ধমূর্তিকে এবং পরক্ষণেই মন্দির প্রাঙ্গণের আকাশ ছাওয়া বোধিদ্রুমকে প্রণাম জানায়–আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে। সে ক্ষণে ভক্ত কুক্কুরীর শ্রবণে বুদ্ধ নাটকের কোমল শান্তি সুর ধ্বনিত হয়। সেই সুরের মধ্যে কুক্কুরী অশ্বথবৃক্ষের একটি হলুদ ঝরাপাতা বঙ্কীর হাতে তুলে দেয়–

–রাখো। রাখো বঙ্কী। এই পত্র দেহে বেঁধে রাখো... এই তো বেদনার উপসম। সবুজ থেকে যে পত্র হলুদ হয়েছে... তার আর বেদনা কষ্ট নাই... সে যে পৌঁছে গেছে জীবনবোধের পরম নির্বাণে... তার আজ নব্যজীবন। একটি জীবন কেঁটেছে তোমার সংসারে। সেই সে জীবন বাঁধিছো তুমি মন্দিরে... ।

একটি জীবন কেঁটেছে তোমার সংসারে
সেই সে জীবন বাঁধিছো এখন মন্দিরে ॥

মন্দিরের আলো-হাওয়ায় বঙ্কীর দেহ-হৃদয় মে মে সুস্থ হয়... ডোম্বীর সেবা-প্রচেষ্টায় বঙ্কী পেয়েছে বোধ আপনার কথা-ভাষা ডোম্বীকে ডেকে বলে জীবনের যন্ত্রণা গাথা–

–এই দস্যুতার কি শেষ নাই রে ডোম্বী... শেষ নাই...

–দিদি

–বল বল... একবার দস্যুতায় হারিয়েছি একমাত্র সন্তান... এইবার মান-সম্মান শেষে স্বামী... এমনকি স্বামীগৃহে হলো না আশ্রয়... হয়েছি মন্দির দাসী...

–দিদি শান্ত হও... মন্দিরে থেকে আমার জীবনকথা কীভাবে তোমাকে বলি... তুমি তো জানোই দিদি দস্যুতার আরেক রূপের শিকার আমি... কিছুটা আমার নিয়তি... বাকিটা ধর্মের দস্যুতা... যে দস্যুতায় ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমার স্বামী... দিদি...

–ডোম্বীরে ব্যথা তো আমাদের একই... কিন্তু আমরা তা পেয়েছি ভিন্ন ভিন্ন রূপে।

হ্যাঁ বঙ্কী ঠিকই বলেছে স্বামী-সন্তান-গৃহহীন দুইটি নারী হৃদয় একই ব্যথায় ভিন্ন ভিন্নরূপে জ্বলছে আগুনে। অথচ তাদের ব্যথাকে না বুঝে মন্দিরের মূর্তিটা কেমন সমাহিত। আর মন্দির সেবক কুক্কুরী কী এক ভাবনায় যেন ঝিম মেরে বসে থাকে দূর বিস্তৃত খাঁ খাঁ মাঠের দিকে চেয়ে। বুদ্ধ নাট্যদলের প্রাণবন্ত যুবক কুক্কুরীর এমন ঔদাসীন্য ডোম্বীর ভালো লাগে না। ডোম্বী তাই এগিয়ে যায় কুক্কুরীর সন্নিকটে–

–তোমার কি হয়েছে। এখানে আশ্রয় নেবার পর থেকেই তোমাকে ভীষণ চিন্তিত দেখছি... কি হয়েছো বলো...

–কিচ্ছু নয় ডোম্বী... কিচ্ছু নয়...

–না না। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে... তোমার কণ্ঠস্বরে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি... বলো কুক্কুরী। গোপন করো না...

–আশ্রিতাকে নিজের কষ্টের কথা শোনানো যে অনুচিত...

–তাহলে কি আমরা তোমায় ভীষণ অসুবিধায় ফেলে দিয়েছি এইখানে আশ্রয় নিয়ে... তা যদি হয়... আমরা তবে চলে যাবো...

–না। না ডোম্বী। তোমরা কোনো অসুবিধায় ফেলোনি...

–তবে।

–দস্যু আমণে আমাদের বুদ্ধ নাটকের দলটি ভেঙে গেছে... আমাদের নাট্যদলে এখন কোনো নারী নাই বলে নাটক করতে পারছি না... নারী ব্যতীত এ নাট্যসম্ভব নয়...

–কুক্কুরী... আমি... মানে আমি আর বঙ্কী যদি তোমার নাট্যদলে যোগ দেই...

–তোমরা নাটক করবে। ডোম্বী সত্যি... তুমি কি সত্যি বলছো।

–হ্যাঁ... কিন্তু কুক্কুরী আমরা কি পারবো।

–পারবে। অবশ্যই পারবে আর বুদ্ধ নাটকের নৃত্য-গীত আমিই তোমাদের শিখিয়ে দেবো... এসো এসো এখনই এসো...

ডোম্বীর আগ্রহে কুক্কুরী প্রাণ পেয়ে যায়। তার নাট্য পাগল মন ডোম্বীকে নেচে নেচে নৃত্য শেখায়। কুক্কুরীর সাথে ডোম্বী নৃত্য করে–'তাক ধিনা ধিন তাক। তেরে কেটে ধেই-ও... '। ডোম্বী নৃত্য করে। প্রাণ সঞ্চারিত হয় বুদ্ধ নাটকে।

আঠারো

নব উদ্যমে বুদ্ধ নাটকের আসর জমে ওঠে। আসরে দর্শক-শ্রোতা মুগ্ধ হয় ডোম্বীর নৃত্য-গীতে। আর কুক্কুরী মুগ্ধ হয় ডোম্বীর নৃত্য-গীতে আপনার শেখানো কৃত-কৌশল দেখে দেখে।

এক সময়ে ডোম্বী কুক্কুরীর শেখানো নৃত্যবিদ্যার সাথে আপনার সৃজনকে মেশাতে থাকে শিল্পীর সৃজন আনন্দে। কুক্কুরী এতে বিস্মিত হয়ে পড়ে। বুদ্ধ নাটকের প্রসার

ছড়িয়ে পড়ে দিকবিদিকে। কুক্কুরী অনুভব কর এই কীর্তি যেনবা ডোম্বীর নৃত্য-গীতের। তাই আবেগে ডোম্বীর সাথে কথা বলে ওঠে–

–আমার ভেঙে পড়া নাট্যদলে তুমি যে কতটা প্রাণসঞ্চার করেছো... তা কি বুঝতে পারছো ডোম্বী।

–সে শুধু তুমি বুঝলেই চলবে...

–শুধু আমি... না ডোম্বী। এটা ঠিক নয়... তোমাকেও এসব বুঝতে হবে... তুমি নাট্যদলের সব থেকে বেশি প্রাণসঞ্চারী। এছাড়া... এছাড়া...

–কি থামলে কেন। বলো...

–না থাক।

–না। থাকবে না। তুমি বলবে... জানো না কোনো কোনো মুহূর্তের কথা বলতে বলতে থেমে গেলে শ্রোতার অস্থিরতা বেড়ে যায়। বলো কুক্কুরী... এখানকার কথাগুলো আমার জানা দরকার...

–ডোম্বী তুমি মোক্ষদাত্রী।

–না... না...

–না কেন। তোমার নৃত্য-গীতের মাধুর্যে আমি জেনে গেছি মোক্ষদাত্রীরূপে তুমি অনন্য...

–ন না কুক্কুরী...

–সমগ্র জীবন বুদ্ধ নাটকের আসরে আসরে মোক্ষের গান গেয়েছি আমি... কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তার কিছুই মেলেনি আমার। কাহ্নু তো আর আসবে না ডোম্বী... তুমি কি আমাকে...

–না ওই কথা আর বলো না... আর না

–ঠিক আছে বলবো না... কিন্তু ডোম্বী সেই অপমানিত অর্ঘ্যের কথা কি ভুলে গেছো।

–অর্ঘ্য

–হ্যাঁ অর্ঘ্য... আজ তুমি বুদ্ধ মন্দিরের নৃত্য-গীত পটিয়সী দেবী... সেই অর্ঘ্যকে আজ তুমি কেমন করে প্রত্যাখ্যান করবে... এই নাও সেই অর্ঘ্য।

–অর্ঘ্য... অর্ঘ্য... অর্ঘ্য। বুদ্ধ মন্দিরের আশ্রিতা আমি... বুদ্ধ নাটকের নারী... হ্যাঁ হ্যাঁ এ অর্ঘ্য আজ আমাকে গ্রহণ করতেই হবে... দাও...

কুক্কুরীর হাত থেকে একে একে অর্ঘ্যের নেউর-মুক্তহার ডোম্বী তার অন্তরের কষ্টে মুখের হাসিতে যুগলপায়ে আর উষরকণ্ঠে জড়িয়ে নেয়। এতে করে নেউর যুগলে তার চলার ছন্দ হলো গাঁথা... মুক্তাহারের উজ্জ্বল বৃত্তে কণ্ঠ হলো বাঁধা। একদিনের প্রত্যাখ্যাত অর্ঘ আজ ডোম্বী গ্রহণ করে নিয়েছে। বঙ্কী আর মন্দির সেবার মধ্যে হঠাৎ ডোম্বীকে সেই অর্ঘ সজ্জিত দেখে বিস্মিত হয়ে ওঠে...

–ডোম্বী সেই অর্ঘ্য তুই গ্রহণ করেছিস...

–হয় দিদি... আমার অন্তরে তাই নৃত্য উঠেছে দিদি... সেই নৃত্য দেহে উঠে আসছে–আ...

ডোম্বী উত্তুঙ্গ নৃত্য ছন্দে দুলে ওঠে। সে সময়ে কুক্কুরী তার অন্তরের আনন্দ অন্তরে আড়াল করতে বুদ্ধ মন্দিরে প্রণাম ঠুকে পদ্মাপাড়ের আনন্দ ঢেউয়ের পাশে দাঁড়ায়... কুক্কুরী উপলব্ধি করেছে তার ইন্দ্রিয় আস্বাদের পথ সমাগত। কেননা ডোম্বী আজ দেবীর ভূষণে নৃত্যরতা... কুক্কুরী জানে সহজিয়াশাস্ত্রের বিধান... দেবীরাই দেবীর আভরণ পরে আর দেবীর আভরণ পরলেই মোক্ষপ্রার্থীকে তৃপ্ত করতে হয়। ডোম্বী তখন নৃত্যের প্রমত্ততায় নিজের সঙ্গে নিজেই এক নিষ্ঠুর ক্রীড়া করতে থাকে। তার উন্মত্ত নৃত্য দেখে মনে হয় এই নৃত্য কোনোদিনই শেষ হবার নয়। এই নৃত্যে বাতাস-পৃথিবী-আকাশও যেন দুলে দুলে ওঠে। ডোম্বী নৃত্য করে। পদ্মার ঢেউ আছড়ে পড়ে কূলে কূলে। অকস্মাৎ কূলের একটি পাড় ভেঙে যায়। আর প্রমত্ত নৃত্যের মধ্যে ডোম্বী আছড়ে পড়ে বঙ্কীর হৃদয়ের কাছে।

–দিদি আমি আর পারছি না... কুক্কুরী আমার মধ্যে মোহ ছড়িয়ে দিচ্ছে... এ মোহ থেকে মুক্তি চাই দিদি...

–কেন ডোম্বী কেন। কাহ্নু তো বোধিচিত্ত পেয়েছে বাহুবন্ধনও পাঠিয়ে দিয়েছে... সে তো আর ফিরবে না...

–তুমিও এই কথা বলছো দিদি...

–হ্যাঁ বলছি... এখন তোর এ মোহ অমূলক নয়...

–কিন্তু দিদি... তুমি কি বলতে চাও কুক্কুরীর মোহ যথার্থ...

–আমার তো তা-ই মনে হয়...

–না দিদি না। সেও কাহ্নুর মতো মোক্ষ চায় দিদি। আমি কি কেবলই ওদের বোধিচিত্ত-মোক্ষের জন্য ব্যবহৃত হবো... বলো দিদি। বলো এবারে আমার প্রতি কুক্কুরীর যে মোহ তা যথার্থ সংসার প্রেমের।

–ডোম্বী সে কথা না... আমি ভাবছি অন্যকথা।

–কী কথা...

–কুক্কুরীই এখানে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে... তা না হলে কোথায় যেতাম আমরা...

–তাই বলে দিদি... আশ্রয় দিয়ে যেজন আশ্রিতের কাছে মোক্ষ চায়... তুমি তারই পক্ষে যাবে...

–হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তারই পক্ষে... কি এমন আছে আমাদের যে এতকিছু ভাবতে হবে... সমাজ নাই সংসার নাই কিছু নাই... বল কি আছে আমাদের।

–দিদি... আমার আমি আছি... এই আমাকে আমি আর কাউকে দিতে পারবো না...

ডোম্বীর এই দৃঢ়তা প্রকাশে বঙ্কী এতটাই বিস্মিত হয় যে কোনো কথা বলতে পারে না। শুধু স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ডোম্বীর দিকে।

উনিশ

সে রাতে সকলের ঘুমের মধ্যে ডোম্বী তার দেবীর আভরণ খুলে মন্দিরে রেখে নিজেকে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে আরেক অনিশ্চিত পথে। এ পথে সে এবার মোহমুক্তির কথা ভাবে... ভাবে জীবন-দুঃখের মূল কারণ এই মোহ... মোহহীন হতে পারলেই জীবন-দুঃখের অবসান... কিন্তু সুখ কতদূর। কোন সুদূরে সেই মোহহীন জীবন... তা তার জানা নাই। তবু সে নতুন নতুন দুঃখ ভীতিতে মোহহীন হতে চায়।

যতদিন মোহ ততদিন জীবনে আসে নতুন নতুন দুঃখ। সেই সব দুঃখবোধকে অতি□ম করে যেতে মোহহীন হবার বাসনায় ডোম্বী রাতের অন্ধারিতে পথ চলে। পথের এক প্রান্তে কপাসু তুলার জোছনার মধ্যে সে এক সময় থেমে যায়। কেননা সেখানে সেই তুলার শুভ্রতাময় জোছনার ভেতর উৎসব চলে তুলা ধুনবার তালে তালে। উৎসবের তুলা উড়ানো নৃত্য-গীতে হুবহু ডোম্বীর প্রাণের কথারই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। ডোম্বী তাই স্থির থাকতে পারে না। তার অন্তর নেচে ওঠে উৎসবের নৃত্য-গীতে।

তুলা ধুনি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুনি ধুনি নীরবব সেসু॥ ধ্রু ॥
জীবন ধুনে দুঃখ পেয়েছি
দুঃখ ধুনে করেছি শেষ।
আহা বেশ বেশ বেশ।
মোহকে ধুনে শূন্য হয়েছি
আজকে সুখের নেইকো শেষ।
আহা বেশ বেশ বেশ।

উৎসবের নৃত্য-গীত থেমে গেলে অপরিচিতা ডোম্বীর প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশে তার পরিচয় জানতে এগিয়ে আসেন একজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ।

–তুমি তো নৃত্য-গীতে চমৎকার... কে তুমি জননী।

–ডোম্বী

–ডোম্বী। তোমার নামটাও মিঠা... তা তোমার আর পরিচয়।

–পরিচয়... দুঃখ।

–দুঃখ। এ কেমন কথা। তোমার বাড়ি কোথায়... কোথা থেকে এসেছো তুমি... এতো রাতে এখানেই-বা কেমন করে এলে...

–বাড়ি দুঃখ। দুঃখ থেকে দুঃখে এখানে এসেছি। কোথায় যাবো জানি না।

–কিন্তু জননী... যে তুমি এত চমৎকার গীতি-নৃত্য জানো... সে তুমি শুধু দুঃখে আচ্ছন্ন থাকবে কেন। জননী তুমি এখানে থেকে যেতে পারো... এই গ্রামে।

–এই গ্রামে... ।

–হ্যাঁ এই গ্রামে... তুমি নিশ্চয় নাঈ বাইতে জানো।

–জানি... কিন্তু কেন।

–আমাদের ঘাটে পারাপার করে দেবার কেউ নাই... এখন থেকে তুমিই আমাদের পার করে দেবে এপার-ওপারে... এই কথা সবাইকে বলে দিচ্ছি আমি... এই যে শোনো সকলে... ডোম্বী আমাদের পাটনি... এই যে দেখে রাখো সকলে...

জীবন নদীর পরিবর্তে ডোম্বী এখন জলের নদীতে পাটনি হয়ে যায়। প্রবীণ সেই ব্রাহ্মণের কথামতো শুরু হয় ডোম্বীর নতুন জীবন। এই জীবনে ডোম্বীর মনে যেন কোনো মোহ না জন্মে তার প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জনায় সে তার গৃহ তোলে গ্রামের বাইরে কোনো এক টিলার উপরে... যাতে সে সমাজ-সংসার থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে পারে- এই তার চেষ্টা।

বিশ

দুকূলের লোকেরা ডোম্বীকে ডোম্বী নামেই ডাকে। নতুন জীবনে আমাদের ডোম্বী যেনবা প্রভাতে টিলা হতে ঝরনার মতো নেমে সমস্ত দিন নদীতে মিশে থাকে। নাঈ বাইতে থাকে। আর সন্ধ্যায় গৃহে ফেরে। নদীকূলবাসীদের কাছে ধীরে ধীরে সে প্রিয়জন হয়ে ওঠে। কূলবাসীদের ধারণা ও' সূর্যের বোন চাঁদের দোসর। যে-দিক দিয়ে যায় সেদিকেই আলো ঝরে। ওর রূপ আর কথা সমান তালে চলে।

একদিন নির্জন নদীতে নাঈ বাইতে বাইতে ডোম্বীর মনে অদ্ভুত এক ঢেউ খেলা করে। ডোম্বী তার দিব্যচোখে তার নাঈ বাইবার দীক্ষাগুরুকে স্পষ্ট দেখতে পায়–

–কী রে ডোম্বী নাঈ বাইবি... আয় শিখিয়ে দেই।

–শেখাবে আমাকে...

–উঠে আয় না।

কিশোরী ডোম্বী নাঈ-এ ওঠে। সরহদা ডোম্বীর হাতে বৈঠা বাইতে শেখায়। ডোম্বী আজও সে দৃশ্য স্পষ্টত দেখতে পায়। সে তার কিশোর বয়স। সরহদা কেন যেন তাকে কাছে ডেকে নিতো বুঝতো না ডোম্বী। আজ সে শিউরে ওঠে। সেই সরহ তার জেঠাতো ভ্রাতা আজও কি তাকে কাছে পেতে চাইবে... ।

–হায় সরহদা তুমি আজ কোথায়... আমি এখন মেঘে মেঘে ভাসি... তুমি কি একটুও বোঝ না...

–কেন কী হয়েছে তোর...

ডোম্বী সরহদার কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠে। দেখতে চায় সরহদাকে। পায় না কোথাও। কারণ ও-ধ্বনি তো শ্রবণের বিভ্রম কিংবা শ্রবণের স্বপ্ন শোনা।

মাথায় ঝাঁকুনি দেয় ডোম্বী। ভাবনা তবু মাথার ভেতর পাক খেতে থাকে। সে নাঈ বাইতে শুরু করে। নাঈ চলে আসে মাঝ নদীতে হাতের বৈঠা পড়ে যায় জলে। জল ছিঁটকে পড়ে তার দেহে। সরহদা তাকে সাঁতার শেখায়। সে ভেসে সাঁতার কাটে। সরহ তার পাশে সাঁতার কেটে দেখায়। সরহর সাঁতারের জল ছিঁটকে পড়ে ডোম্বীর দেহে। নাঈ ভাসতে ভাসতে ধাক্কা খায় কূলে। ভেঙে যায় সব স্মৃতিরেখা কল্পলতা।

আরেক সুদর্শন যুবা তার নাঙ্গ-এ বসে। ডোম্বী তাকে নিয়ে যায় পারে। কূলে নাঙ্গ ভেড়ে যুবক তবু নামে না কেন। এক দৃষ্টিতে সে ডোম্বীর দিকে চেয়ে। যুবকের চোখে ধ্যানী দৃষ্টি দেখে ডোম্বী কেঁপে ওঠে। সে তার ধ্যান ভেঙে দিতে চায়–

–নাঙ্গ কূলে এসে গেছে

–ওপারে যাবো

–ওপার হতেই তো এলে

লজ্জিত যুবক নামতে উদ্যত হয়।

–ঠিক আছে ঠিক আছে নামতে হবে না। এপারে তোমার কাজ নেই।

'কি করে জানলে এপারে আমার কোনো কাজ নাই'–এই প্রশ্নটা যুবকের বুকে আসে তো মুখে আসে না। সে আরও মুগ্ধ হয়ে ডোম্বীকে দেখে। ডোম্বী তাকে পার করে দিয়ে অন্য এক যাত্রীকে নিয়ে নাঙ্গ বাইতে থাকে।

ডোম্বীর নাঙ্গ থেকে নেমে যুবক নেমে ফিরে ফিরে চায়। পারাপারের ব্যস্ততায় সেই যুবকের কথা ডোম্বীর ভাববার সময় কোথায়... অথচ সন্ধ্যায় যুবক দাঁড়িয়ে থাকে ডোম্বীর পথে। পথের ধুলো উড়িয়ে পদছাপ রেখে আনমনে দ্রুত হেঁটে যায় ডোম্বী। পথিপার্শ্বে যুবক তার চোখে পড়ে না। ডোম্বীর চলে যাওয়া দেখে যুবক হয়তো ভাবতে থাকে। 'সন্ধ্যায় পাখিরা কোলাহল করে কোথায় চলে যায়... পাখিরা কী তা বলে যায় কখনো'। সন্ধ্যার রং গাঢ় হতে থাকে। যুবকের চোখ থেকে দূর পথপ্রান্তে ডোম্বী অন্ধকারে মিশে যায়॥

একুশ

'আচ্ছা ওই যুবকের নাম তো জানা হলো না'–এই কথা ভেবে ডোম্বী শয্যার ভিতরে পীড়া অনুভব করে। রাত্রি গভীর হলে সে নিদ্রা যায়। তার নিদ্রার গভীরে ঢুকে পড়ে সে যুবক।

যুবক তাকে দেবী করে পূজার আসনে বসিয়ে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো পূজা করে। পায়ে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। পুষ্প নিক্ষেপ করে। চারিদিকে ধ্বনিত হয়–উলু লু লু। জয় জয়। ডোম্বীর জয়। শেষে সে ললাটের মাঝখানে দীর্ঘ চুম্বন দিতে থাকে। অকস্মাৎ দেবী থেকে মানবী হয়ে যায় ডোম্বী। তার ঘুম ভেঙে যায়–'এ কী দেখলাম'।

আন্ধারি জাল গুটিয়ে রাত তখন চলে গেছে দূরে। প্রভাতের নরম রৌদ্র চণ্ডালীর বেড়া গলিয়ে এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। ডোম্বী তাড়াহুড়ো করে রওনা দেয় নদীর পথে। দিনের প্রথম আলোয় পথিপার্শ্বে তখনও যুবক বসে। ডোম্বীর সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় কোথায়। যুবক তো প্রার্থনার বলয়ে ডোম্বীকে আগলে রাখতে চায়। কথা বলতে চায়। বুকে তার কথার ঢেউ মুখে আসে না কিছুই। ডোম্বী সম্মুখে এলে সে যে বোবা হয়ে যায়... কেন হয়ে যায়... সে ভেবে পায় না। আজ সে আবার ডোম্বী নাঙ্গয়ে উঠে বসে এবং এক স্বপ্ন ঘোরের মধ্যে ডোম্বীকে উদ্দেশ করে বলে–

–আমি পদ বাঁধবো...

–কীসের পদ

–তোমাকে নিয়ে পদ বাঁধবো।

–আমাকে নিয়ে... আমাকে নিয়ে আবার পদ হয় নাকি... হাসালে...

ডোম্বীর হাসিতে যুবক যেন আরও আবেগে উথলে ওঠে। আর ডোম্বী তাকে নিয়ে হাসতে থাকে আর বলে–

–তা তুমি যে পদ বান্ধো সে আমি আগেই বুঝেছি

–কী করে বুঝলে

–সেদিন তোমার ঐ চোখ দেখে...

–কীভাবে

–কবি হয়েছো আর এইটুকু জানো না... জানো না মানুষের বুকের কথা মুখের আগেই চোখে আসে... এইটুকু জানো না... চোখ দেখে মানুষের সব বোঝা যায়... তা তোমার নাম কী হে পদকর্তা...

–কাহ্নু... কাহ্নুপাদ...

–কাহ্নু...

ডোম্বী কেঁপে ওঠে। সে আর কথা বলতে পারে না।

'কে এই কাহ্নু'। কাহ্নুর বসতি এখন নেপালে। সে তো বোধিচিত্ত পেয়েই গেছে। আবার কেন কাহ্নু... তবে কি বোধিচিত্তপ্রাপ্ত সেই স্বামী কাহ্নুই ফিরে এসেছে আরেক রূপে এই যুবক কাহ্নুতে... ডোম্বীর মনে পড়ে কি বোধিচিত্তের পথে পা বাড়াবার ক্ষণে স্বামী কাহ্নুর বলে যাওয়া কথাগুলো–'মন রেখো আত্মার অনুভবে আমি একদিন মৃত্যুহীন হয়ে যাবো... সেদিন আমার আত্মা বিস্তারিত হবে পৃথিবীব্যাপী... কিছু কিছু মানুষের আত্মাতে মিশে থাকবো আমি... ।' কাহ্নুর আত্মা কী তবে এই কাহ্নুর মাঝে কাহ্নু হয়ে মিশে গেছে... ।

বাইশ

ভাবনার উথাল-পাথাল সমুদ্র সাঁতরিয়ে ডোম্বীর নিদ্রাহীন রাত্রি কেটে যায়। আর এক অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে হাতড়ে সে আরও অধিক বিপন্ন হয়ে ওঠে। উত্তর অনুসন্ধানে ডোম্বী এক সময় চোখ রাখে প্রভাতের স্বল্পালোকিত আকাশে। ঠিক তখনই তার দুয়ারে এক ভিক্ষু এসে ভিক্ষা মাগে। বিস্ময় আর সংশয়ের দোলাচালকে উপেক্ষা করে ডোম্বী তাকে ভিক্ষা দিতে যায়। সহসা ভিক্ষু তার মস্তক আচ্ছাদন খুলে ফেলে–

–আমি কুক্কুরী। আমি তো এই ভিক্ষা নিতে আসিনি

ডোম্বীর হাত থেকে ভিক্ষা সমেত চাঙ্গিড়া পড়ে যায়। ভীতি সংবরণ করে ডোম্বী এবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায়–

–এখনও তোমার মোক্ষ মেলে নাই কুক্কুরী... ।

–মোক্ষের পথে কারো না কারো শরণ লাগে... আমি শরণ চেয়েছি তোমার কাছে...

–না কুক্কুরী। তোমার ও আকাঙ্ক্ষা অবান্তর... যাও তুমি... ফিরে যাও...

–কেন ডোম্বী... কেন আমার পিপাসাকে অবান্তর বলছো... পিপাসা অবান্তর হলে এইভাবে আমি কি তোমার অন্বেষণে এখানে আসতে পারি...

–যে পিপাসা একজনকে নিয়ে যায় তৃপ্তিতে–বোধিচিত্তে... আরেক জনাকে ছুড়ে ফেলে দেয় যন্ত্রণায় বেদনায়... সে কেমন পিপাসা বলো তো কুক্কুরী... ।

ডোম্বীর এই কথার কুক্কুরী কোনো উত্তর করতে পারে না। ডোম্বী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উত্তর না পেয়ে বলে ওঠে–

–বলো কুক্কুরী... আমার জন্যে বোধিচিত্তের কোনো পথ নেই... বলো... বলো কুক্কুরী

–জানি না আমি।

–তাহলে আমি কেন তোমায় বোধিচিত্ত পথের কা ারি হবো বলো...

–ডোম্বী মতিভ্রমে ডুবো না... আমার হৃদয় প্রসারিত হয়ে আছে তোমার জন্যে... কিন্তু তোমার কথা আজ আমাকে বিভ্রান্ত করেছে... মতি থির করো... আমি আবার আসবো...

ডোম্বীর মতি থিরই আছে। বোধিচিত্তের পথবিভ্রম একজন নারীর দৃষ্টিতে এই প্রথম ধরা দিয়েছে। কুক্কুরী তা বুঝেছে... অনুভব করেছে। তাই সে কথা না বাড়িয়ে দূরত্ব নেয়।

তেইশ

ডোম্বী স্থির হয়ে বসে থাকে গৃহের দাওয়ায়। সে সময়ে তাকে ঘিরে ধরে আরেক ভয়... তারা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ কর ডোম্বী হৃদয়–

–কার হুকুমে ঘর তোলা হয়েছে। কে তুমি...

–তোমরা কারা...

–ও কিছুই জানো না দেখছি। রাজার দেশে ঘর তোলো... থাকো... আর রাজার খবর জানো না।

–তা জানবে কীভাবে। এই বনের ভেতর কেউ কি কখনও আসে। কেউ কি কারো খোঁজ রাখে...

–কিন্তু আমাদের রাখতে হয়। আমরা তো রাজার লোক

–তা তোর স্বামী কই

ডোম্বীর কোনো জবাব না পেয়ে একজন উচ্চারণ করে–

–পরিহানে দেখি সাদা রঙের বাহার

–ঠিকই তো।

–আচ্ছা আমরা যদি তোর স্বামী হই

–হে হে আমরা তোর স্বামী...

শিউরে ওঠে ডোম্বী। পালাতে সাধ হয়। কিন্তু তার পা যেন ভূমির সাথে আঁটকে আছে। সে টেনে তুলতে পারে না। হঠাৎ একজন তার আঁচল চেপে ধরে। ডোম্বী বাধা দেয়।

–না না

–না জোর করবো না। কোন ভয় নাই। আমাদের ধর্ম আছে না। তুই না রাজি হলে জোর করবো না।

লোকটি আঁচল ছেড়ে দেয়। তবে বাতাসে ভীতিকর হাসি ছড়িয়ে বলে–

–তবে শুনে রাখ... এ বনে থাকতে হলে হতে হবে ছিনালী।

–তা না হলে রাজা আছে না। দিতে হবে তার কর।

–যদি সেবা দিস তবে কিচ্ছু লাগবে না।

–কোন ভয় নাই আমরাই তোকে পুষবো... কোনো ভয় নাই...

'কোনো ভয় নাই' বলে তারা চলে যায়। অথচ ডোম্বীর চারদিক ভীতি বিস্তারিত হয়। আর সারা বনে গীত হয় সেই ভীতিকর গান।

অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছড়ই ভুসুকু অহেরী ॥ ধ্রু ॥
কার-বা নিয়ে কার-বা ছেড়ে
কেমন করে থাকি।
চৌদিকে আজ ঘের দেওয়া
হাঁকের ডাকাডাকি ॥
আপন দেহ হরিণ তোর
আপন হয় নাকো।
নিষাদে তাই তাক করেছে
কেমনে প্রাণ রাখো ॥

বৃদ্ধি পেতে তাকে তাদের আগমন। ডোম্বীর কাছে তারা খাবার প্রার্থনা করে। ডোম্বী নিরুপায়। তাদেরকে সে খেতে দেয়। কিন্তু ভয়ে ঘেমে ওঠে। 'না জানি কখন তারা আমাকে শিকার করে বসে'–এই ভয়ে ভয়ে রাত্রি অতি ান্ত হয়।

আর এর মধ্যে কখনো তার মনে হতে পারে না বুদ্ধের কথা। নির্বাণের কথা। নির্বাণ আসন্ন জেনে বুদ্ধকেও বহুরূপে আ ান্ত করতে চেয়েছে মার-রাজ। কিন্তু-মার তো তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। তবে কেন ভয়... সকল হারিয়ে সে তো এখন প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি। এখনও কেন ভয়। না তার কোনো ভীতি নাই... এরই মধ্যে সে নিশ্চিতভাবে মোহহীনতায় উত্তীর্ণ হতে চায়... তাহলে কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সেই প্রত্যাশা অন্তরে গেঁথে সকালে সে ঝরনা হয়ে নদীতে যায়।

চব্বিশ

রৌদ্রের সুভ্রতায় কাহ্নুপাদ ডোম্বীকে আবিষ্কার করে নৃত্যের মুদ্রায়। তা তা থৈ থৈ। ভোমরা হয়ে ডোম্বী নাচে পদ্মের উপর। পদ্মের পাপড়ি খসে না। বরং অপরূপ আলোয় কেঁপে কেঁপে ওঠে ডোম্বীর স্পর্শ শিহরণে ও নৃত্যের দোলায়। পদ্মের এমন কাঁপুনিতে জল কাঁপে। যেন জলও নৃত্যমান। কাহ্নু ঘোরের ভেতর পদ বান্ধে–

এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী ॥

কাহ্নুর পদ শ্রবণের সময় হয় না ডোম্বীর। সে যায় নদীতে। আর কাহ্নু মনে মনে পদ বান্ধে। তার পদে ঢুকে পড়ে ডোম্বীর প্রেমের তন্ত্রী বোনার কথা। যে তন্ত্রীতে কাহ্নু বেঁধে গেছে। তার আর মুক্তি নাই। ডোম্বী যে মাঝে মধ্যে চাঙ্গিড়া বিকে সে কথাও কোনো অবচেতনে যেন পদে ঢুকে যায়... কাহ্নু তা জানে না।ব্রাহ্মণ কাহ্নু ডোম্বীর প্রেমে ব্রাহ্মণ্য ভুলে যেতে চায়। তাই তো গায়–

নগর বাহিরে ডোম্বী রে তোর ঘর
ছুঁয়ে যাস পথে যেতে বারবার ॥
ডোম্বী রে তোর সঙ্গ আমি নেবোই নেবো।
কাহ্নু আমি তোকেই সবই দেবো ॥
তোর নেশাতে সবই ছাড়ি।
হাড়ের মালা গলায় পরি ॥
ডোম্বী রে তুই জল কাঁপিয়ে।
মৃণাল তুলে যাস যে খেয়ে ॥
ডোম্বী রে তোর শরীর চিরে
হৃদয় নেবো হরণ করে ॥

কাহ্নুর এ-পদ শ্রবণে নদীবর্তী ব্রাহ্মণেরা বিস্মিত হয়। তাদের বিস্মিয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র গ্রামে।

কাহ্নুর একান্ত সুহৃদ ভাদে কাহ্নুকে বোঝাতে চেষ্টা করে–

–দেখ কাহ্নু তুই ব্রাহ্মণ। ডোম্বীকে নিয়ে পদ বান্ধা তোর সাজে না...

–জানি আমি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তার চেয়ে আরেকটি সত্য আমি জানি–আমি মানুষ। ডোম্বীও মানুষ।

–তাই বলে কি তুই জাতকে উপেক্ষা করতে পারবি...

–হ্যাঁ হয়তো পারবো না। কিন্তু আমি যে অক্ষম... হৃদয় উৎসারিত সত্যকেও তো উপেক্ষা করতে পারি না।

–জেনে শুনে এ-ভুল তুই করিস না।

–এ ভুল নয় ভাদে... এ এক পরম সত্য। এর নাম প্রেম। আমি এ প্রেম মায়ার ভেতর থেকে কিছুতেই নিজেকে বের করে আনতে চাই না। চাই না। চাই না।

কাহ্নুর এমন হৃদয় উৎসারিত কথার ভেতর ভাদে আর কোনো কথা বলতে পারে না। সে তাই নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করে। আর কাহ্নুর নদীর ঢেউরাশির দিকে তাকিয়ে ঝিকিমিকি ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে ডোম্বীর প্রতিকৃতি রচনা করে।

ভাদে শেষ পর্যন্ত কাহ্নুদের গৃহে ছুটে যায় এবং কাহ্নু-পিতৃর মুখোমুখি হয়।

–জেঠা কাহ্নুর লক্ষণ ভালো না...

–মানে...

–মানে কিছু না। ওর নতুন পদ বান্ধার কথা শুনেছো...

–এ আর নতুন কী... ওর কাজই তো নির্বিকার ঘুরে বেড়ানো আর পদ বান্ধা...

–কিন্তু এ-পদে ও ডোম্বীকে সাঙ্গা করতে চেয়েছে। তাছাড়া প্রায় সময় ঘাটের কূলে ঘোরা ফেরা করে। ডোম্বীর সাথে...

–আর শুনতে চায় না। একি বললে ভাদে একি... সত্যি...

–এমন করতে থাকলে ব্রাহ্মণদের কুল অকূলে ডুববে। কাহ্নু আসছে ওকে বুঝিয়ে দেখো। না বুঝলে যে কী হবে আমি ভাবতে পারছি না।

কাহ্নু এসে পৌছালে পিতা তাকে সরাসরি আ□মণ করে।

–বন্ধ কর ওই পদ বান্ধা

–কেন নতুন করে আবার কী হলো...

–ডোম্বীকে সাঙ্গ করতে চাও কোন সাহসে... তুই কি জাত-পাতের মাথা খেয়েছিস...

–তা-ই হয়তো... কিন্তু বাবা... তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন...

–প্রশ্ন...

–হ্যাঁ বাবা... একটা সামান্য প্রশ্ন... আচ্ছা বাবা বলো তো... ডোম্বী যদি ব্রাহ্মণের পারাপারের জন্য নির্বাচিত হতে পারে... তবে কেন সাঙ্গার জন্য নির্বাহিত হতে পারবে না... কেন...

অকস্মাৎ কাহ্নুকে পিতা একটা চপেটাঘাত করে বলে–

–চুপ কর বারুণী খোর... জাত গেলে সমাজে আমাদের থাকে কী...

–সমাজ... যেখানে মানুষ থেকে জাত বড়–সে কি সমাজ... আমার খুব প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে... আকাশের চেয়ে মেঘ কি কখনো বড় হতে পারে... নাকি মানুষের চেয়ে জাত... যদি তা-ই হয়... তবে আমি এ সমাজ মানি না মানি না... আমাকে ক্ষমা করে দিও এখনই চলে যাচ্ছি...

কাহ্নু যেতে উদ্যত হলে পিতা আকুল হয়ে বলে ওঠে–

–ভাদে ওকে ফেরাও। কাহ্নু যাসনে... কাহ্নু...

–আমি ওকে দেখছি জেঠা। তুমি শান্ত হও।

–তুমি ফেরাও আমার কাহ্নুকে।

–আমি যাচ্ছি জেঠা। তবে তোমাকে একটা কথা বলে যায়...

–কী কথা

–জেঠা অমনভাবে রেগে যাওয়াটা বোধ হয় আপনার ঠিক হয়নি।

–মানে

–জেঠা। আমি যতটুকু বুঝি... এসব ব্যাপারে রেগে কোনো ফল পাওয়া যায় না... তাই বলি কী... এরপর থেকে তুমি ওর ব্যাপারে মাথা ঠা া রেখো জেঠা...

–কেমন করে মাথা ঠাণ্ডা রাখবো... ওর ওই পদ বান্ধার কথা মনে হতেই আমার মাথায় যে আগুন ধরে যায়... ছি ছি ছি... ঘাটের পাটনীকে নিয়ে কাহ্নু পদ বান্ধতে শুরু করছে... এমন ঘটনার পর আমি কেমন করে আমার মাথা ঠাণ্ডা রাখি...

–কিন্তু আপনাকে তাই করতে হবে জেঠা। ওকে ফেরাতে হলে এর আর কোনো ভিন্ন পথ নেই... আমি যাচ্ছি... দেখি ওকে ফিরিয়ে আনতে পারি কি-না...

কাহ্নুর উদ্দেশে ভাদে গৃহের বাইরে চলে যায়। এক্ষণে কাহ্নুর পিতার কাছে কাহ্নুর মাতা এসে জোটে। আকুল পিতা তখন যুগল হাতে পিষতে থাকে আপনার কেশপাশ–

–আমি এখন কী করি...

–কী হয়েছে তোমার...

–এতক্ষণ কোথায় ছিলে... তোমার পাদ-পূড়ার (কবি ছেলের) কাহিনী শুনেছো...

–কীসের কাহিনী...

–পদ বান্ধার... তুমিই তো বলেছিলে তোমার কাহ্নু বড় কবি হবে চারিদিকে তার নাম হবে। সে এখন ডোম্বীকে নিয়ে পদ বান্ধে। ডোম্বীকে সাঙ্গা করতে চায়...

–এ-কী সত্যি বলছো...

–সত্যির দেখেছো কী... গ্রামের পথে পথে তার সে পদ ছড়িয়ে পড়েছে। আমার জাত ধুলোয় খাবি খাচ্ছে...

–আমি জানতাম ওই ডোম্বী এমন ঘটাবে। ও তো ডোম্বী নয়। ও নৈরামণি। আজ কাহ্নুকে ছিটা মেরেছে আস্তে আস্তে গ্রামের সব নর-কে ছিটা মারবে।

–ঠিক কথা নৈরামণি

–শুদ্ধ খুড়োকে বলো। ওকে না তাড়ালে আগুন জ্বলবে সারা গ্রামে... আগুন...

কাহ্নু মাতৃর এমত উচ্চারণ সহস্র প্রতিধ্বনিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং সমগ্র গ্রামে খুব গোপনের প্রচারিত হতে থাকে–'ও ডোম্বী নয়... নৈরামণি।' ভিতরে ভিতরে কিছু ব্রাহ্মণ তাই নৈরামণি নিধনের প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত নেয় ॥

পঁচিশ

আজ ডোম্বীর ব্যস্ততার দিন। নদীর ওপারে মেলা বসেছে। এ পারের সকলেরই তাই ওপারে যাওয়া চায়। যেসব শিশু-কিশোরেরা কখনই ওপারে যায়নি তারা আজ ওপারে যাবার আহ্লাদে ফেটে পড়ে। ডোম্বী তাদের আহ্লাদ দেখে ক্লান্তি ভুলে নিজেকে শিশু ভাবতে থাকে। আর তা-ই ভেবে সে নৌকা বায়তে বায়তে ছোট এক শিশুর সাথে কথা বলে ওঠে–

–দিদিমণি মেলায় যাচ্ছো আমাকে নেবে না।

শিশুটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়–'তুমি চলো আমাদের সঙ্গে।'

–কিন্তু দিদিমণি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে পার করে দেবে কে... ওই যে দিদিমণি ঘাটের কূলে আর কতজন পারের আশায় দাঁড়িয়ে আছে... ওদেরকে পার করে দেবে কে... আমি থাকি দিদিমণি... ওদেরকে যে পার করে দিতে হবে... ।

–তাহলে আমার সঙ্গে যেতে চাইলে কেন...

–আজ আমায় ক্ষমা কর... আমি না হয় অন্যদিন যাবো... দিদিমণি দিদিমণি মেলায় যাচ্ছো যাও... তবে বলে যাও এই দিদির জন্য তুমি কী আনবে... ঠিক আছে ঠিক আছে... এখন বলতে হবে না... আমার জন্য মেলা থেকে কিছু এনে দিও কিন্তু...

–আচ্ছা।

ফেরার পথে সেই শিশুটি ডোম্বীকে এক কৌটা সিঁদুর উপহার দিতে যায়। কিন্তু কেন... কখনো কখনো শিশুরা ভবিতব্যের ইশারা পেয়ে আগাম কিছু করে বসে... ডোম্বীর জন্য এ শিশুর আজকের সিঁদুর দান এমন কিছু নয়তো।

ডোম্বী শিশুটির হাত থেকে সিঁদুরের কৌটা নেবার পরিবর্তে তাকে একটা চুম্বন দিয়ে হেসে বলে–

–আমার জন্য সিঁদুর এনেছো

–সিঁদুর লাগালে তোমায় বড় ভালো লাগবে যে...

–কিন্তু দিদিমণি আমার এ ভাঙা কপালে কী লাগে... তুমি এ সিঁদুর নিয়ে যাও... তোমার মাকে দিও... আমার কথা যে মনে রেখেছো এতেই আমি খুশি।

–না আমি নেবো না। আমার মায়ের তো আছে। তোমার কপালে সিঁদুর নেই বলেই তো সিঁদুর এনেছি আমি।

–দিদিমণি

–এ সিঁদুর তোমার জন্য এনেছি... তুমিই নাও।

তাদের কথার মধ্যে শিশুটির সহযাত্রী এক গুরুজন এতক্ষণে কথা বলে ওঠেন–

–নাও ডোম্বী নাও। রেখো দাও। এত করে ওকে নিষেধ করলাম কিছুতেই আমার কোনো কথা ও শুনল না। উল্টা আমাকে শুনিয়ে ছেড়েছে–সবাই সিঁদুর নেয় শুধু তুমিই কেন নাও না... ও যে তোমার সিঁথিতেও সিঁদুর দেখতে চায়। তুমি রেখে দাও।

গুরুজনের এই অনুরোধকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় থাকে না ডোম্বীর। তাই সে শিশুর হাত থেকে সিঁদুরের কৌটাটা হাতে নিয়ে শাড়ির আঁচলে বেঁধে রাখে।

ছাব্বিশ

সারাদিন মেলার জন্য নৌকা পারাপারের কাজ শেষ করে ডোম্বীর আজ ফিরতে বেশ দেরি হয়। সন্ধ্যার পর ফেরার পথে কাহ্নুকে না দেখে হঠাৎ কেন জানি তার বুকটা কেমন করে ওঠে। ডোম্বী ঘুরে ফিরে এদিকে ওদিকে তাকায় না পথের কোথাও কাহ্নু নাই। ডোম্বীর বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে। সে কি তবে কাহ্নুর মুগ্ধ বাৎসল্যের প্রেমে

পড়ে গেছে। কেমন ছলছল মায়াবী চাহনিতে প্রতিদিন পথের পাশে বসে কাহ্নু তাকে দেখে। আজ পথের পাশে সে নাই। ডোম্বী তার বুকের ভেতর একটা চিনচিনে অবস্থিতি অনুভব করে। আর এরই মধ্যে অকস্মাৎ সে সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে একদল মানুষ এসে ডোম্বীকে ঘিরে ধরে–

আরে ও নৈরামণি
নৈরামণি
নৈরামণি
নৈরামণি
এতদিন তোর চিনিনি ॥
না চিনেই ডোম্বী ওরে
করেছি পাটনি তোরে ॥
সেই দিন ঘুচে গেছে
চিনেছি হাড়ে হাড়ে।
কোথা আজ যাবি ওরে
আঘাতটা দিলে ঘাড়ে ॥
নৈরামণি
নৈরামণি
নৈরামণি ॥

তাদের প্রলয় নৃত্যে ডোম্বী অসহায় বোধ করে এবং সহসা ভূপাতিত হয়। তবু তারা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে কাল সন্ধ্যার প্রহেলিকায় পালিয়ে যায়। আর ডোম্বী মৃতবৎ পড়ে থাকে পথের উপর। কতক্ষণ পর তার চেতনা ফেরে তা সে জানে না। চেতনা□ান্ত হলে সে কেবল দেখতে পায় গাঢ় কৃষ্ণকায় রাত আর তার আঁচলে বাঁধা সিঁদুর নির্গত রক্তের সাথে মিশে গেছে। দেহ বস্ত্রকে তাই অন্ধকার মনে হয়। তার চেয়েও নিজেকে বেশি অন্ধকার মনে করে সে উচ্চারণ করে–

–আমি নৈরামণি নৈ-রা-মণি নৈরামণি

বহু কষ্টে ভূমি আগলে আগলে প্রভাতের আগেই সে গৃহে পৌঁছে। নিঃসঙ্গ গৃহে কিছু বেদনার্ত দিন অতিবাহিত হয়। সে আর নৌকা বাওয়ার কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু শয্যায় একদিন মনে পড়ে যুবক কাহ্নুর মুখচন্দ্র। সে যদি এখানে চলে আসে।

–না না... এ ভাবনা অনুচিত... তার প্রতি আর যেন আমার মোহ না জন্মে... হৃদয় তুমি বশে আসো... মোহ জেগে উঠবার শাস্তি আমি পেয়েছি... কবি কাহ্নু তুমি থাকো তোমার মতো... ।

রাত্রি তার নিজেকে এভাবে প্রবোধ দিতে দিতেই অতি□ান্ত হয়।

সাতাশ

সকালের মৃদু আলো বেড়ার ছিদ্র পেরিয়ে ডোম্বীর চোখে এসে পড়ে। নির্ঘুম ক্লান্তি জড়ানো দেহে সে ধীরে সুস্থে বিছানা ছেড়ে উঠে দুয়ার খুলে দিতেই বিস্মিত হয়। উঠোনে কাহ্নু দাঁড়িয়ে। বিষণ্ন বস্ত্রে কবি-কাহ্নু হাসে। ডোম্বী সন্ত্রস্ত হয়। এ কী দেখছে সে... সন্ত্রস্ত ডোম্বী আবার ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঘরে সে স্থির থাকতে পারে না। তাইতো দুয়ার পেরিয়ে আবার বাইরে চলে আসে। এবার কবি-কাহ্নু তার সামনে এসে আবেগে বলে ওঠে–

–তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া। তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।

–আমি নৈরামণি। আমি নৈরামণি। আমাকে কেন পদ শোনাতে এসেছো।

–না এ কোনো পদ নয়... এ আমার অন্তর নিঃসৃত ধ্বনি... ডোম্বী এই আমি এখন তোমার হয়ে গেছি... তোমার হয়ে গেছি... তুমি আর আমাকে ফিরিতে দিতে পারবে না... কিছুতেই পারবে না।

–কিন্তু আমি যে নৈরামণি... ।

–আমার কাছে তুমি পদ... তুমি আমার কাব্য-কুসুম...

–না না আমি নৈরামণি

–না না তুমি আমার কাব্য-কুসুম... কিন্তু আজ তোমাকে এমন দেখি কেন... কেন তুমি রক্ত লোহিত বস্ত্রে ম্লান... কেন তুমি বিষণ্ন মলিন... কেন কেন...

–এই আমার শাস্তি... নৈরামণি হবার শাস্তি...

–বুঝেছি... বুঝেছি ডোম্বী... আমি সব বুঝেছি...

–কী বুঝেছ...

–বুঝেছি... এই ওদের নৈরামণি নিধন... আহা ডোম্বী আমাকে তুমি ক্ষমা করো... সব দোষ আমার... আমার ভালোবাসার... তোমাকে নিয়ে পদ বান্ধার...

–কী বলছো তুমি...

–আমি তোমাকে নিয়ে পদ বেঁধেছি বলেই তোমাকে ওরা এই শাস্তি দিয়ে গেছে... আমাকে তুমি ক্ষমা করো... ক্ষমা করো... আমাকে তুমি গ্রহণ করো...

বিনীত ভঙ্গিমায় অকস্মাৎ কাহ্নু লটিয়ে পড়ে ডোম্বীর পদপদ্মে। ঘটনার আকস্মিকতায় ডোম্বী বিমূঢ় হয়ে যায়। সে তার পায়ের কাছ থেকে কবি কাহ্নুকে ছুড়ে ফেলতে পারে না। কেননা তার জীবনে অন্য কোনো পুরুষ তার পায়ের কাছে এইভাবে নিজেকে সমর্পণ করে নাই। সে তাই পায়ে নিবেদিত কবি কাহ্নুকে বাহু ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়।

সে সময়ে যুবক কাহ্নুর টলটলে চোখে ডোম্বী তার নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখে শিউরে ওঠে–'না না কবি-কাহ্নুর চোখে কোনো প্রলোভন নেই... আছে কেবল নিজেকে সমর্পণ করার আনন্দ-তৃপ্তি... '।

ডোম্বী স্বামী-কাহ্নুর অভিব্যক্তিতে এই আনন্দ কখনই দেখে নাই... স্বামী-কাহ্নুর আনন্দ ছিল মোক্ষলাভের পথে এগিয়ে যাবার... ভোগের... ।

কুক্কুরীর আকাঙ্ক্ষাও ছিল মোক্ষ আর ভোগ সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কবি কাহ্নুর আকাঙ্ক্ষা একেবারে অন্য রকম... তার চোখের ভাষায় ডোম্বী বুঝেছে হৃদয়ের অর্জন আর সমর্পণের ভাষা। সেই আশ্চর্য ভাষা পাঠে ডোম্বী তাকে বুকে জাপটে ধরে–

–আমি বুঝেছি কাহ্নু... বুঝেছি তোমার চোখের ভাষা।

ডোম্বীর কথায় 'হু হু' আবেগে কাহ্নুর চোখে ঝরনা নামে। চোখের সে জল ডোম্বীর পরিহান চুম্বনে হারিয়ে যায়... গোপনে। আর এরই মাঝে ডোম্বীর আঁচল হতে রক্ত লোহিত সিঁদুর সংগ্রহ করে কাহ্নু রাঙিয়ে দেয় ডোম্বীরই সিঁথি।

এ সময় তাদের চোখে-মুখে কীসের যেন আলো ঝলকে ওঠে... যার ঔজ্জ্বল্যে চন্দ্রকে... সূর্যকে... এমনকি আকাশের তারকারাজিকে ক্লান্ত আর ম্লান মনে হয়। এ মিলনে সূর্য তবু স্নেহশীল হাসিতে পৃথিবীকে ভরে তোলে।

আর পৃথিবীর রন্ধ্রে যখন এক একটি প্রেম সূচিত হয় তখন বায়ুরা অন্য রকম বয়–আকাশ অন্য রকম হয়–মানুষেরা হয়ে যায় মানুষের অধিক প্রজাপতি মৌমাছি কিংবা হরিণ-হরিণী।

তারা সেই ছায়াঘন সবুজের বুকে তাই হরিণ-হরিণী হয়ে যায়। তখনও সপ্তর্ষি যথাবিধি জিজ্ঞাসা হয়ে আকাশের অজস্র তারকার মাঝে আলাদা বেশে পৃথিবীকে দেখে। ছায়াপথ ভেসে যায় নৈর্ঋতে। আর এই পৃথিবীর দুটি মানব-মানবী ভালোবেসে হরিণ-হরিণী বেশে মানুষের অগোচরে বনে বনে ঘোরে।

এরই মধ্যে একদিন হরিণী ডোম্বী কবি-কাহ্নুর পদ শুনতে চায়–

–তোমার পদটা শোনাও

–কোন পদ

–এই ভুলে গেলে... আমাকে নিয়ে যে পদ বান্ধতে চেয়েছিলে। তা বান্ধতে পারনি তো। আমি তো আগেই বলেছিলাম আমাকে নিয়ে পদ হয় না।

–খুব হয়। তোমাকে নিয়ে সেই পদ সেই কবে বান্ধা হয়ে গেছে। তুমি কি তার খবর রাখো। কতবার শোনাতে চেয়েছি। তুমি স্থানই দাওনি।

–আজকে শুনি

–জানো ডোম্বী পদ সব সময় আসে না। সব সময় গাওয়াও যায় না।

–তাই নাকি

–তবে তুমি যদি এইভাবে পাশে থাকো। তাহলে যেন আমি অনন্তকাল পদ বান্ধতে পারবো। পদের জন্য আশ্চর্য এক শক্তি লাগে। লাগে কোনো এক গূঢ় অনুপ্রেরণা। তোমার মাঝে সেই গন্ধ দানের ক্ষমতা আছে। গোপন এক কাব্য শক্তির অনুপ্রেরণা আমি তোমার মাঝে দেখেছি ডোম্বী। কাজে কাজেই আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমি তোমারই গোপন ইন্ধনে এমন সব পদ বেঁধে যাবো। যেসব পদ হবে অনন্ত আনন্দরূপ। সে পদ তুমি–ডোম্বী তুমি। আমার আনন্দ রূপ পদ থেকে তোমাকে কেউ কোনোদিন পৃথক করতে পারবে না।

একসো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি।
তহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ি ॥

–আমি পদ হয়ে গেছি!

এই বাক্যে অনন্দ-মুগ্ধতায় ডোম্বী আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যেতে চায়। শুধু তা-ই নয়... আজকের মতো দেহ-মনের হিল্লোল নৃত্যে নিজেকে ছাড়িয়ে দেবার অপরূপ আনন্দ এর পূর্বে সে কখনই অনুভব করে নাই। তার মনে হয় ভুবন পুষ্পের আধারে কবি কাহ্নু একটি মধুময় পুষ্পদ ... তারই মন্ত্রে একটি প্রজাপতি যেইভাবে বারবার উড়ে উড়ে একই স্থানে বসে বসে আনন্দ পায়... আজ থেকে ডোম্বীও কবি কাহ্নুকে ঘিরে সেই আনন্দ অনুভব করতে চায়। কিন্তু কবি কাহ্নু শঙ্কিত... সে এই প্রেমবাক্যের মধ্যেই সমগ্র অরণ্য কম্পিত নিষাদের ধ্বনি শুনতে পায়... কেননা কাহ্নু সামাজিক বিধান জানে... আর জেনেছে প্রেমের মহিমা... প্রেমই মানুষকে মানুষের অগোচরে হরিণ-হরিণী করে তোলে আর বিপক্ষে সমাজ-সম্প্রদায় হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর-নিষাদ... কাহ্নু অন্তর শ্রবণে শুনতে পায় নিষাদের ধ্বনি–'আমরা আসছি কাহ্নু... আসছি... তোর পরিণাম ঘটাতে আসছি... ।' কাহ্নু মন-নয়নের আলোয় তাদের ভয়ঙ্কর আ□মণ যাত্রা স্পষ্ট দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে–

–ডোম্বী ডোম্বী নিষাদ আসছে...

–নিষাদ আসছে

–হ্যাঁ হ্যাঁ... প্রেমের অনুভূতিতে হরিণ-হরিণী হলেই নিষাদেরা আসে... তারা আসছে ডোম্বী... আসছে...

–এখন তাহলে উপায়... উপায় কি কাহ্নু...

–এ বন ছাড়ি হোহি ভান্তো... প্রেম রক্ষার্থে চলো পালাই... চলো ডোম্বী চলো পালাই

–তাই চলো...

–ওই তো অরণ্যের প্রকম্পন বাড়ছে... নিষাদেরা আসছে...

–ওরা আসবার আগেই আমাদের পালাতে হবে... চলো... চলো...

–চলো... এই দেহ এখন প্রেমময়... এই প্রেমময় দেহ হত্যার জন্য নয়... চলো পালাই... পালাই...

–চলো...

–তুমি জানো না ডোম্বী... আমার মনান্তরে আজ কে যেন এসে ধ্বনিত করে চলেছে একটিই গান... অপণা মাংসে অপণা বৈরী। এ বন ছাড়ী হোহি ভান্তো।

–এর অর্থ কী...

–আমাদের ভালোবাসাই আমাদের শত্রু... এই ভালোবাসা রক্ষার্থে আমাদের পালিয়ে বেড়াতে হবে দূর বহু দূরে...

–তবে কী সত্যিকার ভালোবাসার এই পরিণতি...

–হ্যাঁ হ্যাঁ... ঠিক তাই... সমাজ-সংসার আর জাগতিক ক্ষুধার বিপক্ষে তার গতি। তাইতো যুগে যুগে ভালোবাসা-প্রাণ মানুষদেরকে এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে ছুটে পালাতে হয়... ছুটে চলতে হয়... দূর বহু দূরে। কেননা ভালোবাসার গন্তব্য থাকে দূর সুদূরে... তার যাত্রাপথ সীমাহীন গন্তব্যের পথে হারিয়ে যায়... আর সেখানেই ভালোবাসার পরম আনন্দ... চলো আমরা সেই আনন্দে মিশে যাই... চলো চলো...

–চলো...

সহসা প্রেমময় আত্মার অনুভবে কাহ্নু-ডোম্বী হরিণ-হরিণীরূপে একে অপরকে সঙ্গ করে ছুটতে থাকে... যে ছোটার গতিতে তাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে প্রকৃতির অপরূপলীলা বায়ু নদী পাখি আর গান। তারা ছুটতে থাকে প্রেমময় আত্মার অনুভবে জগত-সংসারে। পৃথিবীতে তাদের প্রেমের সেই গতিময় মহিমা অনন্তকাল ধরে প্রবহমান রয়... আজও কান পাতলে তাদের প্রেমগাঁথা চর্যার শরীর থেকে বাংলার মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ে।

শব্দার্থ

(যে শব্দগুলো চর্যাপদ থেকে আহরিত হয়েছে তার অর্থ)

অপণা = নিজের। অন্তউড়ি = আঁতুড় ঘর। অন্ধারি = অন্ধকার। এক সো = একটি। এথু = এখানে। কর = ঢোল বা ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। কপাসু = কার্পাস। কশালা = কাঁসি। কুরাড়ী = কুঠার। গান্তি = গাইছে। গুঞ্জার মালা = এক ধরনের ফুলের মালা। ঘরিণী = স্ত্রী। চঞ্চালী = চ্যাঁচাড়ি। চণ্ডালে = নিচু জাতি। চড়ি = চড়ে বা উঠে। চাঙ্গিড়া = চাঙারি। চাহমি = চাই। ছাড়ী = ছেড়ে। জীবন্তে = জীবন থাকতে। তহিঁ = তার উপরে বা তাতে। তেন্তলি = তেঁতুল। দুন্দুহি = দুন্দুভি। নাঈ = নৌকা। নাচই = নাচে। নাচন্তি = নাচছে। ণিঅ = নিজ। নেউর = নূপুর। পইসহিনি = প্রবেশ করে। পড়হ = পটহ। পরিহাণ = পরিধান। পাখুড়ী = পাপড়ি। পিটা = পাত্র। পূড়া = পুত্র। ভণই = বলে। ভান্তো = ভ্রান্ত, প্রিয় স্থানকে ভুলে বা ত্যাগ করে দূরে যাবার অর্থে ভ্রান্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলঅ = বলো। বহুড়ী = বউ। বারুণী = এক প্রকার মদ। বাপুড়ী = বেচারি। বিসমা = (বি+সমা) সমা বা সমতার বিপরীত; সমান নয়। বিশেষ = পার্থক্য। বৈরী = বিরূপ বা শত্রু। বোধিদ্রুম = যে বৃক্ষের নিচে বসে শাক্যমুণি গৌতম বোধিচিত্ত লাভ করেছিলেন। মইলেঁ = মরণে বা মরলে। মুত্তাহার = মুক্তার হার। রঅনি = রাত্রি। লেলী = নিয়ে গেল। সাসু = শাশুড়ি। সসুরা = শ্বশুর। সাঙ্গা = বিধবা বিবাহ। সো = তা। হোহি = হও।

রচনাকাল : ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

মহামানবসংহিতা

প্রণামপর্ব

এই কাহিনীর শিরা উপশিরায় শাখায় পত্রপল্লবে যার কথা লিপিবদ্ধ হবে তার তরে প্রণতি জানাই বিশ্বম্ভর চৈতন্যকে– মরু শিশু কিশোর ও যুবক মহম্মদকে। প্রণতি জানাই নির্বাণপুরুষ গৌতমবুদ্ধকে– পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ঈসাকে মুসাকে। প্রণতি জানাই বর্ষে বর্ষে □ন্দনরত জিকা গাছকে আর শীতার্ত খেজুর বৃক্ষকে– যার কণ্ঠ চিরে আমরা তার যন্ত্রণায় বদলে পান করি অমিয়ধারা। হে মহান খেজুর বৃক্ষ আপনাকে প্রণাম। প্রণাম আপনারই মতো অমিয়আধার মহামানবকুলে। প্রণাম চতুর্দিক (ঈষাণ-নৈর্ঋত-অগ্নি-বায়ু) বায়ুমণ্ডলে প্রণাম। প্রণাম ঊর্ধ্ব ও অধ– ভূমণ্ডল সপ্তাকাশ। প্রণাম সমুদ্রধারা। প্রণাম তারকারাজি রাত্রি ঝলকিত চন্দ্রালোক। প্রণাম আসরে আসীন শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডল।

প্রস্তাবনাসঙ্গীত

মহা মহাকাল হে মহাকাল তোমার কোনো পাদটীকা নাই কোনো উৎসটীকা নাই কেবল মধ্যাহ্নললাটে চন্দনতিলক-অগ্নিরশ্মি-গন্ধরাশি। এই অগ্নি-তিলক-চন্দন-গন্ধ কোনো পুষ্প নয় কোনো বর্ণ নয় শুধুই মানব–কালের পরিভাষায় মহামানব।

বোধি বোধে এক রাজার কুমার বুদ্ধ হয়েছিলেন। জন্মের ঠিক সাতদিন পর মাকে হারিয়েছিলেন।

মাকে ছাড়াই বেঁচেছে কৃষ্ণ-মুসা; একথা কে-না জানে– বেড়েছে হযরত দুধমা'র বুকে সমাজ বিধান মেনে।

আপনার মাকে আপনার পাশে–বুকে পায় নাই যারা আপনার সুখে-দুখে– তাদেরই শোণিতে তবু তো গাঁথা অনুভব অনুভূতি। বোধের আধারে অনুভূতিময় তারাই দিব্যজ্যোতি– তারা মহামানব ...

শেষ দিয়ে শুরু

কী এমন মায়া আছে ওই শূন্যতায়– যে মায়ায় খোলা আকাশজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রহ-তারা-চাঁদ। বলো নিভৃত অরণ্যকুল খাঁ খাঁ মরুভূমি গহীন হেরাগুহা– তোমাদের নির্জন বুকেই-বা কোন মায়ায় ধ্যানে বসেছিলেন শ্রীমান গৌতম-ঈসা-মুসা-হযরত মহম্মদ। আর এক সময় সেই ধ্যান থেকে নিয়ে এসেছিলেন মানুষকে দীক্ষিত করার এক একটি মহামন্ত্র। ঠিক মন্ত্র নয়– মহামায়া। যেন মহাশক্তি। প্রায়শ বিপন্নতার ভেতর থেকে আমরাও কী সেই শক্তিকে পেতে চাই? তা না হলে কেন বলি– সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাবো– অরণ্যে কোথাও। তবে কী আমরাও তাদেরই মতো– সেই নিভৃত নির্জন অরণ্য শূন্যতা থেকে মোমচেপা মধু করে পরম যত্নে নিংড়ে নিতে চাই মহাশান্তি।

যে শান্তি-শক্তিতে মানুষ হিসেবে পুনরায় দীক্ষিত হয়ে উঠবো– পরম আনন্দে। ওই তো নিভৃত অরণ্য ডাকে– সে আমার পরিণতি। উড়ন্ত বিহঙ্গ ডাকে– সে আমার পরিণতি...

বিহঙ্গ ডাকে দূর নির্জনে... (মরি হায়...)
ডেকে বলে এসো অরণ্যে... (আরে ও...)
নিরিক বান্ধো– বেন্ধে মনে
চলে এসো মায়া ভেঙে (মরি হায়...)
এমন ডাকে কেমনে থাকি
মায়ার পাশে হৃদয় বেঁধে
মায়ার পাশে হৃদয় বেঁধে
তাই তো যাবো অরণ্যে মিশে (আরে ও...)

– অরণ্যে তোমাকে যেতেই হবে?

– হ্যাঁ হ্যাঁ যেতে হবে...

– কিন্তু তুমি তো জানো এই জনবহুল দেশের মানুষজন বনজঙ্গল কেটে সব সাফ করে ফেলেছে, এখন এইদেশে কোথায় পাবে বন আর কোথায় পাবে নির্জনতা...

– পাবো অবশ্যই পাবো... যতদিন না পাবো ততদিন খুঁজতে থাকবো।

– খুঁজতে থাকবো! খুঁজে কি পাওয়া যাবে সেই অরণ্য-নির্জতা?

– অবশ্যই পেতে হবে, আমাকে যে যেতেই হবে নির্জনতায়...

– তাহলে কি তুমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছো?

– না না... এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়...

– তবে কী?

– আচ্ছা বলুন তো কোন সে কারণে হযরত মহম্মদ হেরা গুহার নির্জনতায় কাটিয়ে দিলেন দীর্ঘ পনেরোটি বছর, সিদ্ধার্থ কেনই-বা স্ত্রীপুত্র ছেড়ে চোরের মতো পালিয়ে গেলেন গহীন অরণ্যে আর ঈসা-মুসা এক নাগাড়ে চল্লিশটি দিন কাটিয়ে দিলেন মরুভূমির নির্জনতায় একা একা? তাঁরা কী চিরদিন মনুষ্য সমাজে থেকেই মানুষের জীবন বিধানকে বাত্‌লে দিতে পারতেন না, সে শক্তি কী তাঁদের ছিল না? যদি তাই-ই থাকত তবে কেন তাঁরা অরণ্যে মরুভূমে নির্জনে অতোটি সময় ধ্যানে কাটালেন? তবে কি তাঁরাও মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ছিলেন? আর সেই বিশ্বাস হারানোর সুগভীর বেদনা ভুলতে ডুব দিয়েছিলেন অরণ্য-গুহায় অথবা নির্জনতায়?

– তাঁরা তো সব মহামানব...

– বিশ্বাস করুন– আমি দাবি করছি না আমি মহামানব, কিন্তু তাঁদের জন্ম আর বেড়ে ওঠার সাথে আশ্চর্য কিছু মিল আমাকে টেনে হিঁচড়ে নির্জনতার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে... আমি আর থাকতে পারছি না, কোনো বন্ধনই আমাকে আর বেঁধে রাখতে পারছে না...

জন্মকথা

খুব মনে পড়ছে আমি যেন এক অন্ধকার গুহার ভিতর আটকে ছিলাম। গুহা জোড়া ঘুটঘুটে অন্ধকার– কোনোদিন কোনো আলো দেখি নাই। হঠাৎ একদিন—যখন সম্ভবত দৈহিক পূর্ণতা পেয়েছি—ঠিক তখন গুহার মুখে আলোর এক মৃদু আভাস এসে খোলা না খোলা চোখে আমার বিস্ময় এনে দিল—কিছু না ভেবেই মাথা বাড়িয়ে দিই আমি—উহ... দেহের ঠিক মাঝখানে প্রগাঢ় ব্যথার এক টান লাগতেই হাত দুটো নাভিমূলের কাছে জড়ো হয়—মাথা নামিয়ে ব্যথাস্থানে তাকিয়ে দেখি—হাতের মুঠোয় নাভিমূল থেকে বের হওয়া একটি লতা। লতাটি সোজা উপরে উঠে গিয়ে টকটকে লাল একটি জবাফুল ফুটিয়ে দিয়েছে—খুব মন দিয়ে আমি ফুলটিকে দেখি। দেখি ফুলের ওপাশে ঘনলতায় ছাওয়া ছায়াময় একটি বন। দেখি সেই বনই গুহাটিকে শীতল ছায়ার মতো ঘিরে রেখেছে। বনছায়া দেখে এবার আবার ঘাড় ঘুরিয়ে গুহাপথের আলোর দিকে তাকাই। আলোটা বুঝি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে আমি বনছায়া দেখি। পুনরায় ঘাড় ঘুরিয়ে গুহাপথের [illegible]মশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আলোকের দিকে তাকাই। আবার বনছায়া—আবার আলো... । আলো-ছায়া। ছায়া-আলো। আলো... অস্থিরতায় হাতের মুঠোয় ধরা লতাকে হঠাৎ তীব্র এক টান লাগে... সেই টানে ফুলসমেত লতাটি গুহাগাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর আমি হুড়মুড় করে গুহাপথ দিয়ে পিছলে পড়ি চোখ ধাঁধানো আলোয়... এতো আলো কোনোদিন দেখি নাই—ছিলাম অন্ধকার গুহায়—হঠাৎ আলোকে আমি ভয় পেয়ে যাই। তাই চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠি... উঙা উঙা উঙা... । সেই সে কান্না ছাপিয়ে ঠিক তখনই অভিবাদন শুনতে পাই—উলু উলু উলু... আল্লাহ আকবার... আল্লাহু আকবার... ।

আজান শেষ না করেই শেখ কোমর দিশেহারা হয়ে ঢুকে পড়ে আঁতুড় ঘরে। ধাই নবজাতককে উচ্চে তুলে ধরে। নতুনের গাত্রবর্ণ ঝলকে ওঠে। শেখ কোমরের চোখে বাঁধা লাগে—দশাগ্রন্থের মতো তাই হঠাৎ বলে ওঠে—

– কিরে আমেনা, এ তুই কাকে প্রসব করলি। এ যে... স্বয়ং মহম্মদ... মহম্মদ...

মহম্মদ! সহসা ঝিলিক কেটে ওঠে চেতনালোক—'এ কী বললাম আমি!' কিন্তু তাকে আর ভাববার কোনো সুযোগ না দিয়েই বেদনারহিত হয়ে ঝুঁকে পড়ে না আমেনা। তাঁর চোখেও আরেক ধাঁধা—

– হ্যাঁ হ্যাঁ এ আমার মহম্মদ

– ঠিকই কয়ছো গো—এ তুমার মহম্মদ, সারা জীবন খালাস করলাম কিন্তুক এমন সুরত তো দেখি নাই কোনোদিন—রূপের ঝলক দেখো গো তারাবু... তোমার নাতি তোমার বুড়চোখকেও দেওয়ানা করবে।

মা ও ধাইয়ের এমতবাক্যে থতমত খেয়ে শেখ কোমর আঁতুড় ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে।

— আর আমার হলো মহা সর্বনাশ—এক মহা পুরুষের নাম সেঁটে গেল আমার দেহে। মা আমাকে মহম্মদ ভেবে বুকের গাঢ় শালদুধ ভেঙে আঙুলে করে মুখে ধরে। ঝুঁকে পড়ে চুম্বন করে।

হঠাৎ চুম্বনের সাথে জিহ্বাতে তার শিশুর ভেজাদেহের স্বাদ লেগে যায়। সে পুনরায় চুম্বন করে। এবারও নোনা স্বাদ! ... এ কি তবে যুগল মৈথুনের স্বেদস্বাদ, না-কি ঝাউদিয়ার মসজিদের ধূলিস্বাৎ, না-কি দরগাতলার সিন্নিস্বাদ? এইকথা সঠিকভাবে বুঝতে চেয়ে মা আমেনা বারবার চুম্বন করতে থাকে—

— থাম থাম... জানিসনে জালিদেহ বেশি আদর সয় না...

মা যেন তারাবিবির কথায় বোধ ফিরে পায়।

তখন ফুলসমেত লতার মতো নাভিতে ঝুলছে জন্মরজ্জু। এবার সেই নাড়িচ্ছেদ। ধাইমা মোলায়েম সুতায় নাভির নিকটে নাড়িকে বেঁধে কাঁচা বাঁশের সবুজ প্রলেপলাগা একটি ধারালো চোজ দিয়ে দ্রুত এক পোচ (টান) দেন। আহ্...

— আহ্! মাগো এই দেখো তোমার সেই নাড়িছেড়া ধন স্বয়ং মহম্মদ আজো এই নাভিতে হাত রেখে তোমার উপস্থিতি টের পাচ্ছি। এই দেখো তোমার কথা মনে হতেই এই হাত দুটো কোন অচেতনে যেন নাভিতে এসে জড়ো হচ্ছে। মা... মা—শুনেছি নাড়ি কাটার পর আমার চোখে কোনো পানি ছিল না—তবু আমর উঙা উঙা কান্না কিছুতেই থামতে চায়নি—যখন থেমেছে তখন আমি ঘুমিয়ে গেছি।

আঁতুড়ঘরে বিদ্যাচর্চা

আসে ছয়াকালের রাত্রি। এই রাত্রি না-কি ভাগ্য লিখনের। লেখন-ফেরেশতারা বুঝি শিশুর শিয়রে বসেই ভাগ্য লিখে থাকেন তা না হলে কি জন্মের আঁতুড়ঘরকে ধুয়ে, মুছে সাফ করে নতুনভাবে সাজানোর প্রথা দেখা দেয়? ঘরের পুবেবেড়ায় লাঙল-জোয়াল রাখা, দক্ষিণের মই, সারা ঘরে আগরের ঘ্রাণ, শিশুর শিয়রে আছে দোয়াত-কলম। এই ঘরে আজ রাতে হারিকেনের মৃদু আলোয় শিশুটি আশ্চর্যভাবে হাত-পা নাড়ে। হঠাৎ তার হাত লেগে উলটে যায় ছিপিখোলা কালির দোয়াত। সবার অগোচরে কালিতে তার ভিজে যায় দেহ-হাত, বিছানা-সিথান। কালিভেজা এইদৃশ্য চোখে পড়লে চমকে ওঠে তারাবিবি—

— এ কী করলি ক' দেখি...

কিন্তু পরক্ষণেই আনন্দ তার বুকে ধরে না—তাই তো মুখ ফুটে উচ্চারণ করে—

— ওরে দেখ দেখ পেটের থেকে বেরিয়েই বিদ্যাচর্চা শুরু করেছে।

তারাবিবির আনন্দে দরজা পেরিয়ে সুনীলের মা ঘরে ঢুকে পড়ে—

— ও বাবা, এমন তো দেখি নাই কোনোদিন... জন্মেই কি কেউ কালিঝুলি মাখে! ও বুড়ি তোমার নাতি দেখছি বিদ্বান হবে গো... উলু উলু...

সুনীলের মার উলুধ্বনির মধ্যে কলসের পানি বাটিতে ঢেলে নরম তেনা ভিজিয়ে তারাবিবি শিশুদেহের কালি মুছতে থাকে—

— দেখো তো দেখি... কালি মা'খে কী করল। এখন কি এই কালি মুছা যায়? তার উপর আবার জালিদেহ... বেশিক্ষণ পানি ঠাণ্ডা লেগে যাবে না? ... ওই মহম্মদ বিদ্যাচর্চা আর সময় পেলি না!

— থাক না থাক... আর মুছা লাগবি নানে।

— থাক ক'লিই হল। কালি না মুছলি ছেলে কালো হ'য়া যাবি না।

— না গো না সে ভয় করো না, নাতির তোমর আগুনে দেহ... আগুন কি কোনোদিন কয়লার কালো রং কালো রাখে? দেখে নিও ও সব কিছু আগুনের মতোই রাঙিয়ে দেবে...

তবু তারাবিবি তার গাও মোছে, বিছানা বদলে দেয়। তার মধ্যে শিশুর ক্ষণেক কান্না মিশে যায়।

কামান ও মাতৃবিয়োগ

সাত দিনের প্রথম কামানে পুননু নাপিত আঁতুড়ে মাথা কামিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, চাল-ডাল ভেট নিয়ে চলে যায়। আর মহম্মদের মাথাচাছা জন্মচুল টুপলা করে ঝোলানো হয় আঁতুড়ঘরের চালে। টেকো মাথায় এবার যেন আলো ঝলকে ওঠে। একেতো ফর্সা রং তার ওপর টেকো মাথা, আলোর ওপর আলো জ্বললে—যা হয় আর কি। কিন্তু মহম্মদের অঙ্গরঙের আলো বড়ই মায়ামাখা—তার দিকে চেয়ে থাকতে কোনো বাঁধা নাই।

কামানের সকল আয়োজনের মধ্যেই মা আমেনার দেহ কেঁপে ওঠে। খিচুনিতে দুপুর থেকে সন্ধ্যা যেতে যেতে অস্থির হয়ে ওঠে। দেহে প্রবল জ্বর প্রবাহিত হয়। বৈদ্যনাথ ডাক্তার তার শান্ত নিরীক্ষণের মধ্যে সমাধান খুঁজে পেতে চায়। ফলে ▯মাগত রাত গভীর হতে থাকে। যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে মা আমেনা গড়াগড়ি খায়—আকাশ—পাতাল ভেঙে সে যেন কোথায় মিলিয়ে যাবার কথা ভাবে—'মা মা গো আর পারি না এই দেখো আমার বুক কোশে আসছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মা... ও মা... আমি যে মরে যাচ্ছি আমার মহম্মদের কি হবে মা।'

— চুপ কর, অমন কু-কথা মুখে আনিস না... ও সুনীলের মা এখন আমি করি কও দেখি— দেখো কিছুতেই যে বুঝ মানছে না।

— অমন করে না আমেনা—মনটারে ইট্টু শক্ত কর—সব ঠিক হ'য়া যাবি...

— না না..আমি আর পারছি না... আমার মহম্মদ কই? শেষবারের মতো ওরে ইট্টু দেখতি দাও না... দোহাই তোমাদের গায়ে পড়ি...

— শান্ত হ' সুস্থ হয়ে উঠলি কত দেখবি

– না না আমি মরে যাচ্ছি তোমরা বুঝতি পারছো না—আমি বুঝতি পারছি—ও মা... মা... কই মহম্মদ... কই...

– ও তারাবু—ও অস্থির হয়া যাচ্ছে—মহম্মদের ইট্টু আনতি কও

– হ' হ' কচ্চি—ও সাকেরা মহম্মদের নিয়ে আয়

সাকেরা মহম্মদকে নিয়ে এলে যন্ত্রণা ঠেলে মা আমেনা একবার কোলে তুলে নেয়—পেরক্ষণে তারাবিবির কোলে সপে দিয়ে আবার কাতরে ওঠে—

– মা গো আমি গেলাম, আমাকে তুমি মানুষ করেছো—আমার মহম্মদকেও তুমি মানুষ ক'রো... আহা... উহ... মা গো... মা...

যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে, বারবার গড়াগড়ি দিয়ে একসময় গভীর রাতকে চমকে দিয়ে মা আমেনার মৃত্যু হয়। কোথাও দূর আকাশে তখন কি কোনো নতুন তারা ফুটে উঠল? কেননা পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হলো একটি মাতৃতারকা। সারা গৃহের নীরবতার কুঁই কুঁই করে তারাবিবি কাঁদে। বাকি সবাই রুদ্ধবাক—কান্না তাদের বকের খোঁড়লের অন্ধকারে নিঃশব্দে খাবি খেকে থাকে—বেরিয়ে আসার পথ পায় না—পৃথিবীতে এমন কেন হয়? কেন সদ্যোজাত শিশুরা মাতৃহারা হয়?

দিন গড়িয়ে যায়, তারাবিবি মাঝে মাঝেই মহম্মদকে কোলে নিয়ে আমতলায় বসে কাঁদে। তার নীরব কান্নার মর্মার্থ মহম্মদ কি বোঝে? সে কথা না ভেবেই তারাবিবি মাতৃহারা শিশুর বেদনায় এবং নিজের আগে নিজের কন্যা মৃত্যুর দুঃখে এক নাগাড়ে চোখের পানি-নাকের পানি আঁচলে মোছে, যাতে কান্নাজল শিশুর কপালে না পড়ে—কেননা একে তো তার দুঃখী কপাল, তার ওপর যদি আবর কান্নাজল কপালে পড়ে—তাহলে তার দুঃখ আরও বেড়ে যেতে পারে। আজ সকাল হতে তারাবিবি মহম্মদের দুঃখে কেঁদে যাচ্ছে—এখন দুপুর প্রায়—তবু তার চোখের পানি বাঁধ মানে না—তোর একটিই কথা—মাতৃস্তনবিনা মহম্মদকে বাঁচাবো কীভাবে?

তবে শোনো তারাবিবি, বুদ্ধদেবের নাম তো শুনেছো? তার জন্মের ঠিক সাতদিন পরে মা মহামায়ার মৃত্যু হয়েছিল—তাই বলে কী সেই বুদ্ধ বাঁচে নাই? কৃষ্ণ-মুসা তো জন্মের রাত্রেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাদের মা থেকে। আর হযরত মহম্মদ সে কি তার আপন মায়ের দুধে বেড়েছে? সে তো বেড়েছে অন্য এক মা হালিমার দুধে। মাতৃবক্ষ ছাড়া তারা কি বাঁচে নাই? তবে কান্না কেন? এবার চোখ মোছ। শিশু মহম্মদের দৃষ্টি সীমার একটি বর্ণিল প্রজাপতি ওড়ে, তার দিকে তাকিয়ে শিশুটি প্রথমে স্থির, যেন-বা সে বিস্মিত। কিন্তু পরক্ষণেই প্রজাপতির উড়ন ভঙ্গিমা, বর্ণিল পেখম এবং উড় উড় লুকোচুরি মশ তাকে আন্দোলিত করে। ঈষৎ হাত-পা তুলে—ওষ্ঠ বাঁকিয়ে সে তাই আনন্দ প্রকাশ করেছে। এই প্রথম মহামতী তারাবিবি শিশুটির আনন্দে মৃদু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে উদ্ভাসন সারা গৃহে ছড়িয়ে দেবার আগেই সংশয়ে থেমে যায়—সত্যি সত্যি মহম্মদকে কি বাঁচানো সম্ভব?'

দুধমাতা ও দুধবোন সংবাদ

মহম্মদকে খুব বেশি দিন রুজান দুধ খেতে হলো না। তার জন্মের মাত্র আঠারো দিন পর মা আমেনার বছর বিয়ানী বুধুগাভী মুঙলার জন্ম দেয়। মহম্মদ এখস সেই বুধুর স্তন পান করে। মুঙলার দুধপান শেষে বুধুর পালান যেন মহম্মদের জন্যেই ফুলে ওঠে। শেখ কোমর মহম্মদকে কোলে তুলে নিয়ে পালানে ধরতেই মোলায়েম বান (স্তনবোটা) মুখে ভরে চুষতে থাকে। বুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আর চুকচুক করে মহম্মদ বান চোষে। কোনো কোনো দিন স্তন পান শেষে শেখ কোমর নাতিকে বুধুর দিকে এগিয়ে দেয়—বুধু এতে শরীরের ঘ্রাণ নেয় এবং আদর করে ধারালো জিহবাতে একটুখানি চেটে দেয়, সাথে সাথে শিহরণে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

গোহালটা বাড়ির ভিতরে বলে ঘরের বারান্দা থেকে চোখে পড়ে বারান্দাতে মহম্মদকে শুইয়ে দিলে বুধু গোহাল থেকেই তার দিকে চেয়ে থাকে। মুঙলাও মাঝে মধ্যে তিড়িবিড়িঙ লাফিয়ে বারান্দার পাশে এসে উঁচু হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয়। আর শিশু মহম্মদও যেন তার মুখে হাত বুলিয়ে দেয়। এইসব দেখে প্রতিবেশীদের আনন্দ হয়—

– ওরে বাপ্‌রে! এর মধ্যে দেখছি ভাই-বোনের বেশ ভাব হয়ে গেছে।

– আরে দেখো দেখো, ওই যে বুধুও কেমন ঠারে তাকিয়ে রয়েছে...

– তাই তো, ও মহম্মদ, ওই যে তোমার দুধমা ডাকে... যাও বাছা উঠে যাও, আমরা একটু দেখি দুধমার জন্যে তোর কেমন দরদ...

– যাবার ক্ষমতা থাকলি মনে হচ্ছে কখন ছুটে যা'তো

– ও মুঙলা তোর হিংসে হয় না... তোর মায়ের দুধে ভাগ বসায়?

মুঙলা লাফিয়ে উঠে সকলকে ঢুস মারার বঙ্গি করে পালিয়ে যায়। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে—

– দেখলি রে মহম্মদ, তোর জন্যি তারে বোনের কত দরদ।

– ইট্টু খানি কটু কথাও সহ্য করতি পারল না। যেই-না হিংসের কথা বলা... অমনি ঢুস... হা হা হা...।

দিন মাসের ধীর গতিকে অতিম করে যায় শিশু মহম্মদ। কেটে যায় তিন মাস।

ধূলি উৎসব থেকে পলায়ন

চারি পাঁচ মাস গেল ছয় পরবেশ।
অন্ন প্রাশন কৈল দিআ ছাগ-মেষ ॥
সাত আট মাস গেল হইল নয় মান।
মুকুতা জিনিঙা দুই দশন প্রকাশ ॥
দশ মাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।
ধরিতে ধরিতে ধায়া বাকুড়ি বাকুড়ি ॥
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর।

বাড়ি বাড়ি ফিরে বালা নাহি বাসে ডর ॥
দুই তিন সমা গেল শিশুগণ মেলে।
পঞ্চম বরষে তারা দল বেঁধে খেলে ॥

হই হই। হই হই। ধূলির উৎসবে তারা চক্র হয়ে ঘোরে। চক্রকেন্দ্রে ঘূর্ণিত হয় মহম্মদ। বাহবিধ মুদ্রাযেগে তাদের এই ঘূর্ণনক্রিয়ায় ধূলি উড়ে ধোয়াশা রচনা করে। আর তারা পায়ে ছন্দ তুলে দুই হাতে তালে তালে ধূলি উড়াতে থাকে। জয় হোক এই ধূলি শিশুদের—কেননা, তারা জেনে হোক, না জেনে হোক পথিকজনের পদধূলিকে হাতে তুলেছে, অঙ্গে মেখেছে, মাথার নিয়েছে—

পথের ধূলি পথিক জনের পায়ের ধূলি হলে।
গুরুর চরণ কর শরণ পদধূলি বলে ॥
সেই ধূলিতে ধূসর হয়ে খেলছে কাদের ছেলে।
তাদের দেখে ইচ্ছে যে হয় যাই মিশে তার দলে ॥
হই হই। হই হই। হই হই।

– আরে ও ধূলির রাজন, তুই কোথাকার ধূলি?

– দুনিয়ার।

– দুনিয়ার! তাহলি ঠিক করে ক—এই দুনিয়ায় তোর বাস কোথা?

– মৃত্তিকায়।

– মৃত্তিকায়!

– হ' হ', মৃত্তিকা মানে মাটি—এই দেখো আমার শারীর কেবলই মাটিময়... দেখো দেখো পায়ের নিচ থেকে দুই মুঠো ধূলি তুলে মহম্মদ সকলকে দেখায়। সকলে সেই ধূলি দেখতে তার হাতের দিকে ঝুঁকে পড়তেই মহম্মদ তা ঊর্ধ্বে ছুড়ে মারে। সাথে সাথে সবার চোখে ধূলির ধাঁধা লাগে। এই সুযোগে কেন্দ্র ভেঙে দৌড় দেয় মহম্মদ। সাথীরা তার ধূলির ধাঁধার মধ্যেও চোখ মুছতে মুছতে পিছু ছোটে। কিন্তু তার নাগাল পায় না।

প্রথম বনগমনের কারণ

ছুটতে ছুটতে মহম্মদ এক রক্তাক্ত ঘুঘুর ছটফটানির সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। অকৃত্রিম সহানুভূতির ঘেরে ঘুঘুটিকে সে হাতে তুলে নেয়। যত সহানুভূতিতেই ঘুঘুটিকে সে হাতে তুলে নিক না কেন—ঘুঘুটি যে মানবশিশুর হাতে পড়ে আরও বিপন্ন বোধ করে। আতঙ্কে যন্ত্রণা ভুলে উড়াল দিতে চায়—মহম্মদ তার মনোভাব ঝুকে ঝুকে চেপে সান্ত্বনা দিতে থাকে—

– ওরে তোর আর ভয় নেই, আমি তোকে মারবো না, ভয় পাসনে... আমি তোকে সুস্থ করে তুলবো...

– দে দে তোকে আর সুস্থ করতে হবে না

– কে? ও দেবু... তুই একে মেরেছিস?

– হ্যাঁ, তুই ধরে খুব ভালো করেছিস—না হলে হয়তো উড়ে যেত... এখন দে দেখি

– না আমি দেবো না।

– দিবি না? কেন দিবি না?

– কারণ, এ আমার, আমি এক কুড়িয়ে পেয়েছি...

– অ্যা—আমার, আমি কুড়িয়ে পেয়েছি—এই ঘুঘু কি বটফল যে কুড়িয়ে পাওয়া যায়—দে বলছি, ওকে এই গুলতি দিয়ে মেরেছি—আমার ঘুঘু আমাকে দিয়ে দে—।

– না না আমি দেবো না গুলতিতে মেরেছিস বলেই এ ঘুঘু তোর হতে পারে না... ওকে সুস্থ করে আমি ছেড়ে দেবো...

– দিবি না তাহলে...

– না।

– ওই শালার পরগাছা দিবি না... তোর বাপ দেবে...

অনেক চেষ্টা করেও মহম্মদের দয়াভেজা হাত থেকে দেবু কিছুতেই সেই ঘুঘুকে দখলে নিতে পারে না। ব্যর্থতায় দেবু এবার আক্রমণে তৎপর হয়ে ওঠে। গুলতিডাটি দিয়ে সে মহম্মদকে আঘাত করতে থাকে। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় মহম্মদের শরীর—তবু সে ঘুঘুটিকে মমতায় তাছাড়া করে না। হঠাৎ গুলতিডাটির একটি বাড়ি এসে মহম্মদের মাথায় এসে লাগে—সাথে সাথে চিক করে ওঠে তার চেতনা। একই স্থানে আরেকটি বাড়ি—এবার তার হাত ফসকে ঘুঘুটি উড়াল দেয় বিক্ষিপ্ত গতিতে। ঘুঘুটি উড়ে যেতেই দাঁতে দাঁতে দাঁদ চেপে দেবু আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—

- তোর জন্যে... আমার... ঘুঘ উড়ে গেল... তোমে আমি ছাড়বো না ছাড়বো নারে পরগাছা... দেবুর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আর পূর্ববর্তী আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় মহম্মদও এবার আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা পরস্পর রাগে-ক্ষোভে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে, একে অপরের পায়ের ওপর... এই যাত্রায় যতটা না তারা এক অপরকে আঘাত করতে পারে—তারও অধিক তারা আঘাত করার ভঙ্গি করে... যেইভাবে একই পাড়ার দুইটি বিড়ালের মধ্যে যুদ্ধ চলে... অবিরাম। তারা একে অপকে আঘাত করে কম, ভঙ্গি করে বেশি—যেন এই যুদ্ধ তাদের কাছে নিছক অভিমান-রাগ ভাঙার অপূর্ব এক প্রক্রিয়ামাত্র। কিন্তু না মহম্মদ এক পর্যায়ে একটু বেশি সুবিধা পেয়ে যায়—সে দেবুকে নিচে চেপে ধরে নাকে-মুখে ঘুষি মারতে থাকে। মুহূর্তে সে হয়ে ওঠে অন্য এক মহম্মদ যে মহম্মদ বোধলুপ্ত আক্রমণ সিদ্ধহস্ত। দাঁত চেপে সে দেবুকে দীর্ঘক্ষণ মেরে চলে। অবশেষে দেবুর নিষ্ক্রিয়তায় বোধ ফিরে এলে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে পালাতে থাকে। গ্রামের উত্তরদিকের রাস্তা ধরে নদী পার হয়ে যায় আর পাটক্ষেতের ভিতর দিয়ে সে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে সে মণ্ডলের বাঁশবনের অন্ধকার পথ দিয়ে পৌঁছে যায় বিশ্বাসের বাগানে। এই বাগানের মাটিতে সূর্যের আলোকরশ্মি পৌঁছ কুব কমই। গাছে গাছে গাছের মাথার অদৃশ্য হয়ে আছে এ বাগানের আলোর

আকাশ। অন্য সময় হলে কারো সঙ্গেও সে এখানে আসতে ভয় পেত। অথচ আজ সে একাই ভীত হয়ে ভয়ানক এই জায়গায় এসে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। ছুটে আসতে সে একটুও ভয় পায় নাই। হঠাৎ তার গাওটা ছমছম করে উঠে। এই কি সেই গর্ভগুহার বনছায়া। কিন্তু এখন কিভাবে এই বনছায়ার গুহা থেকে বেরুবে সে। ভাবনায় ভিতর কোথায় যেন সেই ঘুঘুটি ডেকে উঠে—ঘুঘু ঘুঘু... ঘুঘু ঘুঘু... মহম্মদের বুকের ভিতরটা ওই ডাকে কেঁপে উঠেছে... সে চারদিকে ঘুরে ফিরে তাকায় এই অরণ্যের আকাশে মাটিতে কোথাও তার চোখ যেতে পারে না। সে তাহলে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটি গাছে হেলান দিয়ে সে নির্ভরতা পেতে চায়। তার পিঠের ঠিক নিচে মৃদু মচমচ করে একটি কুশি গুঁড়িয়ে যায়। সে পিঠ সরিয়ে দেখতে পায়—গাছের শরীর বেয়ে কস ঝরে পড়ছে... এই কস, কান্না না রক্ত? হঠাৎ এইবোধ তাকে ওলট পালট করে দেয়। সে কেন হেলান দিয়ে দাঁড়াতে গেল। কেন সে দেবুকে ওইভাবে আঘাত করে নিষ্ক্রিয় করে পালিয়ে এলো— কেন? গাছের কসঝরা দৃশ্য তো আগে সে কতই দেখেছে... কিন্তু এইবোধ আগে তো কখনো মাথা চাড়া দিয়ে ওফে নাই। তবে এও ঠিক—আগে তো কখনো এমন অরণ্যে আসে নাই। তার চোখ থমকে যায়—আলো না পাওয়া রোগা এক জিকাগাছের থকথকে আঠার উপর—এ কি তবে জিকাগাছের আমতা ক্ষতরোগ। দেবু আর গাছের বেদনায় মনের কোথায় যেন করুণ এক সুর বেজে ওঠে... বিশ্বাসের বনে সেই সুর অন্যরকম এক আবহ সৃষ্টি করে... মহম্মদ সেই সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে দেয়—

কাটছো গেছো খেঁজুর গাছ
কলসি ভরে মধুর রস
নিচ্ছ শুষে গাছে থেকে
গাছের জ্বালা বুঝলে না যে
গাছ নিরবে রোদন করে
তার জ্বালা কি বুঝতে পারো?

পরগাছা শব্দটির সামাজিক অর্থ

গাছ, গেছো শব্দ দুটির অর্থ তার কাছে যতটা পরিচিত ঠেকে। গাছা-পরগাছা শব্দটি যেন তার কাছে ততটাই অপরিচিত ঠেকে। এই শব্দটিকে দেবু তার ক্ষেত্রে গালি হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু কেন? এর আগেও দুই একবার এই শব্দটি তাকে শুনতে হয়েছে তবুও শব্দটির অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে নাই। দেবুর গালিটা শব্দটার মধ্যে যেন কোনো এক না-জানা অর্থের ইঙ্গিত করে। এই শব্দের অর্থ সে কোথায় জানতে পারে? সে অস্থির হয়ে ওঠে... না না কোথাও নয়... একমাত্র তারাবিবি তার সকল নির্ভরতা। সে তার দিকে চুটে যায়—অর্থের খোঁজে।

— বল মা—পরগাছা কী?

— পরগাছা! কেন?

— প্রশ্ন করো না মা—আমাকে উত্তর দাও—পরগাছা কী? সকলে কেন আমাকে পরগাছা বলে গালি দেয়—তা আমি বুঝতে চাই...

— ও কিছু না... ওসব কথা তুই মনে নিবি না...

— এভাবে এড়িয়ে যেতে চাইছো কেন? তোমাকে আজ বলতেই হবে—পরগাছা কী?

— বললাম তো কিছু না।

— না না, আমার মনে হচ্ছে তুমি লুকাতে চাচ্ছো...

— নারে পাগল না, তোর কাছে লুকাবো কী? ... তবে শোন, যে যা-ই বলুক—তুই জেনে রাখ—তুই পরগাছা নয়—তুই আমাদেরই সন্তান।

— তোমাদের সন্তান! মা, আমার কেমন যেন লাগছে... এতদিন তো আমাকে নিয়ে তোমাদের এমন দাবি করতে শুনিনি... আমি তোমাদের সন্তান—। আজ কেন করছো? তবে কি আমি তোমাদের সন্তান নই... ?

— না ...

— তাহলে?

— আমি আসলে তোর নানী, তোর মা আমারই এই পেটের মেয়ে—। আকাশ ছাওয়া জোসনার ভিতর আমেনার কোলে তোর জন্ম হলো। অথচ তোর জন্মের ঠিক সাতদিন পর আমেনা আমার মারা গেলো...

— আমেনা আমার মা—আমার মা মারা গেছে... কিন্তু বাবা?

— তার কথা আবার শোনার দরকার কী?

— কেন? যে আমার পিতা তাকে আমি জানবো না?

— সে তোর মায়ের মুত্যুর পরপরই বিয়ে করেছে...

— বিয়ে করেছে... !

— হ্যাঁ হ্যাঁ বিয়ে করেছে।

— তবু সে আমার বাবা, তাকে আমি জানতে চাই।

— জেনে কোনো লাভ নাই, তোর জন্যে তার বুকে কোনোদিন কোনো মায়ার দেখা মেলে নাই...

— এ কি বলছে তুমি... এ কি সত্যি?

— হ্যাঁ সত্যি... মায়া থাকলে তোর মতো এমন চাঁদ মুখ ছেলেকে কেউ এক বেলা না দেখে থাকতে পারে? আমরা তো পারি না... কই তোর জন্মের পর, তোর মায়ের মৃত্যুর পর তোর বাবা তোকে তো দেখতে এলো না... আজও আসেনি... মা মরা ছেলেটা বেঁচে থাকল কি মরে গেল সে খোঁজও সে কোনোদিন নিয়েছে কি-না সন্দেহ... নিলে কি এত বছরের মধ্যে একবার এসে তোকে দেখে যেতে পারত না... ?

— এই কথাটির উত্তর আমি তার মুখ থেকে শুনতে চাই...

— না, তুই তার কাছে যেতে পারবি না...

– কেন?

– এমনি, আমি বলছি তুই যাবি না

– না না—এই আদেশ করো না... আমি আমার পিতাকে বুঝতে চাই—আমাকে তোমরা বাধা দিও না—অবশ্য দিয়েও কোনো লাভ নাই—আমি তার কাছে যাবোই—

– তবে কি তোর কাছে—আমাদের ভালোবাসার কোনোই মূল্য নাই।

– ওই কথা কেন বলছো?

– কেন বলবো না—এতদিন তোকে মানুষ করে তুললাম অথচ আজ তুই আমাদেরই অবাধ্য হয়েছে—তোর পিতার কাছে যেতে চাচ্ছিস... যা না? যা... আমাদের ভাঙা নিয়তি নিয়েই বেঁচে থাকবো...

– চলে গেলে মা... না, আজ হঠাৎ মা বলতে আমার মুখে এমন বাঁধল কেন? এ কোন পরীক্ষার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি—যাদেরকে এতদিন মা-মামা বলে এসেছি—তারা আমার আপনজন হয়েও দেখছি আমার আসল বাবা-মা নয়, বাবা থেকেও আমাকে গ্রহণ করেননি বলে—আমাকে ওরা 'পরগাছা' বলে। হায় ঈশ্বর! পৃথিবীতে আমার মা কেন নাই—আর বাবা থেকেও কেন নাই। এই তো আমার এতদিনের মা—আসলে আমার মাতামহী (নানী) বলে গেলেন—আমার প্রতি আমার বাবার কোনো মায়া নাই—আমি বললাম অবশ্যই আছে। কিন্তু কেন বললাম? তিনি আমার ওপর অভিমান করে চলে গেলেন। আমি তাকে বোঝাতে পারলাম না। বৃক্ষের মমতাকে যেমন চোখে দেখে অনুমান করা যায় না—মনে হয় মুক বৃক্ষটার দেহে কোনো মমতা নাই, ভালোবাসা নাই, যন্ত্রণা নাই—তার কোনো ভাষা নাই বলেই হয়তো আমন মনে হয়। কিন্তু আমি সেই বৃক্ষের ভালোবাসা, মমতা যন্ত্রণাকে বুঝেছি—কিছু কিছু মানুষ আছে হয়তো বৃক্ষের মতো—তাদের সাধ্য নাই নড়ন-চড়ন বা অনুভূতি প্রকাশের, কিন্তু এই বৃক্ষদের পাতা ছেঁড়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটালে—তাদেরও বুক ফুটে মায়া-ভালোবাসা-কষ্ট হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে পারে। আমার বাবাকে আমি শেষ পর্যন্ত বুঝে দেখতে চাই—কিন্তু আমার এই মনের কথা কে বুঝবে—কেউ না, কেউ না? আমার নানীর মতো সবাই হয়তো আমাকে ধিক্কার দেবে... দিক। তবু আমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে চাই না...

পিতৃদর্শনে মুসলমানিপর্ব

সন্ধ্যা লাগার আগে
আমি যাচ্ছি বাবার কাছে
বাবা আমার বৃক্ষ
বুকে কি তার ভাষা নাই?
আমি মাতৃহারা
বাবা আমার বৃক্ষ

আজো তার দেখা পাই নাই।
আমি যাচ্ছি বাবা কাছে
তার অনন্তরে মায়া
আর বৃক্ষ ছায়া
দেখে নেবো, পাই কি-না পাই।

বুক জোড়া অদৃশ্য ক্ষত নিয়ে পিতার প্রতি অসীম আগ্রহে মহম্মদ ছুটে চলছে বসন্তপুর গ্রামে। পথের মাঝে আব্দালপুরে এসে একটি মুসলমানির দৃশ্যে ফিরে যায় নিজের মুসলমানিতে। তাদের বাড়িতে গায়েনের দল নিয়ে হাজাম এলে হুল্লোড় পড়ে যায়। প্রতিবেশীরা রান্নাঘরের হাটনেয় (বারান্দায়) বসে গীত করে—

এতদিনে আয়ছো রে হাজাম তারাবিবির বাড়িতে।
এখন কোনো রয়ছো বসে কুটুম হয়ে পিড়েতে ॥ (ও কি না রে)
ওঠো গো হাজাম সোনারচান ছেলেরে করো মুসলমান।
কোঁচ ভরে দেবো ধান মুখ ভরে দেবো পান। (ও কি না রে...)
এতদিনে খেলতে রে, মহম্মদ দুলোমাটির মাঝেতে।
আজকে খেলা খেলবা কি—তুমি তারাবিবির কিছানাতে। (ও কি না রে...)

প্রতিবেশীদের গীত শেষে ধোয়া-মোছা মহম্মদকে আসরের মধ্যে বসিয়ে হাজাম তার সঙ্গীদের নিয়ে গান করে—বাজে হারমোনিয়াম, মন্দিরা, ঢোল।

ওকি বল হে, আল্লা-নবিজির নাম
একদিন দুনিয়াদারি হবে অবসান।
চান-সুরুজ-গ্রহ-তারা, ডাকিয়া পাগল পারা
তার নাম। ও কি বল হে, আল্লা-নবিজির নাম।
নবি না চেনে যারা
এ দুনিয়ার অধম তারা
তাদের কেউ নাই— হয়ে যাও সাবধান।
এ দুনিয়ার সকল মুসলমান
সকলে সবার আপন।
ও কি বল হে, আল্লা-নবিজির নাম ॥

গানের সুর-তালের ইন্দ্রজালে মহম্মদ ভুলেই গিয়েছিল মুসলমানির কথা। কিন্তু গান থেমে যেতেই কে একজন তার প্যান্ট খুলে একছত্র সাদা সুতিকাপড় পরিয়ে দিতে গেলে চমকে ওঠে। অনেকের ভিড়ের মধ্যেই সে ভীত হয়ে ওঠে। তারাবিবি, শেখ কোমর কেউই তাকে প্রবোধ দিতে পারে না। এবার তাই ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটতে থাকে। অপেক্ষাকৃত নিচু একটি পিঁড়িতে তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়। বসবার সাথে সাথে হাজাম তার হাতদুটি ভাঁজের মধ্যে দিয়ে কাঁধ বরাবর তুলে ধরে পিছনে দাঁড়ানো সুলতানের

হাতে দেয়। সুলতান নিজের হাতে সেই হাতদুটি চেপে টেনে ধরে। ফলে মহম্মদের নড়ন ক্ষমতা হারিয়ে যায়। আক্কাস সুলতানেরও পিছন থেকে দুইটি পানপাতা দিয়ে মহম্মদের চোখ দুটি ঢেকে দেয়। হাজাম এই সময়ে দ্রুত বেগে তার কালো রঙের থলি থেকে ধারালো চকচকে একটি ছুরি, বাঁশের মসৃণ এবং চটাসহ ছাই বের করে। দুটি ত্বকের গভীরে ঘুরিয়ে ফুল ফোটায়।

— এই যে দেখো সবাই কদমফুল ফুটে গেল... মহম্মদ, কোনো ব্যথা লেগেছে? কও কও...

— না

— একটুও না?

— একটু লেগেছে

— এইবার আর লাগবে না

অকস্মাৎ চটা দিয়ে ত্বকের শীর্ষভাগ টেনে চেপে ধরে। মহম্মদ ব্যথা পেয়ে কেঁদে ওঠে। কিন্তু হাজাম সে ব্যথা প্রকাশের কোনো সুযোগ না দিয়ে দ্রুত গতিতে কথা বলতে থাকে। তার কথার সাথে সাথে মহম্মদও কথা বলতে বাধ্য হয়ে ওঠে—

— কও—লা-ইলাহা ইল্লাললাহু মুহম্মাদুর রাসূলইল্লাহ।

— লা ইলাহা ইল্লাললাহু...

তৃতীয় বাবের মতো কলেমা শেষ না হতেই দ্রুততায় হাজামের ছুরিতে টান পড়ে। 'মা গো'—মহম্মদ তীব্র চিৎকার দিয়ে ওঠে। যন্ত্রণায় তার দেহের ভিতরটাও এসময় লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু সুলতান মামার চাপা হাতের নিচে সে যেন পিসে যায়—তার শ্বাস-প্রশ্বাস, কণ্ঠস্বর সব কিছু বন্ধ হয়ে যেতে চায়। দাঁতে দাঁত চেপেও এই যন্ত্রণাকে সে সহ্য করতে পারে না। হাজাম কাটা ত্বকের মাথায় ছাই মাখিয়ে কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করে দ্রুত কয়েকটি ফু'তে রক্তভেজা ছাই ছাড়া বাকি ছাই উড়ে যায়। এবার হাজাম তাকে বিছানায় নিয়ে শুয়ে দিতে বললে—সুলতানের হাত ঢিলা হয়। সাথে সাথে মহম্মদ লাফিয়ে উঠে দেয় দৌড়... দৌড়ের সাথে রক্তপাতে তার ঊরুদেশ, হাঁটু, ঠ্যাঙ লাল হয়ে যায়। সেদিকে তার লক্ষ নাই—সে ছুটে চলে... ছুটে চলছে পিতার দিকে। কিন্তু আজ তার রক্তপাত কচি শিশ্নের ত্বক কর্তনের চেয়েও বেশি কষ্টকর। কেননা, এই রক্তপাতে তার সমস্ত চেতনায় বারবার বিদ্যুৎ ক্ষরণ হচ্ছে... আর সেসব কিছু উপেক্ষা করে ছুটে চলেছে পিতার দিকে। তার মনে বাজছে একই কথা 'বাবা, বাবা, কোথায় তুমি?'

— কে তুমি?

— আমি মহম্মদ। আমি আমার বাবাকে দেখতে এসেছি...

— কে তোমার বাবা?

— মোসলেম উদ্দিন...

— সে তো এই গ্রামে থাকে না, থাকে সেই পাঁচপাকে...

পিতার খোঁজে সৎমায়ের সাক্ষাৎ

পাঁচপাকে বা পঞ্চপাখিয়া কত দূর। সে আবার ছুটতে থাকে... খুঁজে খুঁজে বের করে মোসলেম উদ্দিনের বাড়ি। বাড়ির একমাত্র নারীমূর্তি এগিয়ে এসে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—

— কাকে যেন খুঁজছো—মনে হচ্ছে...

— হ্যাঁ খুঁজছি আমার বাবাকে...

— কে তোমার বাবা?

— মোসলেম উদ্দিন।

— এ কী বলছো তুমি? সে তোমার বাবা হবে কেন?

— যে কথা বুঝতে আমার আঠারো বছর সময় লাগল—সে কথা হঠাৎ আজ বুঝবো কীভাবে? তুমি তার চেয়ে বলে দাও আমার বাবা কোথায়?

— সে তোমার বাবা নয়—সে তোমার বাবা হতে পারে না।

— না মোসলেম উদ্দিন আমার বাবা। কিন্তু তুমি?

— আমি বউ... এক হতভাগিনী।

— তুমিই তার স্ত্রী। কিন্তু নিজেকে হতভাগিনী বলছো কেন?

— বিয়ের আঠারো বছরেও যেন নী সন্তান জন্মাতে না পারে সে কিসের ভাগ্যবতী...

— আহ্! আর বলো না—এক নারী সন্তান না পেয়ে নিজেকে হতভাগিনী ভাবে, আরেক নারী সন্তান পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে... মাতৃহারা সন্তান পাড়া প্রতিবেশীর কাছে পরিচিতি পায় 'পরগাছা' রূপে... দেখো আমি সেই 'পরগাছা'—পৃথিবীতে আমর মা নাই—বাবা আছে—কিন্তু আঠারো বছর ধরে আমি তার কথা একবারও শুনিনি... আজ তার কথা শোনামাত্র ছুটে এসেছি তার কাছে। কোথায় আমার বাবা? কোথায়?

পিতা, পুত্র ও সৎমা

ধৈর্যের বাধ ভেঙে যেতে চায়। জন্মদাতা পিতার প্রথম সাক্ষাৎ অপেক্ষার উত্তেজনায় সে অস্থির বোধ করে। আর ওই নারীটিও এক ধাঁধার মধ্যে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে—'একী করে সম্ভব?' 'সে কি সত্যি সত্যি এই ছেলেটির পিতা?' 'না না এ হতে পারে না—না।' এইসব প্রশ্নের মধ্যেও কে যেন তার কানে হঠাৎ বলে যায়—'হলে মন্দ কী, নিঃসন্তান বেদনায় এই সন্তানকে পেলে কোন নারী সুখী হবে না?' নারীটির সমগ্র চেতনা যেন হিম হয়ে আসে। তবুও মোসলেম উদ্দিন বাড়িতে ঢুকতেই সেই প্রথম তার দিকে ছুটে যায়।

— ও গো, তুমি নাকি এই ছেলেটির বাবা?

— কে তুমি?

— তার আগে অস্বীকার করুন—আপনি আমার বাবা নন...

– আমি জানতে চাচ্ছি—তুমি কে? তোথা থেকে এসেছো?

– ও তাহলে—অস্বীকার করতে পারলেন না।

– হেয়ালি রাখো—যা জিজ্ঞেস করছি তাই কও।

– কবো, সব কবো—আগে বলুন কে হেয়ালি রাখবো? আঠারো বছর ধরে—আপনি আমার সাথে হেঁয়ালি করেছেন—আজকে এক মুহূর্তের হেয়ালি আপনার সহ্য হচ্ছে না। বলুন, কেন এই মা মরা ছেলেটার খোঁজ রাখেননি—কেন? সে কি ওই নারীটির কাছে সত্য গোপন রাখার অভিপ্রায়ে—না-কি নিজের ঔরসজাত সন্তানের সাথে প্রতারণা করার জন্যে—বলুন, আমার মা বেঁচে থাকলে আপনি কী আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন? বলুন, চুপ করে আছেন কেন? কথা বলুন, ওইভাবে আমার দিকে শুধু তাকিয়ে থাববেন না।

– শুধু শুধু নয়... তোর মুখের উপর আমি স্পষ্ট এক নারীর মুখ দেখতে পাচ্ছি—জানিস আমেনার ওপর আমার খুব অভিমান হয়েছিল—তাই তাকে আমি দেখতে যাইনি—কেন সে তোকে জন্ম দিয়ে মরে গেল, আমার সন্তানের ওপর তার কী কোনো দায়িত্ব ছিল না? কেন সে দায়িত্বহীনের মতো মরে গেল? কেন?

– আর আপনার দায়িত্বহীনতার জবাব দেবে কে?

– বিশ্বাস কর আমি দায়িত্বহীন থাকতে চাইনি—কখনো কখনো তোর কথা আমার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো—নিজের একটা সন্তান আছে ভাবতাম—আর তোকে, তোর মুখটা একবার দেখবার জন্য প্রাণটা আমার উথালপাথাল করতো—কিন্তু কিভাবে কিভাবে যেন আরেক মায়ায় আটকা পড়লাম—পরিস্থিতি আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করল—

– আর অমনি উপর থেকে আপনার সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল—অ্যা?

– বিয়ের পর তোকে দেখতে যাইনি লজ্জায়... মা মরা ছেলে রেখে যে পিতা বিবাহ করে তার দুঃখ-লজ্জা কে বুঝবে বল—তাই নিজের লজ্জা-দুঃখ নিজের বুকের ভিতর দুমড়ে-মুচড়ে জিয়ে রেখে দিন-মাস-বছর একাকার করে ফেলেছি—আমার দুঃখ কেউ বুঝবে না জেনে—এসব কাউকে কোনোদিন বলিনি—জিজ্ঞেস কর ওই নারীকে—তার সাথে আমার আঠারো বছরের দাম্পত্য জীবন... এই জীবনে একবারও কী ভুল করে এই দুঃখ-লজ্জার কথা তাকে বলেছি আমি... জিজ্ঞেস কর...

– তা আর জিজ্ঞেস করতে হবে না... আমি সব বুঝে গেছি... তোমার তোমার... যে একটি পুত্র সন্তান আছে তা আমাকে এতদিন কেন বলো নাই? এতটা বছর ধরে যে বিশ্বাসে তোমার সংসার করেছি—সে বিশ্বাস আমার শেষ হয়ে গেল... আমি কেন বুঝতে পারিনি—আঠারো বছর ধরে তুমি আমার সাথে প্রতারণা করে গেছো...।

– প্রতারণা ! হ্যাঁ হ্যাঁ প্রতারণা—তুমি ঠিকই বলেছো। জুলেখা—সত্য কখনো কখনো প্রতারণার শরীরে ঘাপটি মেরে বসে থাকে—আমার কাছে যা এক অসহ্য কষ্টকর সত্য, তোমার কাছে তা প্রতারণা—এইকথা তুমি আর ভুলো না জুলেখা... ওই

মুখে তাকাও একবার... এতদিন যা আমরা মনে-প্রাণে চেয়েও পাই নাই—তা আজ কী মনে করে যখন আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে—তা একবার অন্তর বুঝতে চেষ্টা কর...

– আমি কিছু বুঝতে চাইনে—যা বোঝার তুমিই বোঝ...

অভিমানে-ক্ষোভে জুলেখার চোখে জল চলে আসে। তাই সে কান্না নিয়ে ঘরে ঢোকে। মোসলেম প্রসঙ্গ পাল্টে মহম্মদের সাথে কথা বলতে চায়—

– কী বলে যে তোকে ডাকি?

– কেন? নিজের ছেলের নাম জিজ্ঞেস করতে বুঝি লজ্জা করছে?

– তা বলতে পারিস...

– হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো হবার কথা... জগতে কোন পিতা পুত্রের নাম পুত্রের মুখে জানতে চেয়েছে... আপনাকেও আর জানতে চায়তে হবে না—শুনুন—আমার নাম মহম্মদ।

– বাহ্ বেশ, তাইতো হবার কথা—আমেনার ছেলের নাম মহম্মদ...

– শুধু আমেনার ছেলে ! নিজের ছেলেকে নিজের বলতেও বাঁধছে বুঝি?

– তা বাঁধবে কেন? তবে...

– তবে কী, বলুন...

– না কিছু না...

কেউ কিছুই ব্যক্ত করতে পারে না। এই যে 'বাবা বাবা' করে মহম্মদ ছুটে এল। সে বাবার সম্মুখে বাবাকে আর বাবা বলতে পারে না। আবার 'বাবা' ডাকটি শোনবার আকুলতাকে মোসলেম কিছু না কিছু না বলে এড়িয়ে গেলেন। আর জুলেখা।

তিনটি মানুষ আজ তিনটি সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে বিস্ময়, বেদনা, আনন্দ অনুভব করে। তাই বুঝি এক বিন্দুতে মিলিত হতে চেয়েও মিলিত হতে পারে না। তথাপি কোন গোপন ইঙ্গিতে যেন একে অপর থেকে দূরে সরে যেতেও অক্ষম তারা। আহা—এর নাম কী মায়া? সে কি পুত্রের প্রতি পিতার, পিতার প্রতি পুত্রের, না-কি এক মাতৃহারা সন্তানের প্রতি মাতৃত্বপ্রার্থী বঞ্চিত এক নারীর, না-কি আঠারো বছরের সুসুপ্ত সত্যের প্রতি তিনটি মানুষেরই অকৃত্রিম মোহ জন্মেছে?

কখন কী ঘটে তার ইঙ্গিত দেয় না সময়।
পথ হেঁটে যায় অনিশ্চিত
পথের কোথায় বৃষ্টি-অন্ধকার?
সে ইঙ্গিত দেয় না সময়।

কমরেডের আগমন

রাতের আকাশে উড়ে এলো কালো কালো মেঘ। এই রাতটি তাই গাঢ় অন্ধকার। এ অন্ধকারে মিশে যাওয়া টানা ফর্সা পথের আবহ গাছ, গাছ-পালাদের ছোপ ছায়া আর

ঘর-বাড়ির বহুকোণী আকৃতি মেঘে মেঘে টক্কর খাওয়া ঝিলিক বিজলিলতার হঠাৎ আলোয় সপ্রতিভায় প্রকাশ পেতে থাকে। বাঁশ-বন, নারিকেল-সুপারি-সজনে-বরই আতা-জাম্বুরা-কদবেল-কাঁঠাল-লিচু-কৃষ্ণচূড়া-নয়না-অশ্বত্থ আরও কত গাছ-গাছাড়ি আছাড়ি-পাছাড়ি খায় উলটপালট হওয়ায়। আকাশে ঝিলিককাটা আঁকা-বাঁকা রেখার বিজলি আলোয় বারবার এদৃশ্য প্রকাশ পায়। কিন্তু কে এখন কাকে দেখে? কেননা ধূলির সাথে উড়ছে হওয়ায় টুকরাটাকরা বস্তুকণা—তার উপর আবার চোখ ধাঁধানো কিদ্যুৎ স্ফুরণ। চোখে পাতা তাই মুক্ত বা রুদ্ধ রাখা বড়ই কঠিন। মেখে মেঘে রাগী বিড়ালের গোঙানি—হঠাৎ হঠাৎ গুড়ুম-গাড়ুম—। ভুবন চমকে ওঠে তীব্র আলো-শব্দে। এখনই মেঘ ভেঙে পড়বে—আর ঝড়ের সাথে যোগ হবে বৃষ্টি।

কেউ একজন ছুটে আসছে বাড়ির দিকে—'মোসলেম মোসলেম... ।'

– তুজাম ভাই, আসো, ভিতরে আসো।

লোকটি বাড়িতে ঢুকে মাটির সিঁড়িতে পাও রেখে ঘরে উঠতে যেতেই মহম্মদ হারিকেন এগিয়ে ধরে। হারিকেনের মৃদুঢেউ দুজনার মুখই পরস্পরের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লোকটির মুখে মহম্মদের চোখ আটকে যায়। তার মুখটি বয়সের অধিক বয়স্ক। এমন ঝামামুখ সে আগে কখনো দেখে নাই। মুখটি যেন ইটভাটার অধিক আগুনে পোড়া ঝামা—চোখে তার অজস্র রাত্রি জাগরণের লাল আগুন। মহম্মদ চোখ ফেরাতে পারে না। লোকটির চোখ আটকে যায়—মহম্মদের চোখে মুখে... । কি আছে মহম্মদের মুখে? লোকটি দেখে তার মুখখানা কামারখানার আগুনলাগা লোহার মতো টকটকে—সে মুখে আছে প্রগাঢ় কিছু হয়ে উঠর অঙ্গীকার—চোখে সেই অঙ্গীকার... আরও তীব্র—তার তীক্ষ্ণ চাহনিতে লোকটি কেন যেন বিদ্রোহ-প্রতিবাদের সাহসী ভাষা খুঁজে পেয়ে চমকে ওঠে—সে এ কাকে দেখছে? মহম্মদকে পাশ কাটিয়ে সে দ্রুত মোসলেমের ঘরে ঢোকে—।

– ছেলেটা কে?

– কেন?

– পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ো না, ঠিক করে কও—ছেলেটা কে?

– সে যে এক কথায় কওয়া যাবে না...

– এক কথায় কওয়া যাবে না! না গেলে যত কথায় সম্ভব তত কথাই কও ...

– তুজাম ভাই, আজ যদি বাঁজা মোসলেমের বদলে বাবা মোসলেমের কথা কই...?

– ওকে কি তুমি তোমার নিজের সন্তান বলতে চাও?

– বলতে চা'বো কেন—ও তো আমারই সন্তান—মহম্মদ... বুক চাপা পাথর আমার টলতে শুরু করেছে, তুজাম ভাই, আমি আজ মুক্তি চাই...

মোসলেম বা মহম্মদের অতীতকথা

কথা বলতে বলতে আকস্মাৎ অন্তরচোখে মোসলেম তার সুবিস্তৃত পশ্চাত কে দেখতে পায়। যেখানে সে ভূমিজ কৃষক, বিবাহ আসরে বর, বাসর সংসারে স্বামী তারপর আবার কৃষক।

মাঠে মাঠে ছড়িয়ে ছিলাম
এই আমাকে বুঝতো ফসল
হঠাৎ করে সোনার কন্যা
মাঠ থেকে নিল ঘরে।
আমি তাই নতুন চাষের কৃষক হয়েছি।
কন্যার চিকন গড়ন
লম্বা চুল মেঘের বরণ।
আজকে তাকেই বুঝতে পেরেছি।
নতুন চাষের কৃষক হয়েছি।
বুনছি ফসল ঘরে-মাঠে
বাড়ছে ফসল উদরে-প্রান্তরে
এবার ধানে ভরবে গোলা
দোলনাতে লাগবে দোলা।
আশ্বিনে বউ বাপের বাড়ি যায়
ক্ষেতেতে কৃষক নিড়ানী চালায়।
বাড়ছে ফসল মাঠে পেটে
অঘ্রাণে ধান সবাই কাটে।
অঘ্রাণে মার পুত্র প্রসব হয়
এমন করেই জমিন ফসল-চাষীর
মিলতে থাকে আসল পরিচয় ॥

আমি খাঁটি চাষি, আমি বাবা... অঘ্রাণের ফসল কাটার মৌসুমে খবর পেলাম আমেনার ছেলে হয়েছে—আমি বাবা হয়েছি... ভাবলাম ধান কাটা হয়ে যাক... সব গোছ গাছ করে... কিছু কিনাকাটা করে ছেলে দেখতে যাবো... কিন্তক চার-পাঁচ দিনের মাথায় খবর পেলাম আমেনা... আমেনা ছেলে রেখে মরে গেছে... মনে হলো এক মাঠ সবুজ-কচি ফসল জন্মানোর পর মাঠখেন বানে-বর্ষার তলা গেল... ওই ফসল কি আর বাঁচকে! মাঠের আলো-হওয়া রসের পুষ্টি ছাড়া কি ফসল বাঁচে। মনে হলে যে ফসল বাঁচবে না তারে দেখে তার উপরে মায়া জন্মায়ে কি লাভ। আবার মনে হলো—যে ফসল জন্মানোর কষ্ট সইতে না পেরে নিউমোনিয়ায় আমেনা মরে গেল—সেই নিষ্ঠুর ফসল আমি কোনোদিন দেখবো না... দেখবো না..পথে পথে পাগলের মতো ঘুরি আমি—উদাস উদাস ভাব পেয়ে যায় আমারে... আমেনার মাত্র দুই বছরের মায়ার

থেকে তবু আমি বের হতে পারি না... আমার এই রকম দশা দেখে কতজনা কতকথা কয়... কিন্তুক আমি শুনি সবাই যেন একই কথা কয় 'বিয়ে কর মন টালা হবে... বিয়ে করে কাম কাজে মন দে...

– এইসব তুই কোন কাম শুরু করলি ক'তো দেখি... বউ কি আর কারো মরে না... দেখ না এই মকছেদ মিদ্দারে—এক একখেন বউ মরে আর টপাটাক ক্যাম্বা আবার বিয়ে পুষে ফেলে... তুই ক্যা এ্যাম্বা মাগী মানুষের মতো ধুকে ধুকে বেড়াচ্ছিস... তোরে আবার বিয়ে দেবো... বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে...

– থামো...

– থামো ! তুই থামতে পারিসনে... ইট্টু মন টালা করে চাষ কামে হাত দিলি হয়... তা না উদাস উদাস হয়ে ঘরে বেড়াবে আর উচিত কথা ক'লিই ক'বা- 'থামো'... পুব মান্দারে ভূঁই জোড়ো করে সিকান্দার শিকদার ইরি চাষ করবে শুনছি—ওই মান্দারের বড় জমিখেন তোর—ওই জমি চাষ না করে ফেলা রাখলে—সিকান্দারের চোখ পড়লে কি হবে ক'তো দেখি... ।

– ক্যা, আমার জমিতে সিকান্দার চোখ দিবি ক্যা? তুমি আছো না... আমার জমিখেন তুমি চাষো মিয়া ভাই... মন টালা না হওয়া পর্যন্ত চাষো... আমি কোনো ভাগ চাবো না...

– আরে পাগল–কামে হাত না-লাগলি, মন ক্যাম্বা টালা হোরি! কামে হাত দে–সব ঠিক হয়ে যাবে... আমার হাতে দুই পাঁচ জন লোক নাই যে–তোর জমিখেন লাঙল দিই... আমি একা মানুষ আমার জমিতেই কাম করে অসুমোর... উদাস হয়ে না-ঘুরে বেড়ায়ে কালকের তে কামে লাগে যা... মন কখন এমনটি হয়ে যাবে... কিচ্ছু বুঝতে পারবি না... যাই ওইদিক আবার আমার কাম পড়ে রয়েছে... ।

ছোট ভাইয়ের পিঠে হঠাৎ পিতার মতো বড় ভাইয়ের ছায়া নড়ে-চড়ে ওঠে। মোসলেম শীতল সেই ছায়ার স্পর্শে পিঠ থেকে বড় ভাইয়ের হাত সরে যেতেও শিউরে ওঠে–'হ্যাঁ মিয়া ভাই আমি কামে মন দেবো... ।' পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে মিয়া ভাই তার কাজে চলে গেছে।

এক মৌসুমের পর অন্য মৌসুমের চাষে যেতে আবার নতুন করে লাঙ্গল-জোয়াল গোছাতে হয়। লাঙ্গলের ফালটাকে কামারখানার আগুনে পুড়িয়ে পাক-পবিত্র করে নিতে হয়। তবে জোয়াল, জোয়ালের (জোত) দড়ি-দাড়া বা মইকে পাক-পবিত্র করার জন্যে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হয় না। তবু কত ধরনের খুঁটিনাটি কাজ কাজ থাকে এক এক মৌসুমের চাষের আগে। সেই সব গোছগাছ করতে মোসলেমের বেশ কদিন সময় লেগে যায়। আর সেই সময়ের মধ্যেই সে শুনতে পায় সিকান্দার শিকদার পূর্ব মান্দারে দমকল বসিয়েছে। মাঠে যেতে পথে বেশ দূর থেকে দমকলের ধকধক ধকধক ধ্বনি শুনতে পায়। যতই সে মাঠের দিকে এগিয়ে যায় ধকধক ধকধক ততই বাড়তে থাকে। কানের ভিতর দিয়ে সেই শব্দ তার বুকে মধ্যে ধাক্কা মারতে থাকে। তার

হৃদয়কম্পন বাড়তে থাকে। সে তাই সকল স্থির দৃশ্যের ভিতর সাঁই সাঁই করে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায়। দমকলের শব্দের মধ্যে লোহার পাইপ থেকে ঝকঝকে পানি বেরিয়ে আসছে... সে পানিতে খাঁখাঁ রোদের মধ্যে চারদিক শীতল হতে চায়ছে। হঠাৎ সে শীতল থেকে মোসলেমের চোখ সরে যায়– দমকলের লাল চপের উপরে দিয়ে বগবগ করে ধূসরকালো ধোঁয়া ওড়ে... মোসলেমের বুকটা হু হু করে ওঠে। সে দেখতে পায়– দমকল থেকে সিকান্দার শিকদার তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

– মোসলেম তোর আমার দরকার।

– কি দরকার?

– তার আগে ক'– দমকল লাগালাম ক্যামন হলো– আরে এক মৌসুমে আমন চাষ করে, পরের মৌসুমে আলু-পটল আবাদ করে কি চাষীর পুষায়... । এখন থেকে শীত মৌসুমেও ধান চাষ হবে... মাটির বুকের মুদ্দি'ত্তে দমকল দিয়ে পানি টা'নে আনে নতুন চাষের ব্যবস্থা করেছি... এই মান্দারের সব জমিতে আমি ইরি চাষ করবো– সে জন্যেই তোর দরকার।

– কি ক'তি চাও, সোজা করে কওচিন... ।

– তের জমিখেন ইরি চাষের মুদ্দি ফেলাচ্ছি

– না, আমার জমি আমিই চাষবো... যা খুশি তাই আবাদ করবো– ওই জমিতি তুমি নজর দিতে পারবা না...

– একটা ভালো কাম এ্যাম্বা রা'গে গেলে ক্যাম্বা হবে ক'দেখি... ইরি চাষের জন্যে তামাম মাঠ এক করে ফেললাম... কেউ কিছু বলল না। তুই এ্যাম্বা করছিস ক্যা– অ্যা। আরে পাগল– তোর জমি তো আমি পুরোপুরি নিয়ে নিচ্ছিনে– তুই যদি ইরির ভাগ চাষ পাবি... আর যদি চাষের জন্যে জমি চাষ তাও পাবি– এই জমির বদলে বুয়ালের চরের জমিখেন তোর দিয়ে দিলাম– যা চাষ করতে চায়লি– ওই চাষেকগা।

– কিন্তু ওই জমি আর এই জমি তো এক না !

– শোনেক বেশি কথা ক'সনে... ক্ষমতা থাকলে চাষ ঠেকাতি আসিস... ।

বউমরা উদাস চাষির কতটুকু আর ক্ষমতা থাকে... আরও বেশি ব্যাকুল হওয়া ছাড়া। তবু সে ব্যাকুলতার মধ্যে তীব্র আগুনে, প্রতিবাদে সপ্রতিভার প্রকাশিত হতে চায়। কিন্তু কোথাও কোনো সাহস খুঁজে পায় না, গ্রামের কেউই তাকে সংগ্রামের ভাষা দিতে পারে না। তাই সে সন্ধ্যার শরীর চিরে নিজেকে নিয়ে নিজেই জ্বলে উঠতে চায়।

যেভাবে মোসলেম কমিউনিস্ট হলো

এখনই চাঁদ উঠবে– সন্ধ্যায় রাত্রির আগমনে পূর্ব গগনে তারই আভাস জেগে উঠেছে আজ মোসলেমের মন কেন যেন বারবার চাঁদের শরীরে বিলীন হবার কথা ভাবে। হাকিম মণ্ডলের বাড়ি উপর দিয়ে চাঁদ উঠছে। মোসলেম ঠর চোখে বাঁকা দুটি তালগাছের ভেতর দিয়ে চাঁদ দেখতে থাকে। সে অল্প একটুখানি শুনেছে হাকিম মণ্ডলের বাড়িতে কিছু লোক

এসেছে, যারা এই রাতে গ্রামের গরিব কৃষকদের নিয়ে বৈঠক করবে সে জানে না– কিসের বেঠক? তবে বৈঠকে হতে গরিব কৃষকদের নিয়ে– ঐ বিষয়টি তাকে আগ্রহী করে তোলে। সে বৈঠকে এসে শুনতে পাই অপূর্ব সব কথা, যা সে আগে কখনো শোনে নাই– এমন কী ভাবেও নাই। সে শুনতে পাই–

– গরিব কৃষকই একমাত্র গরিব কৃষকের বন্ধু হতে পারে। ... আমাদের দেশের কৃষকদের দুর্গতির কারণ– কৃষকরা নিজেরাই, তারা জানেনা তারা কে? ... আচ্ছা বলেন তো চাষ করে কারা? ফসল ফলায় কারা? বলেন– কেউ একজন বলেন–

– ক্যা, আমরা চাষিরা।

– এবার বলেন– সে ফসল খায় কারা?

– সারা দ্যাশের মানুষ।

– ঠিক কয়ছেন... এমন হিসেব করে দেখেন– আপনারা কৃষকরা সারাদেশের মানুষের জন্য খাবার জোগান দিচ্ছেন– অথচ আপনাদের ফসল কাওয়া ওই মানুষগুলো আপনাদের জন্য কতটুকু করছে... এসব আপনারা ভাবেন না... প্রত্যেক বছর আপনাদের জন্মানো কমদামে বিক্রি করা ধান-চাল, আপনারাই আবার বেশি দামে কিনে খান... কিন্তু একবারও ভাবেন না কার বীজ, কার হাত হয়ে, আবার কার হাতে ফিরে এল? ... মাঝখানে লাভ হলো কার? আমরা এইসব ভেবে দেখেছি... আপনাদের যাতে আর এই রকম ফাঁকিবাজির মধ্যে না পড়তে হয়... আমরা সেই চেষ্টা করছি... তবে আমাদের চেষ্টা তখনই সফল হবে– যখন আপনারা এক সাথে কাজ শুরু করবেন, একের দুঃখে বা অসুবিধাকে আপনারা সবাই মেলে মোকাবিলা করবেন... শুনেছি এই গ্রামের সিকান্দার শিকদার আপনাদের অনেকের চাষের জমি কেড়ে নিয়ে চাষ শুরু করছে... আপনারা গ্রামের সব কৃষক এক হলে সিকান্দার শিকদার কি আপনাদের একটা জমিতেও হাল লাগাতে পারে?

– সে কাম করতে গেলে তো বাবা, নেটা বাঁ'ধে যা'বে।

– তুমি চুপ করো... নেটা বাঁ'ধে যাবে ! ওই নেটা বাঁ'ধে যাবে বলে কি জুতির জমিখেন ছাড়ে দিতে হবে অ্যা? ... আমি ওই সব নেটার ভয় করি না...

– অ্যা লেটার ভয় করি না... এই লেটা বাঁ'ধে গেলে তোর ঠেঁকাবে কি-ডা ক' দেখি... ইরা তো বৈঠক করেই চলে যাবে... তোরে বাঁচাবে কি-ডা।

– তুমরা বাপ-বিটা থামো তো... আগে কতগুন শুনতে দ্যাও...

– না না, ঠিক আছে... চাচা একটা ভালো কথা বলেছেন– নেটা বাঁধলে ওরে ঠেকাবে কে? এখন চাচার কাছেই আমি একটা প্রশ্ন করি– আচ্ছা চাচা, সিকান্দার এই গ্রামে কত জান?

– একজন, কিন্তুক তার... ।

– লাঠেল আছে, বেশ... বলেন কতজন লাঠেল আছে আর এই গ্রামে আপনাদের মত কৃষক কতজন? আপনারা কথা কবেন না... আমি চাচার উত্তর শুনতে চাই...

চাচা উত্তর দিক বা না-দিক, বিষয়টা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গ্রামে কৃষকেরা একই বন্ধনে আবদ্ধ হলে সিকান্দার শিকদারের সাধ্য নাই, তাদের ভূমিতে জবর দখলের চাষ-বাস করার। মোসলেম জ্বলে উঠবার পথ খুঁজে পেয়ে প্রগাঢ় আবেগে লোকটির কাছে নিজেকে অর্পণ করে দেয়।

– আমারে আপনারা সাথে নেন।

– কেন, কি হয়েছে আপনার?

– সে মেলা কথা, আগে ক'ন আমারে সাথে নেবেন কি-না?

– ঠিক আছে, আপনার মন চাইলে থাকবেন... আমাদের কোনো আপত্তি নাই... এখন ক'ন ঘটনাটা কি?

– সিকান্দার শিকদার আমার পূর্ব মান্দারের ধানীজমিখেন দখল করে নেছে... আমি আর চাষ করতে পারছিনে...

– তাহলে তো এখনই আপনি আমাদের সাথে আসতে পারেন না...

– ক্যা, পারবো না ক্যা?

– কারণ, এখন আপনার কাজ হচ্ছে– গ্রামের সবার সাথে থেকে সব চাষিদের এক করে... সিকান্দার শিকদারের কাছ থেকে আপনার জমিসহ সকল চাষির জমির দখন ফিরিয়ে নেওয়া... এই কাজটি ঠিক মত করতে পারলে আপনি এমনিতেই আমাদের সাথের একজন হয়ে যাবেন– আপনাকে আলাদাভাবে তখন আর আমাদের সাথে আসার কথা বলতে হবে না...

– ঠিক কয়ছেন, আমি তাই করবো...

শোক-বিরহ গাথার মোসলেমকে এবার আর চেনা যায় না। আশ্চর্য ! যুগে যুগে এবাবেই বুঝি বিপ্লবের ভাষায় মানুষ তার শোক-বিরহের দোলাচাল থেকে মুক্ত হয়ে আরেক মানুষ হয়ে যায়। মোসলেম আর গ্রামের সকল চাষী এক হয়ে উঠলে সিকান্দার শিকদারের চাষের জমি ছোট হয়ে আসে। কেননা, অন্য কৃষকের দখল জমিগুলো সিকান্দারের চাষের জমি থেকে ত্বড়িতগতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ এক আজব খেলা... পৃথিবী বিস্তৃত প্রশস্ত জমিন– কার বা কিসের ইশারার এক সাথে থেকেও প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন? মোসলেম উত্তর পায় ভূমির উপর আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি চলছি ফিরছি তারা কি এক? ... না এক নই, আর এ কারণেই। পায়ের নিচের জমিনও ক্রমাগত টুকরো টুকরো ভাগে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতটাই বিচ্ছিন্ন হয় যে, ভূমির আসল উদ্দেশ্য চাষবাস-নিরন্তর দখলদারিত্বের প্রশ্নে দ্বিধা ছড়ায়। হায়রে জমিন, এত সব সীমারেখা, কাটাকাটা আইল, ভাগ-বিভাগ নিয়ে তুমি কেমন আছো? মোসলেম এ কথার কোনো উত্তর পায় না। সে রাতে প্রগাঢ় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে থাকে– ভূমির সব সীমারেখা আল ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে... সারামাঠ একটিই জমি হয়ে উঠেছে... আর গ্রামের সব কৃষকেরা ঢোল-ডগর বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে

সীমারেখাহীন সেই মাঠের মধ্যে। মাঠের ঠিক মাঝখানে পৌছে তারা কিসের আনন্দে মেতে ওঠে। মোসলেম সে আনন্দে দিশেহারা।

একটি আকাশ মাথার উপর
তারার ফসল হাসছে সেখানে
পায়ের নিচের জমিন ফসলে
মাতাল বাতাস বইছে উদাস।
উড়ছে জোনাকি ফসলের মাঠে
তাই মিলে যায় জমিন-আকাশ ॥
জোনাকি তারায় আকাশ-পৃথিবী
মিলে মিশে যায় এমনি রাতে
মোসলেম ঘোরে গ্রাম থেকে গ্রামে
স্বপ্নের আলোয় মন্ত্রবিদ্ধ হয়ে
জোড়াদাহ ভায়না ত্রিবেণী কুচয়া
ঘুরতে ঘুরতে পঞ্চপাখিয়া
মোসলেম এলে থমকে দাঁড়ায়
জুলেখার চোখে দৃষ্টি গেলে তার।
জুলেখার মুখে চাঁদমাখা আলো
মোসলেম দেখে থমকে দাঁড়াল।

কমিউনিস্টের নারীপ্রেম

একটি ভূমির ঘোরলাগা স্বপ্নের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে পঞ্চপাখিয়া গ্রামে এসে মোসলেম এক রাতে জুলেখার দেখা পায়। জুলেখার বাবা হাকিম মুন্সী তাদের পার্টির অন্যতম আশ্রয়দাতা। কাজেই পার্টির অন্যদের মতোই এ বাড়িতে মোসলেমের ঘটতে থাকে অবাধ আসা-যাওয়া। তার এই আসা-যাওয়ার মধ্যেই জুলেখা এক সময় মনে মনে কিসের যেন গুঞ্জন অনুভব করে। সে মোসলেমের দিকে চাঁদের চোখে তাকায়–

– আপনেরা মানুষের জন্যে এতো কিছু ভাবেন... করেন... নিজের জন্যে কি কিছুই ভাবেন না... ?

– নিজের আমার কি আর আছে... যে নিজের কথা ভাববো...

মোসলেমের উদাস মুখের এমত কথায় জুলেখার মনের গুঞ্জন আরও বেড়ে যায়। সে দ্বিতীয় কোনো প্রশ্নের প্রয়োজন অনুভব করে না। তার পৃথিবী যেন আলোকিত হয়ে ওঠে– সে তাই গান গেয়ে ওঠে–

পেয়েছি এক মানুষ আমি
যার শুনেছি কেউ নাই
তারেই আমি চাইছি আজি

মনে মনে ভালোবাসায় ॥
মা হারা এক কন্যা আমি
বাপের ঘরে থাকি একা
সেই ঘরেতে এসে বান্ধব
দিয়ে যাচ্ছো আলোর দেখা।
তোমার আলোয় জ্বলবে বাতি
আমার আন্ধার একা ঘরে
এমন করে আর কতদিন
রাখবে আমায় কাছের দূরে।
বন্ধু তোমার প্রাণের বাতাস
আমার প্রাণে লাগছে এসে
তাইতো প্রাণ কাঁপছে আমার
নদীর পাড়ের ঘাসে-কাশে।
এমন করে আর কতদিন
কাছে থেকেও থাকবে দূরে
তোমার বাতি জ্বালবে কবে
আমার আঁধার একা ঘরে।

– শোনেন... আপনের চোখের মুদি একটা মায়ার আলো দেখতেছি বুকির মুদি ওই আলো ধিকধিক করে জ্বলতেছে... আপনে আমারে বিয়ে করেন... ।

– জুলেখা!

পূর্ব-পশ্চাতের ঘটনাসমূহ তাকে দ্বিধায় ফেলে দেয়। সে একবাক্যে জুলেকাকে সম্মতি জানানোর বদলে তার জীবনের কথা জানাতে চায়। কিন্তু ভয় হয়... যদি জুলেখা সকল কথা শোনার পর তাকে দূরে ঠেলে দেয়। শেষে তাই কিছুই বলা হয় না। সে শুধু মুখ তুলে জুলেখাকে দেখে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে যায়। এতে জুলেখার প্রাণচাঞ্চল্য বাড়ে, মাথার ঝাঁকুনিতে তার চুলের বাঁধন খুলে যায়। এলোমেলো চুলের প্রেক্ষিতে জুলেখার মুখে তার ভিতরের চাঞ্চল্য যথার্থভাবেই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

– কি হয়েছে মা... তোর আজ এমন লাগছে ক্যা?

– না আব্বা কিছু না।

– আমার মন কচ্ছে কিছু এট্টা হয়েছে... মোসলেম ছটফট করে বেরিয়ে গেল দেখলাম... আর তুই এইদিকে... তোর এ্যাম্বা দেখিছি... আচ্ছা সত্যি করে ক'তো কি হয়েছে?

জুলেখার চোখে মুখে মায়া-ছায়া ছলছল করে ওঠে। সে তা আড়াল করতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এবং লজ্জারঙে দূরে সরে যায়। আর হাকিম মুন্সী জীবনাভিজ্ঞতায় সব বুঝে যায়। জুলেখাকে সে বলতে চায়– 'এই সব মানুষগুলো বড় অদ্ভুত মা, এদের মায়ায়

বাঁধা বড় শক্ত। এরা সংসারের মায়া জালের বাইরেই বেশি ভাবে... এরা যে দেশের মানুষের কথা ভাবে... এই গুণটার জন্যে আমি ওদের সম্মান করি... কিন্তু তুই মা একি করলি... ওই মানুষের কথা ভাবা মানুষটারে তুই ঘরের কথা ভাবাতে চাচ্ছিস... তুই কি তা পারবি মা?' জুলেখা তার সামনে নাই, তবু সে জুলেখাকে বলতে থাকে– 'ঘরের মায়ায় সে কি বেঁধে থাকবে মা?' হাকিম মুন্সী নিজেই মনে এই কথার জবাব পায়– 'আলবৎ থাকবে, কাউরে বেঁধে রাখার ক্ষমতা তোর আছে, সে আমি জানি মা, এই যে তুই আমারে এই বুড়ো কালেও ক্যাম্বা টান করে বেঁধে রেখেছিস... কিছুতেই আমি পরকালের রাস্তায় পা বাড়াতে পারতেছি না... তোরে ধরেই বেঁচে আছি... মোসলেম বড় ভালো ছাওয়াল... আমি বিশ্বেস করি তুই ওরে বেঁধে রাখতে পারবি মা... পারবি।' যে পথ দিয়ে জুলেখা চলে গিয়েছিল দূরে– সে পথের উদ্দেশে হাকিম মুন্সী যখন এইসব কথা বলছে, ঠিক কথনই বিপরীত পথে এসে পিছন থেকে বাবার সম্মতিতে জুলেখা ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে–

বন্ধু তোমার প্রাণের বাতাস
আমার প্রাণে লাগছে এসে
তাইতো আমি কাপাস তুলোয়
ছড়িয়ে যাচ্ছি অনেক দূরের
আকাশে-বাতাসে ॥

মোসলেমকে নিয়ে সে তার স্বপ্ন নির্মাণ করতে থাকে। যে স্বপ্নে সে মোসলেমকে পায় স্নেহময় স্বামী হিসেবে, যার বুকে মাথা রেখে সে ঘুমায়, মুখ চুম্বন করে, দেহ প্রসারিত করে। সাথে সাথে লাজুক দোলায় স্বপ্ন টুটে যায়। বাস্তব পৃথিবীতে সে পিতৃ সেবা করে। বার্ধক্যদোষে পিতা তার প্রায় প্রায়ই অসুস্থ হয়। এ যাত্রায় সে সম্ভবত মৃত্যুপথযাত্রী– তাই তার মর্মপীড়াও একটু বেশি। খবর শুনে মোসলেমই প্রথম ছুটে আসে তার শয্যাপাশে। মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ বুঝি তাকেই খুঁজছিল, কেননা তাকে দেখে সে হঠাৎ উচ্ছল হয়ে ওঠে– 'বাবা মোসলেম, আমার কাছে এসে বসো।' মোসলেম কাছে এসে বসলেই সে তার হাত চেপে ধরে– 'বাবা... কি করে যে কই... '। 'অস্থির হবেন না... আমি তো আছি।' 'হয় বাবা আছো বলেই তো কই... তুমিই আমার ভরসা বাবা, তুমি বাবা জুলেখা মারে দেখো, ওর মনে কষ্ট দিওনা ও বড় ভালো মেয়ে... ।' মোসলেম আস্তে করে বৃদ্ধের হাত চেপে নিচের ঠোঁট কামড়ে বেশ আবেগের সাথে সম্মতির মাথা ঝাঁকায়। বৃদ্ধের ডান হাত চলে যায় মোসলেমের গাঢ় কালো চুলের মাথার উপর। সেই হাতটি মোসলেমের ডান কানকে স্পর্শ করে মুখের ডান হয়ে তার হাতের ডান কব্জিতে এস থামে। মোসলেম বহুদিন পর পিতৃস্নেহের স্বাদ পেয়ে শিহরিত হয়। সে সময়ে পার্টির অন্যান্য কমরেডগণ তাদের অনেকদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী হাকিম মুন্সীর পাশে এসে দাঁড়ায়। হাকিম মুন্সী শেষবারের মতো তাদের মুখের দিকে তাকায়। তার চোখ আনন্দে ছলমল করে ওঠে– সে যেন তার শয্যাপার্শ্বে তারই আদর্শবান সন্তানদের

দেখতে পাচ্ছে– সে তাদেরকে ভাঙাভাঙা উচ্চারণে বলে– 'যে কারণে তোমাদের আমি সন্তান ভাবতাম, সে কারণডা তোমরা ধরে রাখো বাবারা... তোমরা মানুষের জন্যে সুখের ব্যবস্থা করার স্বপ্ন দেখো– সেই পথে কাম করো... তাই যতদিন পেরেছি তুমাদের আমি সেবা দিয়ে গেছি... আজ আমি চলে যাচ্ছি– আমার জুলেখা মা থাকলো... ওর দায়িত্ব মোসলেমরে পুরোপুরি বুঝে দিয়ে যাতি চাছলাম... সে সময় বোধহয় আর পেলাম না... আমার হয়ে তোমরা এই কামডা করবে তো বাবারা... ?' তার এই শেষ জিজ্ঞাসায় তারা যে কিছুতেই অসম্মতি প্রকাশ করতে পারে নাই– এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই তার মৃত্যুর পর জুলেখা-মোসলেমের বিবাহ হয়। আর মোসলেমেরও কিছুতেই পশ্চাতের কথা বলা হয়ে ওঠে নাই। কেননা, সে ভেবেছিল যে কথা আগেই জানানো উচিৎ, তা এখন এই বন্ধনে জড়িয়ে হঠাৎ ব্যক্ত করলে উটকো পরিস্থিতিতে ছিন্নবিচ্ছিন্নই হতে হবে শুধু সমাধান মিলবে না কিছুই। এই ভাবনা এসে পশ্চাৎ প্রকাশের ব্যাকুলতাকে থামিয়ে দিয়েছিল। মোসলেম বুঝেছিল যে ব্যক্তিগত আখ্যান দূর গাঁয়ের সাথী কমরেডগণের কাছেও অজ্ঞাত, সেই আখ্যান জুলেখার পক্ষে জানাটা কতটা দুস্তর।

মোসলেম যখন পিতা এবং স্বামী

তবু দেখো অদৃষ্টের কী অদ্ভুত পরিহাস। জুলেখার সম্মুখেই দাঁড়িয়েছে পূর্ব বা মৃত পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। জুলেখা ঠিকই জেনে গেল স্বামীর পশ্চাতের অজ্ঞাত আখ্যান। এ পরিস্থিতিতে মোসলেম তার করণীয়কে শনাক্ত করতে পারে না। সে অস্থিরবোধে হাতের মুঠি পাকায়, দাঁতে দাঁতে চেপে মাথা ঝাঁকায়, মুঠি খুলে চুল মর্দন করে, কিছুতেই তবু স্বস্তি না পেয়ে হনহন করে জুলেখার সম্মুখে দাঁড়ায়। একবার সে জুলেখার মুখে, আরেকবার সে মহম্মদের মুখে চক্ষু তোলে। তাদের সেই থমথমে নীরবতাকে সে বিদীর্ণ করে দেয়– 'কি শাস্তি দিতে চাও... কও... ভয় জীবন সেই শাস্তির মুদি থেকেও আমি তোমাদের হাসি মুখে দেখে যেতে চাই... কও জুলেখা কি শাস্তি আমার... ক' মহম্মদ বাবা আমার... আমার এক বুকির মুদি তোরা দুইজন... আমার এই চোখের পানির সাক্ষী দিয়ে কই– জুলেখা-মহম্মদ কারোরই আমি পর কেউ নই... তবু কেন তোমরা আমার দিকে তাকাচ্ছো না একবার... কেন? আমার বুকে কি কষ্ট নাই... জুলেখা তাকাও আমার মুখে... তখনই মোসলেম মহম্মদের দিকে সরে গেলেও সে স্বামীর দিকেই চেয়ে থাকে। মোসলেম এবার মহম্মদের মুখ আগলে ধরতেই– মহম্মদ কিছুক্ষণের জন্যে স্থির চোখে মোসলেমের মুখের দিকে চায় এবং অকস্মাৎ হুহু কান্নায় মোসলেমকে বুকে আগলে ধরে। এই দৃশ্যে জুলেখা কি ভেবে যেন অন্তর্হিত হতে যায়– কিন্তু সহসাই সে মোসলেমের চোখে আটকে পড়ে। মোসলেম তার বুকের ভিতর সন্তানকে নিয়েই জুলেখাকে ডাক দেয়– 'জুলেখা, জুলেখা দাঁড়াও।' মোসলেমের কথায় জুলেখার যেন

পা আটকে যায়। সে না তাকিয়েই সম্মোহিতের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। মোসলেম মহম্মদের বুকের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জুলেখার দিকে এগিয়ে যায়।

– জুলেখা তোমার যেই চাওয়া এতদিন কবুল হয় নাই... সেই সন্তান আজ তোমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে... একবার তার দিকে তাকাও জুলেখা... আমার মন কচ্ছে– তোমার এতদিনকার মনের পিপাসা ওই মহম্মদ মিটায়ে দিতে পারে... একবার মুখ তুলে চাও... ও যে আমারই সন্তান... আমি যদি তোমার হই আমার সন্তান কেনে তোমার হবে না?

– হয় ভাবি, মোসলেম তো ঠিক কথাই কয়ছে... তুমি বুঝবার মানুষ... বে-বুঝির মতো কাম করো না... একবার ভেবে দেখো ওই মা-মরা ছেলেটার কথা...

কমরেড তুজামের কথা শেষ হতেই জুলেখা এই প্রথম ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে মাতৃত্বের বোধে মহম্মদকে দেখতে থাকে। আর মহম্মদের বিনত ভঙ্গিমায় হঠাৎ সে মোসলেমের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায়।

আর এই পরিস্থিতিতে কমরেড তুজাম তার যাবার কথা পাড়ে–

– মোসলেম, আজ রাতে তোমার আর যেয়ে কাম নাই... তুমি বাড়িতেই থাকো। আমি গেলাম...

আর এইকথা আর যাওয়ার মধ্যে মহম্মদ পাশ থেকে বলে ওঠে–

– আপনার পরিচয়?

কমিউনিস্টের ব্যক্তিপরিচয়

কমরেড তুজাম থমকে দাঁড়ায়– 'কি তার তার পরিচয়?' 'মহম্মদ তার কোন পরিচয় জানতে চায়– ব্যক্তি পরিচয়?' সে নিঃশব্দেই বলতে থাকে– 'পরিচয়? খুব শক্ত এই পরিচয়... ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া ব্যক্তি পরিচয় হয় না। কিন্তু একজন কমিউনিস্টের কোনো ব্যক্তি স্বার্থ থাকে না... অতএব তার ব্যক্তি পরিচয় থাকে না। কমিউনিস্ট সম্পূর্ণরূপে জনগণের মুক্তির জন্যে এবং পুরোপুরি জনগণের স্বার্থের জন্য কার করে। জনগণের স্বার্থই কমিউনিস্টের যাত্রাবিন্দু। কমিউনিস্ট হওয়া মানে ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা... প্রতিনিয়ত ব্যক্তিস্বার্থ বা ব্যক্তি পরিচয়কে লুপ্ত বা দূর করা। তবু যদি সেই পরিচয়ের কথা-ই বলতে হয়... তবে বলি'– 'শোন মহম্মদ কৃষক-শ্রমিক জনগণের মাঝে পরিচয় আমার হারিয়ে গেছে... '

– তার মানে?

– মানে-টানে কিছু নাই, আস্তে আস্তে সব জানা যাবে। যাই বাবা ঝড়-বৃষ্টিতে এমনি রাত হয়ে গেল... কালু শেখের বাড়ি লোকজন বসে রয়েছে... ওদের নিয়ে আমার আবার মনোহরপুর যেতে হবে...

কমরেড তুজাম কথা বলতে অন্ধকার হারিয়ে যায়। তবু মহম্মদ তার-ই কথায়

তোলপাড় হতে থাকে– 'শোন মহম্মদ কৃষক-শ্রমিক-জনগণের মাঝে কীভাবে একজন মানুষের ব্যক্তিপরিচয় লুপ্ত হয়? আর কেনই-বা কামরেড তুজাম এভাবে রাত্রি করে লোকজন সাথে নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায়?' এই যৌথ প্রশ্নের উত্তর ভেবে ঘুম-জাগরণে মহম্মদের রাত্রি সকাল হয়।

নির্মেঘ আকাশ থেকে সূর্য আজ ধীরে সুস্থে আলো মেলে ধরতেই চারিদিক ফর্সা ফর্সা লাগে। রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে গাছ-পাতার ময়লা কেটে গেছে সকালে তারা ঝলমলে। তবে কিছু বুড়ো আর কচি পাতা, ফুল এই সকালের ভেজা মাটিকে আকাশ-প্রকৃতির মতো আরেক মহিমা দিয়েছে। ঝিরঝিরে বাতাস লেগে মহম্মদের দেহ থেকে ঘুম-জাগরণের জড়তা অথবা ক্লান্তি উড়ে উড়ে যায়। ফুরফুরে হাওয়ায় মহম্মদ তাই গ্রামের পথে হাঁটে। তাদের উড়ন অথবা নৃত্য ভঙ্গিমায় গাছের পাতায় জমা বৃষ্টিপানি শূন্যে এসে সূর্যের আলোয় সহসাই হিরা-মুক্তা বা রূপাদানার রূপ পেয়ে মহম্মদের দেহে অথবা মাটিতে পড়ে পুনরায় পানি হয়ে যায়। এই অপরূপ খেলায় মহম্মদ গাছের তলদেশ দিয়েই তাঁটতে থাকে হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে সে গ্রামের পার্শ্ববর্তী একটি বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে দাঁড়ায়। এমনভাবে দাঁড়ায় যে তাকে একটি কাততাড়ুয়ার মতো মনে হয় অথবা এও মনে হয়– সে হচ্ছে সমগ্র মাঠের একমাত্র বিস্মিত অধিকর্তা অথবা কৃষক। সে তখন মাথার উপর বিরাট এক আকাশের অনুভব করে আর পায়ের নিচে অনুভব করে উদার এক জমিন। এসবের মধ্যেই ফসল, রৌদ্র, ছায়া, বৃক্ষ, বাতাস, পাখি, নদী, রং, ঢেউ– মহম্মদ অনুভব করে– সে তাদেরই একজন কেউ। তবে তো এভাবেই প্রকৃতির মাছে মানুষের ব্যক্তিপরিচয় লুপ্ত হয়। কিন্তু মহম্মদের মন এই ভাববাচ্যে বুঝ মানে না। তার মন বলে– 'কৃষক-শ্রমিক-জনগণের মাঝে পরিচয় হারিয়ে ফেলার অন্য কোনো অর্থ আছে। সেই অর্থটাই জানা জরুরি।'

মাঠ থেকে ফিরে এসে সে এবার মুখোমুখি হয়। তার জিজ্ঞাসায় পিতার মুখে যেন খই ফোটার চাঞ্চল্য ভয় করে। সে আবিরাম শুনে চলে– দুনিয়ার মানব সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যার একভাগে আছে গরিব-শ্রমজীবী-শোষিত আর বিপরীত ভাগে আছে ধনী-আয়েশি-শোষক। ধনী-আয়েশি-শোষকদের পুঁজি হচ্ছে অর্থ। তারা এই পুঁজি লগ্নি করেই ক্রমাগত ধনী হচ্ছে, আয়েশি হচ্ছে এবং শোষক চরিত্রের ভিত্তিও আরও বেশি দৃঢ়মূল হচ্ছে। অন্যদিকে গরিব-শোষিত শ্রমজীবীর পুঁজি হচ্ছে– শ্রম। কিন্তু তারা এই শ্রম পুঁজিকে লগ্নি করে ক্রমাগত গরিব হচ্ছে এবং শ্রমমক্তি হারিয়ে একসময় সর্বশান্ত বা সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে কাজেই তাদের পিঠের উপর শাষক-শাসকের ভর-ক্রিয়া ক্রমাগত বেড়েই উঠছে শুধু। এই নিষ্ঠুর সামাজিক ক্রীড়ার পরিবর্তে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নেই তুজাম ভাই তার পরিচয়কে হারিয়ে ফেছেন শ্রমজীবী-গরিব-শোষিত মানুষের মাছে। তার পরিচয় এখন একটাই শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আন্দোলনে 'কমরেড, কমরেড'।

কমরেড কমরেড
তেল-নুন-ডাল-ভাত সমান সমান
চাই চাই চাই
শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির অধিকার ।...

– তুজাম ভাই ঠিকই কয়ছে– কৃষক-শ্রমিক-জনগণের মাঝে পরিচয় তার সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেছে... মানুষ আর এক সাম্যের সমাজের কথা ভেবে লোকটা ভইর জীবন পার করে দিল... । এট্টা বিয়ে পর্যন্ত করল না... আমরা যারা তুজাম ভাইর সাথে পার্টির কাম করি– তারা তুজাম ভাইর কাছ থেকে শিখেছি– যে সমাজের জন্যে আমরা কাম করে যাচ্ছি– যে সমাজ আনতে চায়লে আগে নিজির স্বাত্তেরই (স্বার্থেরই) গলা টিপে মারতে হয়...

– আপনেরা কি তা পেরেছেন?

– পারি নাই মানে... পেরেছি বালেই না দেড় যুগ ধরে পার্টির কাম করে যাচ্ছি... রাদের পর রা'ত গ্রামমে গ্রাম মানুষকে বোঝাচ্ছি– নতুন এক সুখের সমাজের জন্যে সকলকে এক হতে হবে... দরকার হলে যুদ্ধ করতে হবে... সে এমন এক সমাজ... যেখানে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব ভেদাভেদ থাকবে না... গ্রামের গরিব-কৃষক-কামলারা তো এই-ই চায়... তারা আসছে... দিনকে দিন আমাদের সাথে এক হচ্ছে... এখন তুইই ক' মহম্মদ সেই সমাজ কেনে আসবে না... ?

– আপনাদের কথায় আর কাম-কাজে কোনো কুদ (খাঁদ) না থাকলে অবশ্যই আসবে...

পুত্রের কমিউনিস্ট হবার আশঙ্কায় পিতার বিরোধ

মহম্মদের সম্মতি সূচক কথায় মোসলেম উদ্দিন বেশ খুশি হয়ে ওঠে । আর এই খুশির মধ্যেই রাত্রে কমরেড তুজাম ও পার্টির লোকজন বাড়িতে ঢুকলে মোসলেম উদ্দিন এগিয়ে যায় । সে কমরেড তুজামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে ওঠে–

– তুজাম ভাই, আমার ছেলের এমন কথাই কয়ে গেছেন যে তার মানে ভেঙে ক'তি আমার পরান শুকিয়ে যায়...

– তাই না-কি মহম্মদ?

– চাচা, আমারে আপনে সাথে নেন... আমি পার্টির কাম করবো...

মহম্মদের কথায় মৃদু হেসে কমরেড তুজাম বলতে থাকেন–

– তোর ছেলের কথা শোন মোসলেম, তোর ছেলের কথা শোন...

কমরেড তুজামের হাসি দেখে মহম্মদের সন্দেহ হয়– 'তাকে বুঝি নেবে না কমরেড ।' তাই সে পুনরায় কমরেডের কাছে আকুতি ব্যক্ত করে–

– আমরে নেবেন না চাচা, নেবেন না?

– নেবো না মানে, পার্টিতে তোমাদের মতো তরুণদেরই বেশি প্রয়োজন ...

– না তুজাম ভাই, মহম্মদ যাবে না... মহম্মদের আপনে নেবেন না...

ব্যাকুল হয়ে মোসলেম উদ্দিন কমরেড তুজামের কথাকে থামিয়ে দিয়ে অনবরত বলে চলে– 'পার্টির ব্যাকুল হয়ে মোসলেম উদ্দিন কমরেড তুজামের কথাকে থামিয়ে দিয়ে অনবরত বলে চলে– 'পার্টির জন্যে তো আমি আছি... আমি চাই না তুজাম ভাই... মহম্মদ এই পথে আসুক... মহম্মদরে আপনি ক'য়ে দেন– আপনে ওরে নেবেন না... '

– আমি ক'য়ে দিলেই কি মহম্মদ থেমে থাকবে রে মোসলেম?

– আপনেরা আর না আসলেই থাকবে..আপনেরা আর আসেন না তুজাম ভাই...

– মোসলেম... কি ক'লি

পরম বিস্ময়ে কমরেড তুজাম কিছুক্ষণ মোসলেমের দিকে উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো উত্তর না পেয়ে আভিমানে বলে ওঠে– 'ঠিক আছে... তুমি তোমার মতোই থাকো... আমরা গেলাম... ।' এমন অভিমানী কথায় কররেড চলতে শুরু করলে মহম্মদ ছুটে গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ায়–

– তুজাম চাচা, আব্বা আমার মহবতে পড়ে কি বলেছে না বলেছে মনে নেবেন না... আপনেরা আসবেন, ক'ন আসবেন না?

– না মহম্মদ তা হয় না...

– হয় চাচা হয়... । আপনেরা যার সাধনা করতেছেন... এইরকম কথায় দ'মে গেলি– সে সাধনা সফল হবে ক্যাম্বা... ক'ন তো? আমি আব্বাকে বুঝাবো... আপনেরা আসবেন তো?

তীব্র অভিমানের ভিতরে থেকেও মহম্মদের কথাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না বলে কমরেড তুজাম পরে ভাববার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেয় । আর মোসলেমের চেতনার ভিতর বিপরীতমুখী এক যুদ্ধ চলতে থাকে– 'ওই কথা সে তো বলতে চাই নাই... মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেছে ।... কিন্তু এখন উপায়?' 'উপায়-টুপায় যা-ই থাক না কেনে... তার আর দরকার নাই..আমি ঠিক কয়েছি... মহম্মদ পার্টির কামে যাবে না... কোনোদিন যাবে না ।'

– শুধু আমার জন্যে এতদিনের পার্টির সাথে এই ব্যবহার করলেন?

– করেছি... দরকার হলে আরও করবো... তাও তোরে আমি ওই পথে নামতে দেবো না...

– কেন, কেন নামতে দেবেন না... ?

– দেখ বাবা তুই অমন করে কথা কোসনে... এতদিন পরে তোরে পেয়ে-আমি নিজেরে এখন চিনতে পেরেছি... পার্টির জন্যে তা মেলা করেছি... এত বছর নিজের কোনো কথা ভাবি নাই... আমার জন্যে আপনের কিছুই করা লাগবে নানে... আমি আপনার কাছে এমন কিছু নিতে আসি নাই যে... তার জন্যে আপনার আলাদা করে কিছু করতে হবে...

– এ তুই কি কচ্ছিসরে মহম্মদ। আমার বুকের মুদি তোর মায়া আসে থই থই করছে... এই মায়া তো মিথ্যে নারে বাবা...

– হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এই জিনিসটাই দেখতে এসেছিলাম... 'আমার জন্যে আপনার বুকের কোথাও না কোথাও মায়া আছে'... তা আমার দেখা হয়ে গেছে... এখন আবার আমার জঙ্গুলি চলে যাওয়ার পালা...

– না, তুই যাবি না... কিছুতেই যাবি না... আর যদি যেতে চা'স... তে এই নে এই নে... আমারে তুই মেরে ফেলা যে যাবি...

পিতা মোসলেম উদ্দিন তার বস্ত্রের ভিতর থেকে অকস্মাৎ একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে পুত্র মহম্মদের হাতে গুঁজে– তাকে কেবল হত্যার বিনিময়েই চলে যাবার সমর্থন ব্যক্ত করে। অস্ত্র দর্শনে অথবা পিতার জলীয় আবেগে মহম্মদ আর কথা বলে উঠতে পারে না। সে নির্বাক বিস্ময়ে আবারও পিতার মুখের দিকে তাকায়। পিতৃগৃহ থেকে তার আর ফেরা হয় না।

ফেরা হয় না
বিস্ময়ে পিতার চোখে
স্নেহের ছায়া দেখে ॥
যেই পিতা সব ভুলে
পুত্রের কথা ভেবে ভেবে
সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে
পুত্রকে রাখতে চায়
আগলে আপন বুকে
সেই পিতা মোসলেম ॥
মহম্মদ তার ছেলে।
তারে ফেলে ফেরা হয় না
তার চোখে স্নেহের ছায়া দেখে।
পিতা-পুত্রের দিন যায়
স্নেহ-ভালোবাসায়
একথা মানে তো সবাই,
মানে কি একাহিনীর কমরেড...?
কোথায় কোথায় সেই কমরেড
অথবা তুজাম ভাই?

কমিউনিস্টের প্রতিপক্ষ

– তোরা সকলে মোসলেমের পার ইট্টু খেয়াল রাখিস... ওর কাছে এখনও পার্টির অস্ত্র রয়েছে...

– কিন্তুক তুজাম ভাই, মোসলেমের হঠাৎ কি এমন হল যে আপনের সাথে এই রকম এটা ব্যবহার করলো...

– ক্যা তুই শুনিসনি... মোসলেমের আগের এক বউ ছিল... সেই বো'র এক ছেলের আছে... ছেলেখেন ভারি সুন্দর... সে নিজের ইচ্ছায় আমাদের পার্টিতে আসতি চাচ্ছিল...

– আচ্ছা এই জন্যে পার যেতে নিষেধ করে দিল... ঠিক আছে তুজাম ভাই, আপনে কিছু ভাবেন না... এই ব্যাপারখেন আমার 'পার ছাড়ে দেন... ওই ছেলে ঠিকই পার্টিতে আসবে...

– কিন্তুক একরাম...

– কোনো কিন্তুক নাই... পার্টির জন্যে ইডা আমার দায়িত্ব... 'এট্টা ভালো ছেলে পার্টিতে আসলে পার্টির মেলা লাভ' ... তুজাম ভাই, আমি আপনের এইকথা তো ভুলি নাই...

একরামের দৃঢ় কথায় কমরেড তুজামের দ্বিধা কেটে যায়। সে এবার নতুনভাবে ভেবে ওঠে– ঠিকই তো পার্টির কল্যাণের জন্য মহম্মদের মতো প্রাণবন্ত-বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদেরই বেশি প্রয়োজন। পার্টির কর্মকাণ্ডকে দ্রুত সফল করার জন্যে তরুণ যোদ্ধার কোনো বিকল্প নাই। একমাত্র তারই নীরব সমর্থনে আরও দৃঢ়তা পায়। সে গভীর তেজে তার তিন জন সহযোদ্ধা কালাম, প্রবীর ও হারুণকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এবং চার রাত পর আবার প্রকাশিত হয়। তাদেরকে দেখা যায় রাতেরই অন্ধকারে– কাকে যেন তারা মুখ বেঁধে নির্জনতার আবহ থেকে আরও অধিক নির্জনতায় নিয়ে যায়। চাঁদহীন অজুত তারার ফুটিদেওয়া আকাশ তলের অন্ধকারে তারা তাকে দর থেকে দূরে নিয়ে নিস্পন্দন করতে সদ্য চাষ করা একটি জমি খুঁড়তে থাকে। তারা যেন তখন কোনো মানুষ নয়... 'হেই' 'হেই' করে ঘেমে নেয় শুধু মাটি খুঁড়তে থাকে। আর দুই হাতের দশটি আঙুলে মাটি সরায়। দশ দশটি আঙুলের মাথায় অথবা নখের মধ্যে ঝুরিঝুরি বালি-মাটি ঢোকে– নিঃশ্বাসের টানাটানা উত্তেজনায় কিছুক্ষণ 'শো' 'শো' ... কিছুক্ষণ 'হেই' 'হেই' শব্দ হয়।

হারুণ এই শব্দের সাথে মুখবাঁধা লোকটির গোঙানি মিশিয়ে অকস্মাৎ মাঠের মাঝে গড়াগড়ি খায়– 'হেই আকাশে, ভেঙে পড়তে পারিস না... ভেঙে আমারে তুই মাটির মুদি সান্দায়া দে... ।'

হারুণের আকস্মিক পরিবর্তনের প্রবীর ও কালাম প্রথমে ভ্যাবাছ্যাকা খেয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তারুণকে বুঝ দেয়– 'ওই হারুণ এমনধারা করলে কার হবে ক্যাম্বা... আয় রাত তো আর বসে থাকবে না... আয় ওঠ... '

'জ্যান্ত চাপা... আমারে দ্যাও...'

হারুণ আকুল হয়ে মুঠো ভর্তি মাটি নিয়ে হু হু করে কাঁদতে থাকে। তার কান্নার ভিতর একরামের এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়– 'দ্যাক হারুণ, বেফরমানি করবি তো

সত্যি সত্যি খুন হয়ে যাবি... যে কামে আয়ছিস... ঝক ক'রে সে কাম সার... নইলে আজ তো তুই খুন হবিই... কাল তোর বউ ছেলেও খুন হবে...

– না... পারলে আমারে খুন কর... ওদের দিকে হাত বাড়াবে না... ।

– কাউরে খুন করবো না... তুই মাটি খোঁড়...

– ঠিক আছে তাই খঁড়তিছি...

তারা উভয়ে মাটি খোঁড়ে। মাটির সাথে তারুণের আবেগের পানি মিশতে থাকে। তার কাছে মনে হয়– যেস যেন নিজের জন্যেই অনন্তকাল এই মাটি খুঁড়ে চলছে– আর এক সময় এই মাটির শরীরে সে নিজেই ঢুকে পড়েবে, মিশে যাবে এবং এই মাটিতেই গজিয়ে উঠা লতা-পাতায় কিংবা ফসলের শরীরে ছড়িয়ে যাবে তারই শরীরের রস-গন্ধ- কেউ জানবে না... সে তবু সবার চোখের গোচরে বা অগোচরে বাতাসে নড়ে-চড়ে উঠবে... সূর্যের আলোয় দেহ বড়িয়ে দেবে... । তার হু হু কান্না আবার বেগ পায়... কেননা যথেষ্ট পরিমাণ মাটি খোঁড়া হয়েছে দেখে– মুখবাঁধা লোকটাকে এক ধাক্কায় গর্তের মধ্যে ফেলে দেয় একরাম। আর তারা এবার ছয় ছয়টি হাতে গর্তটি ভরাট করতে থাকে। লোকটি মাটির শরীরে একেবারে ডুবে যায়। সে স্থানটি চাষের জমির সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে সমান করে দিয়ে তারা সেই রাতেই পায়ে হেঁটে কমরেড তুজামের মুখোমুখি হয়। একরাম কমরেড তুজামের পায়ের কাছে মোসলেমের অস্ত্রটি রাখতেই কমরেড তুজাম বস জেনে যায়। কারণ একরামের কাজের ধরণ তার কাছে অপরিচিত নয়। তাই একরামের হাতে মোসলেমের পরিণতি বুঝতে পেরে তার মনে একটু বেদনা জাগতেই সে যুক্তি আঁটে– 'পার্টিকর্মীর আত্মসমালোচনায় গলদ ধরা পড়লে... ব্যক্তিস্বার্থ পার্টি কর্মীর কাছে নড় হয়ে উঠলে... কর্মী যদি তা শেষ পর্যন্ত সংশোধনে ব্যর্থ হয়– তবে মৃত্যুই তার পরিণতি... মোসলেম তো সেই পরিণতিতেই পৌঁছে গেছে– এ আর এমন কি... ।' কিন্তু এই নিপাটি যুক্তিতেও মন তার ঠিক ঠিক বুঝ মানে না। মনে আজ বেদনার করুণ সুর ভর করে... চোখে হু হু করে পানি ছুটে আসে... মুখে সে বারবার উচ্চারণ করে– 'মোসলেম' 'মোসলেম'।

পিতৃ সন্ধানে কমিউনিস্ট হয়ে উঠা

মোসলেম মোসলেম
মাটির ভিতরে তার সজীব শরীর
উঠছে উঠছে ফুসে
রক্তশিরা জুড়ে চাপা[illegible]ধ উত্তেজনা–
' কোনো বাঁধা মানবো না'
দেহের ভিতর রয় এই আর্তনাদ–
' কোনো বাঁধা মানবো না'
চারিদিকে মাটি চাপা দেহ নিরুপায়

তাই হয় দেই-ই বিদীর্ণ আজ
মাটির ভিতর
জানে না জানে না কেউ এমন খবর
কেননা হয়নি কারো জ্যান্ত করব।
জানে মহম্মদ আর জুলেখা বিবি
কোথায় কোথায় পিতা কোথায় বা স্বামী।

দুইদিন দুইরাত পরও যখন মোসলেম উদ্দিন বাড়ি ফেরে না– তখন জুলেখার মনে কিসের যেন দুশ্চিন্তা ভর করে– তার বাম চোখের পাতা বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে। তার সাথে মনটাও যেন কেমন করে ওঠে। সে ভেবে পায় না কেন এমন– আগেও তো কতদিন না বলে বাইরে থেকেছে– কিন্তু কোনোদিন তো এমন দুশ্চিন্তা হয় নাই– আজ কেন এমন হচ্ছে? বারবার নিজের মনের কাছে এই প্রশ্ন রেখে সে শেষে মহম্মদের কাছে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে।

– তোর বাপের কি যেন হয়েছে...

– অ্যা...

– হ' হ'... আমার মনের মুদি খালি কুকথা আসতেছে... দুই রাত তিন দিন সে বাড়ি ফিরে নাই... কি জানি তার বিপদ হয়েছে... তুই ইট্টু তালাশ ক'রে দেখ না বাপ...

– কিন্তুক কিছুই আমি চিনিনে জানিনে... কোনে তালাশ করবো... ?

– কিছুই চেনা লাগবে নানে... তুজাম ভাইরে তো চিনিস তার কাছে সব সংবাদ পাবি... তুজাম ভাই এখন হাকিমপুর থাকে...

– কিন্তুক যারে সেদিন নিজে মুখে বাড়ির 'পার আসতে নিষেধ করলো তার কাছে সে কোন মুখ নিয়ে যাবে?

– মুখ ফসকে কি কয়ছে না কয়ছে সে কথা কি সে মনে রেখেছে... এতদিন ধরে যে পার্টির কাম করে আসতেছে... এক কথায় কি সেই সম্পর্ক শেষ হতে পারে... যা না বাপ... তুজাম ভাই'র কাছ যেয়ে তোর বাপের সংবাদখেন এনে দে আমারে...

– ঠিক আছে, আপনি যখন এত করে কচ্ছেন যাচ্ছি...

মহম্মদ সে রাতেই হাকিমপুর পৌঁছে কমরেড তুজামের মুখোমুখি হয়। কমরেড তুজাম তাকে দেখে প্রথমত কিছুটা হলেও ভীত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভীতি চাপা দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন–

– মহম্মদ, তুমি ! তুমি এখানে?

– তুজাম চাচা, কয়দিন হল আব্বা বাড়ি ফেরে নাই...

– বড়ি ফেরে নাই ! কেন সে তো বাড়িতেই ছিল...

– তা ছিল... কিন্তুক দিন তিনেক আগে কি কামে যেন বাইর হলো... তারপর আর বাড়ি ফেরে নাই...

– জবর চিন্তাই ফেলালে বাবা... পার্টির লোকের শত্রুর অভাব নাই... দাঁড়াও আমি ইট্টু তালাশ লাগায়ে দেখি...

কমরেড তুজাম এবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ঘরের দিকে তাকিয়ে জুলহাসকে ডাকতে থাকে 'জুলহাস ওই জুলহাস'। তার ডাকে জুলহাস ঘর থেকে বেরিয়ে এলে কমরেড তুজাম বেশ সতর্কতার সাথে মোসলেমের কথা পাড়ে।

– জুলহাস, মোসলেম নাকি কয়েকদিন বাড়ি ফেরে নাই... তুই কোনো সংবাদ জানিস না-কি?

– তা কয় দিন হল?

কমরেড তুজাম এবার মহম্মদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে–

– কয় দিন বাবা?

– তিন দিন।

মহম্মদের মুখে তিনদিনের কথা শুনে জুলহাস হিসেব করে কয়–

– তিন দিন মানে রবিবারের তে মোসলেম বাড়ি ফেরে নাই... রবিবার রাত্তিরবেলা সারুটের মাটের মুদ্দি দিয়ে একজনরে আমি ধরে নিয়ে যেতে দেখেছি... সে-ই যদি মোসলেম হয়... তা'লি তো তুজাম ভাই ঘটনা প্যাচ খেয়ে গেছে...

– আর কি দেখেছিস?

– আগে পাঠে দুইজন করে মোট চারজন লোকডারে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল... আমি একা ছিলাম বলে এগোতি সাহস পাই নাই... তবু আগে যদি জানতাম ওইডা মোসলেম– তা'লি ঝাপায়া পড়তাম...

– শুনলে তো মহম্মদ... এমন কথা শোনার পর আমাদের আর বসে থাকার সময় নাই... মোসলেম আমাদের পার্টির কর্মী... তার জন্যে আমাদের এট্টা দায়িত্ব আছে... এখনই আমরা তার তালাশে বের হবো... ইচ্ছে করলে তুমিও আমাদের সাথে থাকতে পারো...

– চাচা, আব্বার ওই কথাখেন আবার মনে রাখেন নাই তো?

– কোন কথা?

– ভুলে গেছেন... । তাহলে থাক... আর মনে ক'রে দরকার নাই...

– হ, আছি আপনাদের সাথে...

এবাবেই পার্টির সাথে মহম্মদের সম্পর্ক সূচিত হয়। সূচনা পর্বে পার্টির কর্মীদের সাথে সে কেবল তার পিতাকেই খুঁজতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতাকে আর খোঁজা হয় না বরং পিতাকে খুঁজতে নিকেকেই হারিয়ে ফেলে পার্টির কর্মকাণ্ডের মাঝে।

রাতের অন্ধকারে গ্রামকে গ্রাম পার্টির লোকজন সাথে নিয়ে মহম্মদ এবার পায়ে হাঁটতে থাকে। হাঁটার ভিতর দৃঢ় এক সাংগঠনিক ভঙ্গিমা ধরে রাখতে একে অন্যের পিছে পিছে হাঁটে। যাতে করে সামনে বা পিছনের কেউ দূর থেকে দেখলে একজন মাত্র হেঁটে যাচ্ছে বলে সহজেই ভুল করতে পারে। অন্ধকারে পথ দেখতে টর্চটাকে জ্বালালে সামনের মানুষটি তার ডান বা বাম হাতকে দেহ বা সারির থেকে একটু দূরে সরিয়ে সুইচ টেপে। আলো জ্বলে ওঠে। পার্টির শত্রুকে বিভ্রান্ত করবার বা আত্মরক্ষার এ এক অপূর্ব কৌশল। এই কৌশলের চলন ভঙ্গিমায় তারা গ্রামকে সংগঠিত করতে চায়। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে চায়... শহরের পর শহর দখলে এনে সাম্যের সমাজ কায়েম করতে চায়। এই স্বপ্নে মহম্মদের মনে কোনো দোলাচাল নাই। সে ছুটছে বাস্তব অথবা সপ্নের ভিতর। প্রতিটি মানুষ যে সমাজে পাখিদের মতো নির্ভরতা পাবে– তাই হচ্ছে কমিউনিজম। প্রকৃতির বুকে পাখিরা এক স্বাধীন সত্তা। পাখি সমাজে ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই। শুধু নিজের ক্ষুধা নিবৃতির জন্য যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন ততটুকুই কেবল তারা প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করে। নিজের সন্তান, পরিবার বা আত্মীয়ের চাহিদার অতিরিক্ত কিছুই তারা গ্রহণ করে না। প্রকৃতি তাদের অন্নের ব্যবস্থা করে রেখেছে, বাসস্থানের ব্যবস্থাও তারা প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রে মানুষেরা সমাজের জন্যে সংগঠিতভাবে কাজ করে যাবে। আর মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান নিশ্চিত করবে সমাজ। সেই সমাজের প্রত্যাশায় মহম্মদ গ্রামকে গ্রাম সংগঠিত করার সাধনায় পথ চলছে। এর মধ্যে সে তার কর্মীদের সাথে নিয়ে ফাজেলপুর, দলোহারা, উদোমপুর, মির্জাপুর, ফুলহরি, তাহেরহুদা, কড়াসতি, সাধুহাটি, মধুহাতি পেরিয়ে গেছে। মহম্মদের দ্রুতগতির কৃতিত্বে কমরেড তুজাম তাকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের নেতৃত্বে দিতে চায়। তুজামের মুখোমুখি হয়।

কমিউনিস্টের স্বার্থচেতনা

– তুজাম ভাই, মাত্র দুইদিনের ওই ছেলের এত বড় এলাকার দায়িত্ব দেওয়াডা কি ঠিক হচ্ছে?

– তুই কি ক'তি চাস... সাফ করে ক'

– আমি আর কি কবো... পার্টির এত বড় দায়িত্বটা চালানের জন্যে এট্টা অভিজ্ঞতার অন্তত দরকার ছিল... সেই জায়গা থেকে ভাবাছিলাম পুরোন কর্মীরা থাকতে... মহম্মদরে ওই দায়িত্বখেন দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে... ?

– তালি তুই-ই ক' কোন পুরোন কর্মীকে এই দায়িত্ব দেওয়া যায়...

– কেন... জুলহাস আছে... আমি আছি

কমরেড তুজাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একরামের মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভিতরটা পাঠ করতে চেষ্টা করে। তার মনে পড়ে যায়– মহম্মদকে পার্টিতে আনার কাজটিকে ত্বরিত করে তুলেছিল এই একরাম। আর সেই মহম্মদ ত্বরিতগতিতে পার্টির কার্যমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে... যাতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে বৃহত্তর একটি এলাকার নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু একরাম ! সম্ভবত সে এই নেতৃত্বের বিষয়টি মেনে নিতে পারঠে না। কমরেড তুজাম একটু ভেবে নেয় এবং ব্যাপারটি একটু হালকা করতে বলে ওঠেন–

– তা আছিস... কিন্তু ছেলের চিন্তা-ভাবনা, আর কাম-কাজকে ইট্টু না হয় পরীক্ষা করে দেখি... তুই কি ক'স...

– আচ্ছ...

একরাম পাচা নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে কমরেড তুজামের ভিতরটা প্রথমে নড়ে চড়ে ওঠে। তিনি সেই নড়ন চড়ন থামিয়ে আকুল হয়ে একরামকে ডাক দেন–

– একরাম শোন, আমার কথা শোন, একরাম...

এই ডাকে থমকে দাঁড়ায় না– এমনকি যেতে পথে পিছুন ফিরেও তাকায় না একরাম। সে হন হন করে কমরেড তুজামের কথার অবাধ্য হয়ে চলে যায়। কিন্তু কমরেড তুজাম তথাপি একরামের আকস্মিক অবাধ্যতায় ওলটপালট হতে থাকেন। তিনি মাটির উপর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পানের না– তার পদযুগল ভিতরের অস্থিরতায় সরে সরে যায়– মাথার চুল ছিঁড়ে এইমুহূর্তে দুইহাতে তিনি আকাশে উড়াতে চাচ্ছেন। না, যেইভাবে তিনি স্থির হয়ে দ৭াড়াতে পারছেন না, সেইভাবে তিনি মাথার চুলও আকাশে উড়াতে পারছেন না। আকাশে-বাতাসে-ভূমিতে কোথাও তার নির্ভরতা নাই– স্বস্তি নাই

মহম্মদের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ভাবনা

ঠিক এই মুহূর্তে মহম্মদ এসে 'তুজাম চাচা' সম্বোধন করতেই তার ভেতরের তীব্র ঝড়হাওয়া এক দমকে ছিটকে পড়ে দূরে। তিনি এবার স্বস্তি ফিরে পেয়ে– যেন-বা প্রচ জলস্রোতের উন্মাদনা থেকে মুক্তি পেয়ে– পায়ের নিচে একখ জমিন পেয়ে হাফাতে থাকেন। তার হাফানিতে সহসা মহম্মদের প্রশ্ন জেগে ওঠে–

– তুজাম চাচা, ব্যাপারডা কি?

– কি ব্যাপার?

– ওইভাবে হাফাচ্ছেন যে... কি হয়েছে আপনার?

– না কিছু না... তুমি কি কিছু ক'তি আইচো...

– ওইভাবে হাফাচ্ছেন যে, কি হয়েছে আপনার?

– না, কিছু না... তুমি কি কিছু ক'তি আইচো...

– এট্ট বিষয় আমি কিছুতেই বুঝতে পারতিছিনে তুজাম চাচা–

– কি বিষয়?

– এই যে, যাদের জন্যে আমরা পার্টি করছি– পার্টিতে যাদের কথা সবচেয়ে বেশি কওয়া হচ্ছে– তারা আমাদের কাজে-কর্মে যেইভাবে আসার কথা– সেইভাবে আসছে না কেন?

– আসবে, একদিন ঠিকই আসবে...

– একদিন আসেবা ! কিন্তুক ক্যাম্বা আসবো? আমাদের কথাই যে গ্রামের মানুষ কানে করে না-কাজে-কামে সে গ্রামের মানুষ ক্যাম্বা আসবে?

– এই কথা কচ্ছিস যে?

– হয়, যে কয়দিন পাটি কাম-কাজ করলাম, গ্রামের মানুষ বুঝার চেষ্টা করলাম– তাতে আমার মনে এটা প্রশ্ন এসেছে...

– কি প্রশ্ন?

– গাজীর গানের আসর দেখেছেন?

– হ দেখেছি, তে হয়ছে কি?

– সেই আসরের জন্যে গ্রামের সব মানুষের কিন্তুক জনে জনে দাওয়াত দেওয়া হয় না– আসরে ঢোলের বাড়ি পড়লে গ্রামের সব মানুষ সেই আসরে এমনি জড়ো হয়– সারা রাত ভরে আসর দেখে– আর আমরা পার্টির থেকে জনে জনে ডেকেও লোক জড়ো করতে পারিনে– এই প্রশ্নডাই আমার কাছে মেলা বড় মনে হয়।

– মহম্মদ তুমি সংস্কৃতি এবং রাজনীতিকে এক করতে যাচ্ছো কেন?

– কেন করবো না চাচা ! কাল রাতের বেলা আমি মন দিয়ে গাজীর গান দেখেছি– গাজীর গানের আসরের শুরুতে গাজী-কালুর ফকির হওয়ার কাহিনী নিয়ে ফোকরেপালা হলো– সেই পালায় রাজার ছেলে গাজী-কালু সব চেড়ে-ছুড়ে যে ফাকির হয়ে গেল– এখানে আমি আমাদের সমাজতান্ত্রিক সর্বহারা রাজনৈতিক চেতনাকে আবিষ্কার করেছি– কও তো চাচা এইভাবে যদি আমরা আমাদের রাজনীতিকে গান বা সংস্কৃতির দাস বানাতে পারি– তাহলে, তাহলে কি আমরা সহজেই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না...

– বড় ভাবনার কথা ক'লিরে মহম্মদ... এইভাবে তো ভাবি নাই কোনোদিন

– চাচা, এখন হতে আমাদের একথাও ভাবতে হবে...

– অবশ্যই...

মহম্মদ আজ জবর কথা বলেছে– রাজনীতিকে হতে হবে সংস্কৃতির দাস। তা না হলে রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভব নয়। মহম্মদ তো ঠিকই বলেছে– একটি স্থানের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক রুচি না বুঝে সেই স্থানে রাজনৈতিক বিপ্লব আনা দুরাশা মাত্র। তার চেয়ে সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক সংগতি প্রতিষ্ঠা করেই বিপ্লবকে ত্বরিত করা যেতে পারে..। যেই স্থানের মানুষ ঐতিহ্যিক-ঐতিহাসিক সূত্রেই ভাবুক সংস্কৃতির– সেইস্থানে বস্তুবাদীনীতিকে সফল করতে হলে অবশই সেই বস্তুবাদীনীতিকে ভাবুক প্র[illegible]য়ির অনুশাসন মেনে যথাযোগ্য সংশ্লেষণে যেতে হবে। তবেই সে বস্তুবাদীনীতি ভাবুক সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, নতুন নয়। যে স্থানের অস্ত্র হচ্ছে– সাধুর সুমিষ্ট বাণী গায়েনের সুমধুর সুর, বাদকের বাদ্যযন্ত্র আর ভক্তের ভক্তি। সে স্থানে আগ্নেয় অস্ত্রের লীলার পরিবর্তে সুর-তাল-বাণী আর ভক্তি অস্ত্রের ব্যবহারই কি যথেষ্ট নয়! মহম্মদ কি এই ভূ-খণ্ডে সেই ভাবান্দোলনের স্বপ্নই দেখতে শুরু করেছে? এই জিজ্ঞাসার ভিতর মহম্মদ নতুনভাবে ধ্যানস্থ হতে চায়।

কমিউনিস্টের আত্মবিরোধ

আর ওইদিকে একরাম তখন জুলহাসকে কাছে পেয়ে শোনাতে চায় অন্যকথা

– পার্টির জন্যে আমি কি-না করেছি... ! জুলহাস, সেই পার্টির কাছে আজ আমার কথার কোনো দাম নাই ।

– ক্যা, কি হয়েছেরে?

– কি আর হবে..কমরেড তুজাম, তুজাম ভাই, তার কথা তো কুরানের বাণী... সে যা ক'বি তা-ই মেনে নিতে হবে... তাই তো? কিন্তুক আজ আমি তার কোনো কথা-ই মানবো না... তুই কি থাকবি আমার সাথে... ক' থাকবি না-কি?

– আহা তোর কথার আগা- গোড়া কিছুই বুঝতে পারতিছনে... ইট্টু ভেঙে ক...

– আমি খাল কেটে কুমির আনিছি...

– তার মানে?

– মানে খুব সোজা– যে মহম্মদরে এই সেদিন পার্টিতে ভিড়ালাম আমি... সেই মহম্মদ আজ আমার এলাকার লিডার– কমরেড তুজাম তারে এই দায়িত্ব দেছে... একবার ভেবে দেখ পার্টির কাছে আমাদের দাম কত? এতদিন পার্টির পাছে আছি– পার্টির কাম-কাজ করিছি তার দাম কত– দেখলি তো! আমি আর তুজাম ভাই'র সাথে নাই– তোর ইচ্ছে হলে আমার সাথে আসতে পারিস...

– আমারে ইট্টু ভা'বে দেখতে দে...

– থো তোর ভা'বে দেখাদেখি... বুঝতে পারিছি... ! যা... যা তোর দরদী নেতা কমরেড তুজামের কাছে... তোর মতো ভা'বে দেখার লোক আমার দরকার নাই... আমার আমিই যথেষ্ট– যা... আমার সামনেরতে...

– তুই কি পাগল হয়েছিস একরাম– !

– হ' হ' আমি পাগল... ! আর যত বুদ্ধি ওই কমরেড তুজামের না?

– কথাডা তা না!

– তা'লি কি?

– শোন একরাম– তোর বিষয়ডা একবার তুজাম ভাইরে বুঝায়ে কওয়া দরকার...

– আমার আর কোনো দরকার নাই... তোর দরকার হলে তুই-ই ক'গা...

– আচ্ছা... কোনো কথা-ই যখন মেনে নিচ্ছিস নে– তখন আমি-ই যাই...

– যা...

জুলহাসকে এইভাবে উত্তেজনাময় এতকথা বলা কি ঠিক হল? একরাম কিছুক্ষণ এই দ্বিধায় দুলে ওঠে । আর বেশ দ্রুত পায়ে জুলহাস পৌঁছে যায় কমরেড তুজামের কাছে–

– তুজাম ভাই, একটা কথা বুঝলাম না– একরাম কচ্ছিল...

– একরামের সাথে তোর দেখা হয়েছে?

– হয়, হয়েছে... একরাম কচ্ছিল...

– কি কচ্ছিল?

– মহম্মদরে পার্টিতে ভিড়ায়ছে না-কি একরাম...

– আর কি কয়ছে?

– একরাম আর আমাদের সাথে মানে তোমার সাথে নাই...

– তার মানে ওকি পার্টির মুদি ভাঙন ধরাতে চায়... ?

– তাই তো মনে হলো– আমারে ওর সাথে থাকতি কচ্ছিল...

– তুই কি ক'লি?

– আমি কিছুই কই নাই... ।

– তোর কি ইচ্ছে আছে– আমারে ছেড়ে যাবার... ওর সাথে যোগ দেবার?

– আরে দূর... পাগল হলে না-কি !

– না, তুই সত্যি করে ক'...

– সত্যি করেই ক'চ্ছি– তোমার ছাড়া আমি নাই কোনো জা'গা...

– আচ্ছা, শোন তা'লি... একটা গোপন কথা তোরে কওয়া হয় নাই... একরাম ঠিকই কয়ছে– মহম্মদরে ও-ই কিন্তুক পার্টিতে ভেড়াতে সাহায্য করেছে...

– কিন্তুক আমি তো জানি– মহম্মদ ওর বাপের খোঁজে পার্টিতে এসে– থা'কে গেল...

– তোর জানাডাও ঠিক...

– তার মানে?

– একরাম মহম্মদের বাপরে জ্যান্ত মাটিচাপা দিয়ে মেরেছে... ওই যে মহম্মদ যেদিন বাপের খোঁজে আমার কাছে এলো– সেদিন তোরে ডেকে তোর কাছে মোসলেমের কথা জিজ্ঞেস করলাম– তোর মরে আছে– তুই একজনরে আন্ধারে নিয়ে যাওয়ার কথা ক'লি আগে-পাছে দুই জন করে মোট চার জন লোক– সেই লোকডারে অন্ধকারে ধরে নিয়ে যাওয়া দেখেছিলি... সেই লোকডা ছিল মোসলেম আর ওই চার জনের লিডার ছিল একরাম... ওই রাতে-ই তারা মোসলেমকে মাটিচাপা দিয়ে মেরে ফেলে... তার কয়দিন পরেই মোসলেমের খুঁজতে মহম্মদ এলো...

– না, তবে আজ মনে হচ্ছে– কথাটা মহম্মদকে জানানোর সময় হয়েছে...

– ঠিক কয়ছো... পার্টিতে ভাঙন ধরানের আগেই এইকামটা করে ফেলতে হবে...

– মহম্মদ দুধসর গেছে নওসের গায়েনের কাছে... পার্টির কাজ-কামে ও আজকাল গান-বাজনা মেশাতে চাচ্ছে– ব্যাপারটার মুদি একটা চমক আছে– কিন্তু আমি ভেবে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছিনে... তুই দুধসর যেয়ে মহম্মদের কাছে মোসলেমের মাটিচাপা দেওয়ার ঘটনাটা কবি... একরাম-ই যে মোসলেমকে মাটিচাপা দেছে– এই কথাখেন খুলে ক'বি... কিন্তুক সাবধান একরামের পার্টি ছেড়ে যাওয়ার কথাখেন প্রকাশ করবি না ।

– ঠিক আছে, সে কথা আর কওয়া লাগবে নানে...

কমিউনিস্টের গাজীর গান শিক্ষা

কমরেড তুজামের কথায় জুলহাস যখন দুধসর গ্রামে পৌঁচ্ছে– তখন নওসের গায়েনের খুলাটে গাজীর গানের মহড়া চলছে। সেই মহড়াতে মহম্মদ গায়েন নওসেরের কাছ থেকে গানের দিক্ষা নেবার চেষ্টা করছে। ফোকরেপালায় গাজী-কালু ফকির হবার আগে মায়ের কাছে বিদায় নিতে এসে মহাসঙ্কটে পড়েছে– তাদের মা কিছুতেই তাদের বিদায় দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দুই ভাই যুক্তি এটে ছলনায় মাকে ঘুম পাড়িয়ে বিদায় নিতে চেয়েছিল। কিন্তুক মা যখন ঘুমিয়ে পড়ে গাজী তখন শেষবারের মতো মাকে ডাকার আকুলতা ব্যক্ত করে ডাকতে থাকে–

– মা, ও জননী মা, মা গো, তোমার দুটি সন্তান চলে যাচ্ছে– মা গো তুমি একবার নয়ন মেলে চেয়ে দেখো জননী– একবার নয়ন মেলে চেয়ে দেখো–

গা তোলো গা তোলো মা গো
ও মা নয়ন মেলে চেয়ে দেখো
গাজী-কারু ফকির হলো
গা তোলো গা তোলো মা ॥...

পিতৃহত্যাকারীর সন্ধান লাভ

– মহম্মদ...

– জুলহাস চাচা, আপনে !

– হয় আমি, ইট্টু এইদিকে আসো

– কি ব্যাপার?

– তোমার বাপের হত্যাকারী সন্ধ্যান মিলেছে... তুজাম ভাই আমাদের পাঠায়েছে...

– তাকে তা'লি হত্যা করা হয়েছে... কিডা সেই হত্যাকারী... ?

– নামডা তুজাম ভাই'র মুখে শোনা-ই ভালো...

– না, আপনি যদি জেনে থাকেন– আপনিই ক'ন– কিডা?

– সে আমারে মা'রে-কা'টে ফেলালেও এখন আমি ক'তি পারবো না... তার চেয়ে চলো তুজাম ভাই'র কা'ছ চলো...

– চলেন, জলদি চলেন...

মহম্মদ যেন আজ উড়ে হেঁটে চলে। এতে মাটিতে বা ধুলায় তার পদযুগলের স্পষ্ট কোনো ছাপ পড়ে না। তার পিছে জুলহাস তাই হাঁটার পরিবর্তে দৌড়ে চলতেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে। হেঁটে-দৌড়ে তারা কুব কম সময়েই কমরেড তুজামের আস্তানায় পৌঁছে যায়। কমরেড তুজামকে কথা বলে উঠার কোনো সুযোগ না দিয়েই মহম্মদ কথা বলে ওঠে–

– যা শুনছি– তা কি সত্যি– আমার বাবাকে না-কি হত্যা করা হয়েছে?

– হ' সত্যি।

– কিডা সেই হত্যাকারী?

– ক্যা, জুলহাস তোমাকে কয় নাই?

– না তুজাম ভাই, আমি ক'তি পারি নাই... মহম্মদের আগুন মুরতি দেখে– আমি ক'তি পারি নাই...

– বলেন– চাচা, সে কিডা?

– ওই যে একরাতে আগে-পাছে দুই জন করে মোট চার জন লোক এক জনকে বেঁধে নিয়ে যেতে দেখেছিল জুলহাস– সেই একজনা হচ্ছে– মোসলেম, আমি খোঁজ পাইছি– ওই চার জনের লিডার ছিলো একরাম– সে-ই মোসলেমের মাটিচাপা দিয়ে মেরেছে–

– আহ্ চাচা... একি শোনালেন... এত আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই... তবু এও যদি সত্যি হয়... তে সংবাদখেন আমার সইে নিঃসন্তান দুঃখিনী মাকে জানানো দরকার... সে-ই তো আমাকে বাবাকে খুঁজতে পাঠিয়েছে... সংবাদটা আমার পরে তার-ই শোনার বেশি দরকার...

– জুলেখা বাবির কথা কচ্ছো... তার কাছে এখনই আমি সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করতিছি...

– না, এ হয় না! তুমি একা যাবে না!

– ক্যা হয় না? খুঁজতে যাকে একা একাই আইছি... তার মৃত্যু সংবাদটাও আমি একা-ই বহন ক'রে নিয়ে যেতে চাই... আমার সাথে কেউ যাবেন না...

– কেউ না যাক, আমি যাই...

– না, আপনিও না... আপনাদের...

মহম্মদের মোসলেম হয়ে উঠা এবং আশ্রয় প্রার্থনা

মহম্মদ তার মুখের কথা শেষ করতে পারে না– কিন্তু তার বুকের ভেতর কিংবা মাথার ভেতর ঠিক ঠিকই উচ্চারিত হতে থাকে– অসমাপ্ত কথামালা 'আপনাদের স্বরূপ আমার জানা হয়ে গেছে– যে পার্টি ছিল এক সময় বাবার আশ্রয়– সেই পার্টিই তবে বাবাকে হত্যা করেছে– আর আমিও সেই পার্টিতে বাবাকে খুঁজতে এসে– বাবাকে খোঁজার কথা ভুলে গিয়ে– পার্টির কাজেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম– কিন্তুক শেষে এই জানতে পারলাম পার্টি আমার সাথে ছলনা করেছে– পার্টি আজ এতদিন পরে– কেনে আমার পিতা হত্যার গুপ্ত রহস্য ভাঙছে– নিশ্চয়, এর মধ্যেও গোপন কোনো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে... আপনাদের সাথে আমি আর নাই... আমার এখন একটাই দায়– জুলেখা বিবির কাছে এই সংবাদটি পৌঁছে দিয়ে– পুরোপুরি পেয়ে না পাওয়র বেদনাটা গানের সুরে সুরে ভুলে থাকবো... ।' এইসব ভাবতে ভাবতে মহম্মদ পৌঁছে যায় জুলেখা বিবির অন্দরমহলে।

জুলেখা! মোসলেমের প্রতীক্ষায় থেকে হয়ে উঠেছে যেন মোসলেমেরই দমাগ্রস্ত। সেই মোসলেমের দশাগ্রস্ত জুলেখাবিবি অন্দরমহলে নির্বাক মহম্মদের মুখে চেয়ে

প্রত্যাশিত মোসলেমের মুখে দেখে তাই হয়তো ভ্রম করে বসলেন– । বিহ্বলতায় মোসলেম ভেবে মহম্মদকেই আগলে ধরলেন– । মহম্মদ তখনই এই বিহ্বলতার সঠিক অনুবাদ করতে পারে নাই– সে বুঝেছে– এর ভিন্ন অর্থ– সে ভাবে জুলেখাবিবি নির্বাক তাকে দেখে বুঝে গেছে– মহম্মদ তার স্বামীকে খুঁজে পায় নাই... অথবা মোসলেম বেঁচে নাই... জুলেখাবিবির বিহ্বলতাকে ভিন্ন অর্থে এভাবেই গ্রহণ করে নিয়ে মহম্মদও বিহ্বল হয়ে ওঠে–

– না, আমি পারলাম না তাকে খুঁজে বের করতে... ফিরিয়ে আনতে... তাকে ওরা মাটিচাচা দিয়ে হত্যা করেছে...

– নাহ...

বিহ্বল মহম্মদের এমনই প্রলাপ শুনে জুলেখাবিবির বিহ্বলতা আরেক মাত্রা পায় । তিনি প্রথমে চিৎকার করে মহম্মদের কথার প্রতিবাদ করেন 'নাহ' । তারপর থির হয়ে মহম্মদের চোখে চোখে চেয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রোপণ করে বলতে থাকেন–

– এই তো তার চোখ... আন্ধারে তারার মতো জ্বলজ্বল করছে...

অকস্মাৎ তিনি মহম্মদের একটি হাত আগলে ধরে পরের কথাটি এবং পর্যায়□মে মাথা, চিবুক, কাঁধ, বুক... তামাম দেহটাকে ধরে মহম্মদের দেহটাকে মোসলেম বলেই প্রতিষ্ঠা দেন–

– এই হাত তার, এই মাথা, মুখ, ঠোঁট, কাঁধ, বুক... দেহ সব তার... এই তো আমি তার গন্ধ খুঁজে পাচ্ছি... আমি তাকে পেয়ে গেছি...

মহম্মদ মুহূর্তে মোসলেম হয়ে ওঠে । মুহূর্তে তার হাতের মুঠোয়, দেহের নিচে একটি মাঠ, একটি দিগন্ত ভেঙেচুরে পড়ে... তার মনে হয় সে কোথাও এক সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে ভেঙে □মাগত কূলে ভিড়তে চাচ্ছে... কূল তার মেলে না... মিলবে মিলবে করে সেই কূল কেবল দূরে মনে হয়... সে প্রাণপণে সাঁতরে চলছে... কিংবা উড়ে চলছে মহাজাগতিক শূন্যতায়... এক নতুন গ্রহ কিংবা এক নুতন নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে আজ তার অসমাপ্ত ঘূর্ণন– কিছুতেই থামতে চায় না... কিন্তু অকস্মাৎ তার দেহ ভেঙে গেল, পাখা খুলে গেল... আর সে ক্ষণভঙ্গুর বস্তুকণার মতো ছিটকে পড়ল– সমুদ্রে নয়, শূন্যতায় নয়– ভূমিতে... এইবার তার বোধ ফিরে এলো... মোসলেম থেকে সে অনেক দূরে ছিটকে পড়ল– সে আবার মহম্মদ হয়ে উঠল...

– এ আমি কি করলাম... এই দুনিয়ায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো এখন... কোথায়. আহ্ লজ্জা... এ-কি করলাম আমি... বুক মাথা আমার ছিঁড়ে-ফুড়ে কটে পড়তে চাচ্ছে... আহ্-কষ্ট... এই কষ্ট আমি কারে কবো... উহ্ লজ্জা... যা চাইনে তা-ই খালি পাই... এ কেমুন কথা... ভেবেছিলাম– সুরে... গানের সুরে সুরে কষ্ট ভুলে থাকবো... না... এই কষ্ট নিয়ে আমি আর মানুষের ভিতর সুর সাধনা করতে পারবো না... আমার সকল শক্তি আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে... বুকে আমার যে কষ্টের ভার... সেই কষ্ট শুধু ভুলে ভরা... আমি এই কষ্ট সরানোর শক্তি চাই... পরম শক্তি... বল আকাশ, বল বাতাস, বল

নদী সেই শক্তি কোথায়... কোথায় গেলে আমি আমার বুকের ভার আস্তে আস্তে সরিয়ে দিতে পারবো– কোথায় সে-ই স্থান... ?

সে কি বন-জঙ্গল, অরণ্য কিংবা নির্জনতা? মহম্মদের সহসা মনে পড়ে যায়– আরেক মহম্মদের কথা– যিনি হযরত-তিনি তো তারই বয়সে হিরাগুহায় চলে গিয়েছিলেন । যদিও অসম বয়সী বিবাহ তার জীবনের ঘটে নাই... কিন্তু অসম সহবাসে বুঝি-বা সে বিপন্ন বলেই তার আজ তাঁর কথা মনে হয় । আজ তার আরও মনে হয় গৌতম বুদ্ধের কথা, শ্রীরামচন্দ্রের কথা– যারা তারই বয়সে স্বেচ্ছায় বনে চলে গিয়েছিলেন । অকস্মাৎ তার মন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে-সেও অরণ্য-নির্জনতার চলে যাবে । আর একথাটি নিয়েই গায়েন নওসেরের সাথে তার বিতর্ক শুরু হয় ।

॥ ইতি মহামানবসংহিতা নাম নাট্যকাব্য ॥

রচনাকাল : ১৯৯৯-২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

উৎসর্গ : আমার মা আমেনা

শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী'র
আত্মজীবনী 'আমার কথা' ও 'আমার অভিনেত্রী জীবন' অবলম্বনে

বিনোদিনী

প্রসঙ্গকথা : তোমার গান মা তোমার বাদ্য উপলক্ষ আমি...

'বিনোদিনী'র পাণ্ডুলিপি রচনায় আমার মানসচক্ষে ভর করেছিল বিনোদিনীর সেই প্রতিভাময়ী ও বিস্ময়কর অভিনয়শিল্প। আমি অন্তর উন্মিলিত করে দেখতে পেয়েছি– আমাদের শ্রীবিনোদিনী দাসী একই মঞ্চে অভিনয় করছেন মেঘনাদবধ কাব্যের সাত সাতটি নারী চরিত্রে, একই কাব্যাভিনয়ের একই মঞ্চে সত্তার ভেতরের কোনো এক ঐশ্বরিক শক্তির গুণে একই বিনোদিনী হয়ে উঠছেন কখনো প্রমিলা, কখনো সীতা, কখনো চিত্রাঙ্গদা ইত্যাদি– কি নন তিনি! সেই একই বিনোদিনী আবার অন্যত্র অন্যসময়ে অন্যমঞ্চে অভিনয় বিশ্বাসে দর্শকের কাছে হয়ে উঠছেন মনোরমা কিংবা বৈষ্ণব শিরোমণি ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব।

যার অভিনয় দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নেচে গেয়ে উঠলেন– 'হরি গুরু। গুরু হরি'। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর যুগল হাত এসে বিনোদিনীর মাথা উপর আশীর্বাদ হয়ে উঠলো– 'মা তোর চৈতন্য হোক।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস-সমূহের নারী চরিত্রগুলোও বাস্তবে প্রাণ পেয়েছিল বিনোদিনীর অভিনয়গুণে– স্বয়ং বঙ্কিমবাবুর মুখ থেকে এ স্বীকৃতি মিলেছে বিনোদিনীর জীবনে। এমনকি গিরিশ চন্দ্র ঘোষের নাট্যকৃতীর মূলেও ছিলেন বিনোদিনী। এই নাট্য রচনায় সেই নন্দিনী বিনোদিনীই আমার মনে মোহ জাগিয়ে দিল।

আমি এইবার অন্তর উন্মিলিত করে দেখতে পেলাম বিনোদিনীর সমগ্র অভিনয়শিল্প (মেঘনাদবধকাব্য, চৈতন্যলীলা, মৃণালিনী, নীলদর্পণ ইত্যাদির অভিনয়) এবং একই সঙ্গে বিনোদিনীর জীবনাভিজ্ঞতাকে মঞ্চ প্রকাশ করছেন মঞ্চপ্রাণ আমাদের কালের মঞ্চকুসুম শিমূল ইউসুফ। আমার বিশ্বাস– এই নাট্য দর্শনে যে কোনো দর্শকই বলতে বাধ্য হবেন– একমাত্র তিনিই সম্ভব করতে পারেন আমাদের অতীত দিনের বিনোদিনী মহীয়সীর মঞ্চজীবনকে আপনার জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে-মিলিয়ে প্রকাশ করতে।

শতবর্ষেরও অধিকাল আগে নারী অভিনয়শিল্পী হিসেবে বিনোদিনী বাংলার মঞ্চে এসেছিলেন এক রক্ষিতা পরিবার থেকে, তারপর বাংলার নাট্যমঞ্চকে সমাজের চোখে সম্মানজনক স্থানে তুলে দিয়ে পুরুষ ও তৎকালের অভিজাত মানবসমাজ কর্তৃক প্রতারিত হয়ে আত্মাভিমানে মঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন দূরে– বহু দূরে। কিন্তু বাংলার নাট্যমঞ্চ তার অভিনয়গুণে যে মর্যাদার আসন লাভ করে– তারই প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে বাংলার নাট্যমঞ্চে নারীদের অনুপ্রবেশ সহজ হয়ে ওঠে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নাট্যমঞ্চে অভিজাতকুলের নারীদের অংশগ্রহণও দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু মঞ্চাভিনেত্রী নারীদের সেই শতবর্ষ পূর্বকৃত অধিকার বঞ্চনার চিত্র বা

একেবারে ভিতরে অন্তরক্ষত কি পরিবর্তিত হয়েছে? বিনোদিনীর অভিনয় উদ্যোগে আমাদের মনে হয়েছে– সে চিত্র এবং অন্তরক্ষত আজ শতবর্ষে পরেও তেমনভাবে পরিবর্তিত হয় নি। এই নাট্যে তাই আমরা বিনোদিনীর নিজের কথার বাইরে আলাদাভাবে বাড়তি কোনো বক্তব্য যুক্ত করতে যাই নি।

'বিনোদিনী'র পাণ্ডুলিপি রচনায় এনাট্যের মুখ্য উপদেষক আচার্য সেলিম আল দীন এবং নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফের পরামর্শে আমাকে দিনের পর দিন বিনোদিনীর স্বরচিত ভাষা ও চিন্তার মধ্যে বসবাস করতে হয়েছে।

'বিনোদিনী' রচনায় একই সঙ্গে শ্রীমতি বিনোদিনী দাসীই আমার মা এবং তিনিই আমার সন্তান। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি কথা মনে হচ্ছে যে– বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের পালাগানের দেবীবন্দনায় গাওয়া হয়ে থাকে– 'তোমার গান মা। তোমার বাদ্য। উপলক্ষ আমি... ।' এই নাট্য রচনায় মূলত এই কথাটিই শ্রীমতি বিনোদিনী দাসীর প্রতি আমার দেবীবন্দনা। এই বন্দনা এই নাট্যের সকল কলাকুশলীর সঙ্গে নাট্যের একক অভিনয়শিল্পী শিমূল ইউসুফ এবং নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ, এমনকি মুখ্য উপদেষক সেলিম আল দীনের জন্যেও সত্য হয়ে থাক। জানি– এমনই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তিনি এতদিনে আমাদের প্রকৃত ভক্তি ও সম্মান লাভ করবেন।

বন্দনা

মাগো মা জননী! তব প্রণমি চরণে।
কি লিখেছি মাতা তুমি বুঝে দেখ মনে॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি সংসার ভিতর।
তনয়ার পূজা মাগো আদরেতে ধর॥
ভালো মন্দ সমভাব নিকটে তোমার।
স্নেহের তুলনা মাতা কিবা আছে আর॥
জননী! হইলে মাতা এমন কি হয়।
আমার মায়ের মতো আর কেহ নয়॥
কোথায় কি আছে মাতা জানিতে না চাই।
বাসনা কল্পনা বনে সদাই বেড়াই॥
তুলিয়া যে বনফুল অতীব যতনে।
বাকরাণী সনে তোমা পূজি দুই জনে॥
তাতে যেন তব সম তুষ্ট হন বাণী।
এই আশীর্বাদ তুমি করো গো জননী॥

পালা শুরু

মহাশয়! বহু দিবস গত হইল, সে বহুদিনের কথা, তখন মহাশয়ের নিকট হইতে এরূপ অজ্ঞাতভাবে জীবন লুকায়িত ছিল না। আজ তাহা আবার প্রকাশ পাইবে। কেননা, এতদিন পর আমার প্রতি আপনাদের অশেষ স্নেহ দেখিতে পাইতেছি, এই নিমিত্ত সাহস করিয়া আদ্যোপান্ত বলিতেছি। কৃপা করিয়া শুনন!... শুনিবেন কি?

আমার জন্ম কলিকাতা মহানগরীর সহায় সম্পত্তিহীন বংশে। তবে দীন দুঃখী বলা যায় না, কেন না কষ্টে-শ্রেষ্ঠে একরকম দিন গুজরান হইত। তবে বড় সুশৃঙ্খল ছিল না, অভাব যথেষ্টই ছিল। আমার মাতামহীর একখানি নিজ বাটী ছিল। তাহাতে খোলার ঘর অনেকগুলি ছিল। সেই খোলার ঘরে কতকগুলি দরিদ্র ভাড়াটিয়া বাস করিত। সেই আয় উপলক্ষ করিয়াই আমাদের সংসার নির্বাহ হইত।...

যখন আমার নয় বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় আমাদের বাটীতে একটি গায়িকা আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহ ছিল না, আমার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে কন্যাসদৃশ স্নেহ করিতেন। তাহার নাম গঙ্গা বাইজী। তখনকার বালিকা-সুলভ-স্বভাববশত তাঁহার সহিত আমার 'গোলাপফুল' পাতান ছিল; আমরা উভয়ে উভয়কে 'গোলাপ' বলিয়া ডাকিতাম।

গঙ্গা বাইজীর নিকট গানের দিক্ষা ও থিয়েটারে প্রবেশ

পারিবারিক কারণে পিতৃপরিচয়হীনা আমি যখন বাড়িয়া উঠিতেছি, তখন আমার মাতামহী গঙ্গা বাইজীর নিকটে আমাকে গান শিখিবার জন্যে নিযুক্ত করিলেন। তখন আমার বয়ঃ□ম ৭ বা ৮ বৎসর। সেসময় গঙ্গামণির ঘরে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া দুইটী ভদ্রলোক তাঁহার গান শুনিবার জন্য প্রায়ই আসিতেন; শুনিতাম তাঁহারা নাকি নাটকের লোক। তাঁহারাই একদিন আমার মাতামহীকে ডাকিয়া বলিলেন যে,– 'তোমাদেরও বড় কষ্ট দেখিতেছি তা তোমার এই নাতনিটিকে থিয়েটারে দিবে? এক্ষণে জলপানিস্বরূপ কিছু পাইবে, তারপর কার্য শিক্ষা করিলে অধিক বেতন হইতে পারিবে।'

আমার দিদিমাতা রাজি হইলেন। তখন পূর্ণবাবু আমাকে সুবিখ্যাত 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' দশ টাকা মাহিনাতে ভর্তি করিয়া দিলেন। তখনকার দিনের দশ টাকা এখনকার হিসেবে কিন্তু অনেক টাকা। সে যাহাই হউক, সেই সময় হইতে আমার নূতন জীবন গঠিত হইতে লাগিল। সেই বালিকা বয়সে, সেই সকল বিলাস বিভূষিত লোকসমাজে সেই নূতন শিক্ষা, নূতন কার্য, সকলই আমার নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, তবে যেরূপ শিক্ষা পাইতাম, প্রাণপণ যত্নে সেইরূপ শিক্ষা করিতাম। সাংসারিক কষ্ট মনে করিয়া আরও আগ্রহ হইত। এক্ষণে ইহা যদি আরও ভাঙিয়া বলি, তবে দাঁড়ায়– মাতার জ্বালাময় জীবন-স্মৃতি-ই আমাকে খুব ত্বড়িতভাবে থিয়েটারের সঙ্গে বাঁধিয়া নিল, আর পরবর্তীতে এই থিয়েটারের বন্ধুগণ-ই হইলেন আমার জীবনের মধুবাক্যের সঙ্গী। অথচ কি আশ্চর্য– আমার সেই মধুময় বাক্যের থিয়েটারের সঙ্গীগণও এখন আমার এই জীবনের স্মৃতি হইয়া গিয়াছেন। স্মৃতি কি আশ্চর্য বস্তু, না? মধুর দিন একসময় স্মৃতি হইয়া বেদনা জাগায়, না? হ্যাঁ, এই স্মৃতি চরিত্র নিয়া আমার একখানি পদ্য আছে–

স্মৃতির বিষম জ্বালা সহি অনিবার।
মধুময় বাক্যে তোষ আর একবার॥
ফুলের সুবাস সহ কোথা গেছ ভেসে।
ঘুমঘোরে আছ কোন জোছনার দেশে॥
দূর কাননের কোলে পাখি যেন গায়।
সেইরূপ স্মৃতি মম তোমারে জাগায়॥

প্রথম অভিনয়

আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ি ছিল, তাহাতে রিহার্সাল হইত। সে স্থান বড়ই রমণীয় ছিল, একেবারে গঙ্গার উপরে বাড়ি ও বারান্দা, নিচে গঙ্গার বড় বাঁধান ঘাট; দুইধারে অন্তিমপথ যাত্রীদিগের বিশ্রাম ঘর। সেই বালিকা কালের সেই রমণীয় ছবি দূর স্মৃতির ন্যায় এখনও আমার মনোমধ্যে

জাগিয়া আছে, কেমন করিয়া গঙ্গা কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইত। আর আমি সেই টানা-বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম। আমার মনে কত আনন্দ, কত সুখ-স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিত।... সকলে বলিত যে,– 'এই মেয়েটিকে ভালো করিয়া শিক্ষা দিলে বোধ হয় কাজের লোক হইবে।' সম্ভবত সেই চিন্তা হইতেই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় 'শত্রুসংহার' পুস্তকে একটি ছোট পার্ট দিলেন, সেটি দ্রৌপদীর একটি সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা। তখন বই প্রস্তুত হইলে, নাট্যমন্দিরে গিয়া ড্রেস-রিহার্সাল দিতে হইত। যেদিন উক্ত বই-এর ড্রেস-রিহার্সাল হয়, সেদিন আমার তত ভয় হয় নাই। কেননা, রিহার্সাল বাড়িতেও যাহারা দেখিত, সেখানেও প্রায় তাহারাই সকলে এবং দুই চারিজন অন্যলোকও থাকিত।

কিন্তু যেদিন পার্ট লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে স্টেজে বাহির হইতে হইল, সেদিন হৃদয়ভাব ও মনের ব্যাকুলতা কেমন করিয়া বলিব। সেই সকল উজ্জ্বল আলোকমালা, সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল, আর বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, পা দুটিও থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আর চক্ষের উপর সেই সকল উজ্জ্বল দৃশ্য যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলিয়া মনে হইতে লাগিল।...

আমি উইংসের পাশে দাঁড়াইয়া আছি, পাও কাঁপিতেছে, কি বলিবো, কি করিবো,– ভুলিয়া গিয়াছি। একবার মনে হইল আর স্টেজে যাইয়া কাজ নাই, ছুটিয়া পালাই। এইরূপ অবস্থায় উইংসের পাশে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে আমি কাঁপিতেছি, সেসময়ে হঠাৎ ধর্মদাসবাবু ছুটিয়া আসিয়া ধাক্কা দিয়া আমায় স্টেজে পাঠাইয়া দিলেন।

আমি দ্রৌপদীকে প্রণাম করিয়া, আমার বক্তব্য বলিয়া গেলাম– ঠিক যেমনটি শিখাইয়া দিয়াছিলেন, সেইভাবে। খুব সাজ-পোশাক-পরা গর্বিতা পাণ্ডব মহীয়সীর সম্মুখে যেমনটি সঙ্কুচিত হইয়া কথা বলিতে হয়, তেমনি সঙ্কুচিত ভাব আপনা-আপনিই আমার হইয়া পড়িলো। একবারও দর্শকের দিকে ফিরিয়া চাইলাম না! কিন্তু তাঁহারা আমার অবস্থা দেখিয়াই হউক আর দয়া করিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কারণেই হউক– আমার বক্তব্য শেষ হইলে খুব হাততালি দিয়াছিল। আমি কোনো রকমে কাজ সারিয়া পিছন হাঁটিয়া ভিতরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ধর্মদাসবাবু আমাকে বুকের মধ্যে লইয়া, আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন– 'চমৎকার হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে...'– ইত্যাদি। আর কত আশীর্বাদ করিলেন।... হাত তালি পাইয়া আর ধর্মদাসবাবুর মুখে 'বেশ হয়েছে' শুনিয়া ভারি আহ্লাদ হইল। ধর্মদাসবাবু বলিলেন– 'যা যা পোশাক ছেড়ে ফেলগে যা।' লাফাইতে লাফাইতে সাজ ঘরে যাইলাম। যেন দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছি। কার্তিক পাল, আমাদের তখনকার 'ড্রেসার'। তিনি বলিলেন– 'আয় পুঁটি, আয়; বেশ হয়েছে।'

মহাশয়, এই আমার অভিনেত্রীজীবনের প্রথম পার্ট– একটি পরিচারিকার। ইহার পরে, কালে, কত রাণী সাজিয়াছি, কত কি সাজিয়াছি; কিন্তু জীবনের প্রথম সুখ-স্বপ্নের মতো– এই 'ছোট দাসী'র পার্টটীর কথা মনে করিতে আজিও কত-না আনন্দ!

সেই প্রথম আনন্দ আমার
অন্তরে আজো কেঁপে ওঠে।
গেছে যে দিন তা যায় নাই মুছে
রয়েছে আমার চেতনায় সমভাবে
চলে যাওয়া সেই দিন ঘুরে ঘুরে এসে
আনন্দে মনেতে ওঠে ভেসে... ॥
সেই প্রথম আনন্দ আমার
অন্তরে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

দ্বিতীয় অভিনয়

কিছুদিন পরে সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই 'হেমলতা' অভিনয় শিক্ষা পাইবার সময় আমার হৃদয় যেন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল- হইয়া উঠিল। আমি যখন কার্য স্থান হইতে বাড়িতে আসিতাম, সেই সকল কার্য আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাবভঙ্গি সকল দেখাইয়া দিতেন, সেই সকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারিদিকে ঘেরিয়া থাকিত। আমি যখন বাড়িতে খেলা করিতাম তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তি দ্বারা সেইদিকেই আচ্ছন্ন থাকিতাম। বাড়িতে মন সরিত না, কখন গাড়ি আসিবে, কখন আমায় লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত। যদিও তখন আমি ছোট ছিলাম, তবুও মনের ভিতর কেমন একটা উৎসাহপূর্ণ মধুরভাব ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার পর যখন আমার শিক্ষা শেষ হইয়া অভিনয়ের দিন আসিল, তখন আর প্রথমবারের মতো ভয় হইল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। সেদিন রাজকন্যার অভিনয় করিব কিনা– তকতকে ঝকঝকে উজ্জ্বল পোশাক দেখিয়া ভারি আমোদ হইল। তেমন পোশাক পরা দূরে থাক, কখনো চক্ষেও দেখি নাই। যাহা হউক, ঈশ্বরের দয়াতে আমি 'হেমলতা'র পার্ট সুচারুরূপে অভিনয় করিলাম।... আমি জানি তখন আমার কোনো গুণ ছিল না, ভালো লেখাপড়াও জানিতাম না, গান ভালো জানিতাম না, তবে শিখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল।

সেই সময় হইতে আমি প্রায় প্রধান প্রধান পার্ট অভিনয় করিতে বাধ্য হইতাম। আমার অগ্রবর্তী অভিনেত্রীগণ যদিও আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের বয়সে সমান না হইলেও অল্পদিনে কাজে তাঁহাদের সমান হইয়াছিলাম।

লক্ষ্ণৌ ও 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে সাহেবদের আক্রমণ

কয়েকমাস পরেই 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটার কোম্পানি পশ্চিম অঞ্চলে থিয়েটার করিতে বাহির হন এবং আমার আর পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে

সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ করেন। পশ্চিমে থিয়েটার করিবার সময় দু-একটি ঘটনা শুনুন– যদিও সে ঘটনা শুধু আমার সম্বন্ধে নয় তবুও তাহা কৌতূহলকর।

প্রথমে গিয়াছিলাম লক্ষ্ণৌ। সেখানকার ছত্রমঞ্জিলে ধর্মদাসবাবু সিন খাটিয়ে এক রকম করিয়া স্টেজ সাজাইয়া নিলেন, সে বেশ দেখিতে হইল। কলকাতার নামজাদা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' অভিনয় করিতে আসিয়াছে শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল, থিয়েটার দেখিবার জন্যে মারামারি পড়িয়া গেল। মস্ত বড় এক বাড়ির মধ্যে আমাদের স্টেজ বাঁধা হইয়াছিল। চারিদিকে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, সমস্ত বাড়িটা লোকে ভরিয়া গিয়াছে, অভিনয়ের সময় বেশ জম জম করিতে লাগিল।

প্রথম দিন 'লীলাবতী'র অভিনয় হইল। তাহার পর একখানি অপেরা–। দুই দিন অভিনয় করিবার পর একদিন বিশ্রাম করিবার জন্যে অভিনয় বন্ধ রহিল।

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে নেমন্তন্ন করিয়া আসা হইল। যত বড় বড় সাহেব মেম এবং সেখানকার আরও যত বড় বড় লোক, সকলে সেইদিন থিয়েটার দেখিতে আসিবেন। তাই স্থির করা হইল– 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিতে হইবে। তখন এই নাটকখানির অভিনয় সবচেয়ে সুন্দর হইত, সবচেয়ে জমিত। সেই নাটকখানি অভিনয় করিবার সময় সকলের সে কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা!

সেদিন বাড়ি একেবারে লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। বড় বড় সাহেব মেম অনেক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, সামনে তাকালেই খালি লালমুখ। তবে বাঙালি খুব কম।

অভিনয় তো আরম্ভ হইল। ক্রমে সেই দৃশ্যটা আসিল– ক্ষেত্রমণিকে ধরিয়া রোগ সাহেব পীড়ন করিতেছে, আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চিৎকার করিতে করিতে বলিতেছে– 'ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, হাত ধরি জাত যায়, ছেড়ে দাও– তুমি মোর বাবা।'

'তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোনো কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।'

রোগ সাহেবের এমত কথায় আর জবর-দখলের মধ্যে ক্ষেত্রমণি তাঁহার নিজেকে প্রাণপণে ছাড়াইয়া নিতে চাহিতেছে। কিন্তু পারিতেছে না। সে বারবার বলিতেছে– 'মোর ছেলে মরে যাবে– মুই পোয়াতি।'

'তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার নজ্জা যাইবে না।' রোগ সাহেব এইবার টান দিয়া ক্ষেত্রমণির বস্ত্র খুলিতে যায়। আর ক্ষেত্রমণি আরও আপ্রাণ দোহাই দেয়– 'ও সাহেব মুই তোর মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও।' এর মধ্যে রোগ সাহেব সুবিধা করিয়া উঠিয়া ক্ষেত্রমণিকে জড়াইয়া ধরিলে ক্ষেত্রমণি চিৎকার দিয়া কাঁদিয়া ওঠে– 'কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো... ।'

এইবার মঞ্চে হঠাৎ তোরাব আসিয়া রোগ সাহেবের গলা টিপিয়া ধরিল এবং হাঁটুর গুতা দিয়া কিল মারিতে লাগিল। অমনি সাহেব দর্শকদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকল সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইল, পিছন হইতে সকল লোক ছুটিয়া আসিয়া ফুট-লাইটের কাছে জমা হইতে লাগিল– সে একটা কি কা ! কতকগুলা লালমুখো গোরা লোক তরওয়াল খুলিয়া স্টেজের উপর লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। আর পাঁ চজনে তাঁহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে কি হুড়োহুড়ি, কি ছুটোছুটি! ড্রপ ফেলিয়া দেওয়া হইল– আমাদের সে কি কাঁপুনি আর কান্না! ভাবিলাম, আর রক্ষে নাই, এইবার আমাদের কাটিয়া ফেলিবে!

ম্যাজিস্ট্রেট তখনই কেল্লায় লোক পাঠাইয়া একদল সৈন্য লইয়া আসিলেন– সে যে কি ব্যাপার তাহা আর কি বলিব! সৈন্য আসিলে গোলমাল কতকটা ঠাণ্ডা হইল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখন ম্যানেজারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কোথায় ধর্মদাসবাবু? চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়িল। কিন্তু তাঁহাকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখিতে পাওয়া গেল যে,– তিনি স্টেজের নিচে একেবারে পেছন দিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কার্তিকপাল তো তাঁহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন– তিনি কিছুতেই উঠিবেন না। তিনি যখন কিছুতেই গর্ত ছাড়িয়া বেরুলেন না, তখন সহকারী ম্যানেজার অবিনাশবাবু অর্দ্ধেন্দুবাবুকে সঙ্গে নিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিয়া দিলেন– 'এখানে আর অভিনয় করে কাজ নেই, পুলিশ সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিমেলদের বাসায় পাঠিয়ে দিন। আজ রাত্রে সেখানে পুলিশ পাহারা দেবে। সাহেবরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকে কাজ নেই।'

অগত্যা সেই রাত্রিতে অভিনয় বন্ধ করিয়া, পোষাক আসবাব বাঁধিয়া ছাঁদিয়া বাসায় এক রকম পলায়ন এবং পরদিন প্রাতেই লক্ষ্মৌ নগর পরিত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়ন!!!

যে ভাবেই হোক সব দিন চলে যায়
সুখ-দুঃখ ফেরাফেরি, যেবা যাহা পায়॥
তথাপি অবোধ মনে, খেলা করে আশা সনে
উঠে, ডুবে, তবু তার সাধ না ফুরায়।
যে ভাবেই হোক সব দিন চলে যায়॥

লাহোরে জনৈক জমিদার কর্তৃক বিবাহ প্রস্তাব

তারপর বোধ হয় আমাদের লাহোরে যাইতে হয়। লাহোরে আমাদের বেশি দিন থাকিতে হয়; সেখানে অনেকগুলি বই অভিনয় হইয়াছিল। আমি নানা রকম পার্ট অভিনয় করিয়াছিলাম। 'সতী কি কলঙ্কিনী'তে রাধিকা, 'নবীন তপস্বিনী'তে কামিনী, 'সধবার একাদশী'তে কাঞ্চন, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে রতা (ফতি?)– কত বলিব। তবে বলিয়া

রাখি যে, সে আমার এত অল্প বয়স ছিল যে বেশ করিবার সময় বেশকারীদের বড় ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইত। আমার মতো একটা বালিকাকে কিশোর বয়স্কা বা সময় সময় প্রায় যুবতীর বেশে সজ্জিত করিতে তাহারা সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতেন– তাহা বুঝিতাম। আবার কখনো কখনো সকলে তামাশা করিয়া বলিত যে– 'তোকে কামার দোকানে পাঠাইয়া দিয়া পিটিয়া একটু বড় করিয়া আনাইব।' কিন্তু না আমাকে কখনো কামার বাড়িতে নিতে হয় নাই, থিয়েটারের পরিশ্রম করিতে করিতে কিভাবে যেন দ্রুতই আমার দেহ গড়ন বাড়িয়া উঠিতে থাকিল, আর আমি অতি কম বয়সেই বালিকারূপ হইতে যুবতীর দেহ সৌষ্ঠব পাইয়া উঠিলাম। আজ সে-কথা থাউক।

লাহোরে যখন আমরা অভিনয় করি, তখন আমার সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেখানে গোলাপ সিংহ বলিয়া একজন মস্ত বড়লোক ছিলেন, তাঁহাকে সবাই রাজা বলিয়া ডাকিত। তাঁহার খেয়াল উঠিল– আমায় তিনি বিবাহ করিয়া জাতে তুলিবেন। মাকে তিনি ৫০০০ টাকা দিয়া দেশে পাঠাইতে চাহিলেন, আর এ কথাও কহিলেন যে,– মা যদি সেইখানে থাকিতে চাহেন, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই; মাসে তিনি ৫০০ টাকা করিয়া দিবেন। মা তো কাঁদিয়া অস্থির, তাঁহার ভয়– তিনি যদি আমায় কাড়িয়া লন। ধর্মদাসবাবু মাকে বুঝাইলেন– 'না গো না, উহারা ভদ্রলোক, উহারা অসদ্ব্যবহার করিবে না। আর আমরাও শীঘ্রই চলিয়া যাইতেছি, ভয় কি!'

আমি সিংজিকে দেখিয়াছিলাম– খুব সুন্দর, কিন্তু তাঁহার মুখে লম্বা দাড়ি! দেখিয়াই ভয় হইত, বালিকা বেলা হইতেই আমি দাড়িওলা লোক মোটেই পছন্দ করিতাম না। হ্যাঁ একটা কথা বলা হয় নাই– সে সময় আমি স্টেজে 'সতী কি কলঙ্কিনীতে রাধিকা সাজিয়া ছিলাম, আর সেই সাজে আমার অভিনয় দেখিয়াই আমাকে তাঁহার বিবাহ করিতে খেয়াল হইয়াছিল। শেষকালে তাঁহার জেদাজেদিকে পাশ কাটিয়া আমরা দ্রুত লাহোর ছাড়িয়া আসিতে চাহি। শেষ অভিনয়ের দিন অর্দ্ধেন্দুবাবু একটি গান বাঁধিলেন, ফিরিয়া আসিবার পথে সেই গানখানি আমরা সকলে মিলিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিয়াছিলাম–

লাহোরবাসী, লইতে বিদায়
দুঃখে প্রাণে ব্যথা নাহি সয়।
আমাদের কান্না ভাসে চোখে
মরি হায়! লাহোরবাসী, লইতে বিদায়।
এসেছিলাম আমরা সবাই দূর পথ হতে
মনে রেখো তোমরা সবাই দূর ভালোবেসে
এই মিনতি রাখি তোমাদের কাছে
হাসি-মুখে পথেরে দাও বিদায়।
লাহোরবাসী, লইতে বিদায়
দুঃখে প্রাণে ব্যথা নাহি সয়॥

বৃন্দাবনে বাদরের কাণ্ড

ফিরিবার সময় আমরা বৃন্দাবন ধাম দিয়া আসিয়াছিলাম। বৃন্দাবন ধামে আবার আমি একটা বিশেষ ছেলে মানষি করিয়াছিলাম। তাহা এই– থিয়েটার কোম্পানি সেইদিন শ্রীধামে পৌছিয়া চল্লিশজন লোকের জলখাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া সকলে মিলিয়া শ্রীজিউদিগের দর্শন করিতে গেলেন এবং আমাকে বলিয়া যান যে,– 'তুমি ছেলে মানুষ, এখনই গাড়ীতে আসিলে, এখন জল খাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাকে। আমরা দেবতা দর্শন করিয়া আসি।'

আমি বাসায় দরজা বন্ধ করিয়া রহিলাম। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমার একটু রাগ ও দুঃখ হইল বটে, কিন্তু কি করিব? মনের ক্ষোভ মনেই চাপিয়া রহিলাম। ঘরের দরজা দিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় একটা বাঁদও আসিয়া জানালার কাঠ ধরিয়া বসিল। আমি বালিকা-সুলভ-চপলতা বশত তাহাকে একটি কাঁকড়ি খাইতে দিলাম, সে খাইতেছে এমন সময় আর দুইটা আসিল, আমি তাহাদেরও কিছু খাবার দিলাম, আবার গোটা দুই আসিল, আমি মনে ভাবিলাম যে ইহাদের কিছু কিছু খাবার দিলে সকলে চলিয়া যাইবে। সেই ঘরের চার পাঁচটি জানালা, আমি যত আহার দিই, ততই জানালায়, ছাদে, বারান্দায় বাঁদরে বাঁদরে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমার বড় ভয় হইল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যত খাবার ছিল প্রায় তার সকলই তাদের দিতে লাগিলাম। আর মনে করিতে লাগিলাম যে এইবারেই তারা চলিয়া যাইবে। কিন্তু যত খাবার পাইতে লাগিল, বানরের দল তত বাড়িতে লাগিল। আর আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাদের □মাগত আহার দিতে লাগিলাম।

ইতোমধ্যে কোম্পানির লোক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল– ছাদ, বারান্দায়, জানালা সব বানরে ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহারা লাঠি ইত্যাদি লইয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া আমায় দরজা খুলিতে বলিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে দরজা খুলিয়া দিলাম।

তাঁহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সকল কথা বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া আমার মা আমায় দুটি চড় মারিলেন ও কত বকিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি যে অত ক্ষতি করিয়াছিলাম, তবু কোম্পানির সকলে হাসিয়া মাকে মারিতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন যে, 'মারিও না, ছেলে মানুষ ও কি জানে? আমাদের দোষ, সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেই হইত!'

অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন,– 'বোকা মেয়ে আমাদের সকল খাবার বিলাইয়া ব্রজবাসীদিগের ভোজন করাইলি, এখন আমরা কি খাই বল দেখি?'

আবার জলখাবার খরিদ করিয়া আনা হইল, তাঁহারা জল খাইলেন। ঐ কথা লইয়া নীলমাধববাবু পরে আমায় দেখা হইলেই তামাশা করিয়া বলিতেন,– 'বৃন্দাবনে গিয়া বাঁদর ভোজন করাবি বিনোদ!'

এই হইল আমার বাল্যকালের নাট্যজীবন।

মেঘনাদবধ কাব্যে একাধিক চরিত্রে অভিনয়

কৈশোরে পদার্পণ করিয়া 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটার ত্যাগিয়া আমি প্রথমে ২৫ টাকা বেতনে 'বেঙ্গল থিয়েটারে' নিযুক্ত হই। এই বেঙ্গল থিয়েটারই আমার কার্যেও উন্নতির মূল; এই স্থানে তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া অভিনয়ার্থে প্রস্তুত হইতেছিল।... অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এই নাটকখানি অভিনয় করতে আমায় বিশেষ মেহনত করিতে হইয়াছিল। প্রথমে আমরা তো তাহার ভাব ও ভাষা ঠিক রাখিয়া ভালো করিয়া পড়িতেই পারিতেছিলাম না। আমাদের মতন অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের পক্ষে ওইরূপ ছন্দ আয়ত্ত করা যে কিরূপ দুরূহ তা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দৃশ্যেই আছে রাবণের বীরপুত্র বীরবাহুর মৃত্যু হইয়াছে। রাবণ শোকাতুর সভায় বসিয়া আছে, তাঁহার মধ্যে আমি চিত্রাঙ্গদা সাজিয়া প্রবেশ করিতাম, সঙ্গে থাকিত সঙ্গীদল। আর আমি পুত্রবিরহিনী মাতা চিত্রাঙ্গদা স্বামী রাবণকে কহিতাম–

চিত্রাঙ্গদা :

'একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুবর কোটেরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখি। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?'

"উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;–

রাবণ :

'এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরী?...
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, ... !
এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব

গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে?"

চিত্রাঙ্গদা :
'দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হে বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব?...
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বলিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে।

ইহার পর পরই রাক্ষসকুলপতি রাবণ শোকে, অভিমানে গর্জিয়া উঠিয়া কহিতেন– 'বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে, আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।' এতক বলিয়া রারণ ও তার বীরেন্দ্রবর্গ যখন সতেজে সাজিতে লাগিল, তখন রণবাদ্যে, শঙ্খে, অসির ঝনঝনিতে আর বীর পদভারে যেন ধরিত্রি কাঁপিয়া উঠিত। আর আমাকে বারুণী সাজিয়া মঞ্চে আসিতে হইত। বারুণী কোমল স্বভাবা নারী চরিত্র। বলিয়া রাখি যে,– আমি উক্ত 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সাতটি পার্ট একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছিলাম। ১ম চিত্রাঙ্গদা, ২য় প্রমীলা, ৩য় বারুণী, ৪র্থ রতি, ৫ম মায়া, ৬ষ্ঠ মহামায়া, ৭ম সীতা। তন্মধ্যে রাম সহচরী-সঙ্গিনী সীতার পার্টটি আমার বেশ মনে আছে। এক্ষণে আমার মানসচক্ষে তাহাই ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে, আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি– লঙ্কায় যখন সীতা বন্দী একাকিনী, তখন সেথায় সরমা সুন্দরী সীতার মনবেদনা শুনিতে আসিলে, সরমাকে নিকটে পাইয়া আমি তাহাকে সীতা হরণ-কাহিনী বলিতাম এইভাবে–

সীতা হরণ-কাহিনী :
'... শুন মন দিয়া,

কহি পুনঃপূর্ব-কথা। মারীচ কি ছলে...
ছলিলা, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুত-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে–
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!'
"সহসা শনিনু, সখী, আর্তনাদ দূরে–
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি;–
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি–
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি!"
"কহিলা সৌমিত্র;– 'দেবি, কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে?' – আবার শুনিনু
আর্তনাদ;– 'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষণের হাত, কহিনু কুক্ষণে;–
'সুমিত্রা শাশুড়ি মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর?... ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিজয়া কহিলা;–
'মাতৃ-সম! মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
যাই আমি! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা!
যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।"
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,

প্রিয়সখী, কাহব তা কি আর তোমারে?
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী... ।
কহিল মায়াবী;– 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত অতিথে।'
আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু,– 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্মতি–
(প্রতারিত রোষে আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।'–
লজ্জা ত্যাজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,–
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি;
"দূরে গেল জটাজুট; কম লু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!"
"চালাইল রথ রথী। আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা!... ফাঁফর হইয়া, সখি খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;

তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ
আভরণ।... "

এইখানে আসিয়া যখন আমি নিরবিলাম। তখন সরমা কহিলা–
'এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি; দেহ সুধা-দান তারে।'

আমি তথায় বলিলাম–
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?–
আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখি
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখি যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারদ, তুমি
ভীমনাদী ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?–"

এত গেল সীতা চরিত্রের কথা। আমি মেঘনাদবধ কাব্যে আরেকটি প্রধান চরিত্র মেঘনাদ পত্নী প্রমীলার অভিনয় করিতাম রমণীয় ভাব-রসের পর পরই বীর-রসে

ভাসিয়া। এই চরিত্রে আমার অভিনয়ক্ষণ আসিত তখন, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আপন ভ্রাতা বীরবাহু'র মৃত্যু হইয়াছে। আর এমত সংবাদ শুনিয়া মহাবীর মেঘনাদ প্রমোদ-উদ্যান হইতে আপন কুসুমদাম সাজ ছিঁড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধ-সাজে বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার রথে উঠিয়া বসিয়াছেন। অমনি আমি প্রমীলার ভূমিকায় তাহার সামনে আসিয়া বলিতাম–

প্রমীলা চরিত্র :
'কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?'
হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদে– 'ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।'

সেই মেঘনাদ যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল। এদিকে ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশের ভালে অস্তে গেলা দিনমণি। সে সময়ে প্রমোদ-উদ্যানে পতি-বিরহে আমি প্রমীলা হইয়া কাতরা হইয়া বাসন্তি সখীকে ডাকিয়া কহিলাম–

'ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পারো, সই, কহ লো আমারে।'
কহিলা বাসন্তী সখি, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,– 'কেমনে কহিব

কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনী!
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।...
আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।'
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,...
অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী– 'এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখী, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।'
কহিল বাসন্তী সখী;– 'কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃঅরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দ পাণি দ ধর যথা।'
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী!
'কি কহিলি, বাসন্তী? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,–
আমি ডরাই, সখী, ভিখারী রাঘবে?
পশিল লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?'
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।

তাহার পর প্রমীলারূপে আমার সে কী যুদ্ধসাজ! আর কী দৃঢ় পদক্ষেপে-ই-না আমাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল! তাহা বর্ণিয়া শেষ করা যাইবে না। একবার স্বামী-মেঘনাদের মৃত্যুর পর তার সঙ্গে সহমরণে আমি প্রমীলা সাজিয়া চিতারোহণ করিতে যাইতেছি। এমন সময় আমার মাথার রুক্ষ চুল ও চেলির কাপড়ের খানিকটা আঁচলে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল– আমি তখন অভিনয়ে এমনই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম

যে আগুনের তাপের কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই। আমার চুল জ্বলিতেছে, কাপড় জ্বলিতেছে, আমার কোনো হুঁশ নাই। আমি সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়িলাম। উপেন্দ্রমিত্র মহাশয় রাবণ সাজিয়াছিলেন, আমার এই বিপদ না দেখিয়া, তিনি তো সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া দুই হাতে থাবড়াইয়া থাবড়াইয়া সেই আগুন নিভাইতে লাগিলেন। তখন যবনিকা সবে অর্ধেক পড়িয়াছে। যাহাই হউক আর পাঁচ জন ছুটিয়া আসিয়া সে যাত্রাই আমাকে কোনোরকমে পুড়িয়া মরিবার হাত হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। উপেনবাবুর হাত ঝলসে গিয়াছিল, আমার দেহের স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল।

এখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা পরস্পর পরস্পরকে কি চোখে দেখে তা ঠিক বলিতে পারি না,– তবে তখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে বিশেষ স্নেহ মমতার বন্ধন রহিয়াছিল, পরম আত্মীয়ের মতো একজন আরেকজনকে দেখিত।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা চরিত্রের অভিনয়ের আরেকটি বিপদ-স্মৃতি আমার মানসপটে সজীব হইয়া আছে। একবার কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ঘোড়ার চড়িয়া এই চরিত্রে অভিনয় করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া বড়ই আঘাত লাগিয়া ছিল। 'প্রমীলা'র পার্ট ঘোটকের উপর বসিয়া অভিনয় করিতে হইত। সেখানে মাটির প্লাটফরম প্রস্তুত হইয়াছিল, যেমন আমি স্টেজ হইতে বাহিরে আসিব, অমনি মাটির ধাপ ভাঙ্গিয়া ঘোড়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। আমিও ঘোড়ার উপর হইতে প্রায় দুই হস্ত দূরে পতিত হইয়া অতিশয় আঘাত পাইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। তখন আমার অভিনয়ের অনেক বাকি আছি– কি হইবে! চারুবাবু আমায় ঔষধ সেবন করাইয়া বেশ করিয়া আমার হাঁটু হইতে পেট পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। শরৎবাবু মহাশয় কত স্নেহ করিয়া বলিলেন যে,– 'লক্ষ্মীটি! আজিকার কার্য্যটি কষ্ট করিয়া উদ্ধার করিয়া দাও।' তাঁহার সেই স্নেহময় সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে আমার বেদনা অর্ধেক দূর হইল। কোনোরূপ কার্য সম্পন্ন করিয়া পরদিন কলিকাতা ফিরিলাম। ইহার পর আমি একমাস শয্যাশায়ী ছিলাম।

অন্য আরেকটি থিয়েটার ভ্রমণের পথে উমিচাঁদবাবুর মৃত্যু

একবার আমরা সদলবলে চুয়াডাঙ্গা যাই, আমাদের জন্য একখানি গাড়ি রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সকলে একত্রে যাইতেছি। পথের মাঝে এক বড় স্টেশনে শরৎবাবু মহাশয়ের আত্মীয় উমিচাঁদ ও আরও দুই-চার জন একত্রে আমাদের কোম্পানির জন্য খাবার আনিতে গেলেন। জলখাবার, পাতা ইত্যাদি লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন, উমিচাঁদবাবুর আসিতে দেরি হইতে লাগিল। এমন সময় গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে, শরৎবাবু গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন– 'ওহে উমিচাঁদ, শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো– গাড়ি যে ছাড়িল!' সে সময় গাড়িও একটু চলিতে লাগিল, ইত্যবসরে দৌড়িয়া উমিচাঁদবাবু গাড়িতে উঠিলেন, গাড়িও জোরে চলিল। উমিচাঁদ অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। চারুচন্দ্রবাবু ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শরৎবাবু মহাশয় ও অন্যান্য সকলে তখন বলিতে লাগিল– 'সর্দ্দিগরমি হইয়াছে, জল দাও, জল

দাও!' কিন্তু এমন দুর্দ্দৈব যে সমস্ত গাড়িখানার ভিতর একটি লোকের কাছে, এমন কি এক গ্লাস জল ছিল না, যে সেই আসন্ন– মৃত্যুমুখে পতিত লোকটির তৃষ্ণার জন্য তাহা দেয়। 'ভূনী' তখন সবে মাত্র বেঙ্গল থিয়েটারে কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার কোলে ছোট মেয়ে; সে সময় অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া আপনার স্তন্য দুগ্ধ একটি ঝিনুকে করিয়া লইয়া উমিচাঁদের মুখে দিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

গাড়ি সুদ্ধ লোক একেবারে ভয়ে ভাবনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। শরৎবাবু মহাশয় উমিচাঁদের বুকে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি ভয়ে মাতার কোলের উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার মনোক্ষেত্রে বারবার উমিচাঁদবাবুর মৃত্যুকালীন মুখভঙ্গি ভাসয়া উঠিতে লাগিল। আমি কখনো এমন মৃত্যু দেখি নাই, তাই ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে থাকিলাম। আর আমার অবস্থা দেখিয়া চারুবাবু মহাশয় শরৎবাবু মহাশয়কে বলিলেন, 'শরৎ থাম, যাহা হইবার হইয়াছে; এখন যদি রেলের লোক এঘটনা জানিতে পারে, গাড়ি কাটিয়া দিবে, এত লোকজন লইয়া রাস্তার মাঝে আর এক বিপদ হইবে।'

শরৎবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,– 'আমি উমির মাকে গিয়া কি বলিব? সে আসিবার কালীন উমিচাঁদ সম্বন্ধে কত কথা যে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল। উমিচাঁদ যে সে মায়ের একমাত্র সন্তান!'

এই রকম ভয়ানক একটা বিপদ ঘাড়ে করিয়া সেদিন সন্ধ্যায় আমরা চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে নামিলাম। স্টেশন মাস্টারকে বলা হইল যে, এই আগের স্টেশনে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

অতি বিষণ্ন চিত্তে শরৎবাবু মহাশয় ও আরও চার জন অভিনেতা শবদেহ দাহ করিতে যাইলেন।

সেখানে তিন দিন থাকিয়া অভিনয়-কার্য সারিয়া সকলে কি যে বিষণ্নভাবে কলিকাতায় ফিরিলাম তাহা বর্ণনার ভাষা আমার নাই।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়কালে আমি একরূপ সন্তোষে কাটাইয়াছিলাম। কেননা, তখন বেশি আশা হয় নাই, যাহা পাইতাম তাহাতেই সুখী হইতাম। সকলে বড় ভালোবাসিত।

এই সময়ে একদিন গিরিশবাবু মহাশয় শরৎবাবুকে বলেন– 'আমরা একটি থিয়েটার করিব মনে করিতেছি। আপনি যদ্যপি বিনোদকে আমাদের থিয়েটারে দেন তবে বড়ই ভালো হয়।'

শরৎবাবু মহাশয় অতি উচ্চ হৃদয়সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন– 'বিনোদকে আমি বড়ই ্নেহ করি; উহাকে ছাড়িতে হইলে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে। তথাপি আপনার অনুরোধ আমি এড়াইতে পারি না, বিনোদকে আপনি লউন।' ইহার পর একদিন শরৎবাবু মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন– 'কিরে বিনোদ এখান হইতে যাইলে তোর মন কেমন করিবে না?' আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

এইবার হইতে আমি 'বেঙ্গল থিয়েটার' ত্যাগ করিয়া 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয়ের সহিত কার্য করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার শিক্ষায় আমার যৌবনের প্রথম হইতে জীবনের সার ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে।

গিরিশ ঘোষের শিক্ষা

গিরিশবাবু আমাকে পার্ট অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালি বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম পার্টগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পার্ট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মতো আমাদের বাটীতে বসিয়া, অমৃত মিত্র, অমৃতবাবু আরও অন্য লোকে মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি শেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রন, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাব-ভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য শিখিতে লাগিলাম। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়া পাখির চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তির দ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়-নির্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী বড় বড় এক্টার-এক্ট্রেস আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটার অধ্যক্ষেরাও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজী থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাটী আসিলে গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেন– 'কি রকম দেখে এলে বর দেখি?'

আমার মনে যেমন বোধ হইত, তাঁহার কাছে তেমন বলিতাম। আমার যদি ভুল হইত তিনি তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।...

গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ গুণে আমি যখন স্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র। কার্য শেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত।...

আমার স্বভাব এমন হইয়া গিয়াছিল যে যদি কোনো উদ্যান ভ্রমণ করিতে যাইতাম, সেখানকার ঘরবাড়ি আমার ভালো লাগিত না, আমি কোথায় বন-পুষ্পশোভিত নির্জন স্থান তাহাই খুঁজিতাম। আমার মনে হইত যে, আমি বুঝি এই বনের মধ্যে থাকিতাম, আমি ইহাদের চিরপালিত। প্রত্যেক লতাপাতার সৌন্দর্যের মাখামাখি দেখিয়া আমার হৃদয় লুটাইয়া পড়িত। আমার প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিত! কখন কোন নদীতীরে যাইলে আমার হৃদয় যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ভরিয়া যাইত, আমার মনে হইত আমি বুঝি এই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গেই চিরদিন খেলা করিয়া বেড়াইতাম। এখন আমার হৃদয় ছাড়িয়া এই তরঙ্গগুলি আপনা আপনি লুটেপুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কুচবিহারের নদীর বালিগুলি

অভ্র মিশান, অতি সুন্দর, আমি প্রায় বাসা হইতে দূরে, নদীর ধারে একলাটি যাইয়া সেই বালির উপর শুইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম। আমার মনে হইত উহারা বুঝি আমার সহিত কথা কহিতেছে।

এইরূপে একদিন নদীতীরে বসি।
চাহিয়া নীল গগনে, আছে আপনার মনে,
নক্ষত্রের মালাপরা দেখিতেছে শশী॥
কতই ভাবনা আসি মনোমাঝে ঘুরে।
গোড়া নাহি খুঁজে পায়, এই আছে এই যায়,
কিছুতেই যেন আর প্রাণ নাহি পুরে॥

নানাবিধ ভাব সংগ্রহের জন্য সদা সর্বক্ষণ মনকে লিপ্ত রাখায় আমি কল্পনার মধ্যেই বাস করিতাম, কল্পনার ভিতর আত্মবিসর্জন করিতে পারিতাম, সেই জন্য বোধ হয় আমি যখন পার্ট অভিনয় করিতাম, তাহার চরিত্রগত ভাবের অভাব হইত না। যাহা অভিনয় করিতাম, তাহা যে অপরের মনোমুগ্ধ করিবার জন্য বা বেতনভোগী অভিনেত্রী বলিয়া কার্য্য করিতেছি ইহা আমার কখন মনেই হইত না। আমি নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতাম। চরিত্রগত সুখ-দুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, ইহা যে অভিনয় করিতেছি তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম।...

বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষে আমি কুন্দে'র অংশ অভিনয় করিতাম।... বিষবৃক্ষে'র কুন্দ'র অভিনয়ের পরই দীনবন্ধুবাবুর 'সধবার একাদশী'র 'কাঞ্চন'! কি স্বভাব সম্বন্ধে, কি কার্য সম্বন্ধে কত প্রভেদ! অভিনয়কালে আপনাকে যে কত ভাগে বিভক্ত করিতে হইত তাহা বলিতে পারে না। একটি কার্যপূর্ণ ভাব সম্পূর্ণ করিয়া আর একটি ভাবকে সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার এটি স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অভিনয় ব্যতীত আমি সদাসর্বক্ষণ এক এক রকম ভাবে মগ্ন থাকিতাম।

'মৃণালিনী'তে 'মনোরমা'র চরিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর কঠিন, তাহা যাহারা না মৃণালিনী'র অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন না! একসঙ্গে বালিকা, প্রেমময়ী যুবতী, মন্ত্রী, অবশেষে পরম পবিত্র চিত্র স্বামী সহমরণ অভিলাষিণী দৃঢ়চেতা সতী রমণী! যে কেহ 'মনোরমা' অংশ অভিনয় করিবে, তাহাকেই একসঙ্গে এতগুলি ভাব দর্শককে প্রদর্শন করিতে হইবে!

মৃণালিনী'র মনোরমা চরিত্রের দুটি দৃশ্যের অভিনয়াংশ

যখন আমি একই সঙ্গে একাধিক স্বভাবা মনোরমা হইয়া অভিনয় করিতাম তখনকার একটা দৃশ্যের বর্ণনা শুনুন–

তখন হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া প্রথম মুহূর্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি সকুসুমনির্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্তে

দেখিলেন, প্রতিমা সজীব; তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্মাণকৌশলসীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বালিকা না তরুণী? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।

বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন,– 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন?'

হেমচন্দ্র কহিলেন– 'তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে?'

বালিকা বলিল– 'আমি মনোরমা।'

হেমচন্দ্র– 'ইনি তোমার পিতামহ?'

মনো– 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?'

'শুনিলাম ইনি এগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।'

'এগৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?'

'আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।'

'কেন?'

হেমচন্দ্র কহিলেন,– 'কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?'

'তুমি কি আমার ভাই?'

'আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?'

'বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?'

হেমচন্দ্র কহিলেন,– 'কেন তিরস্কার করিবে?'

'যদি আমি দোষ করি?'

'দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?'

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন– 'আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?'

'না।'

'তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না– তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?'

হেমচন্দ্র হাসিলেন।

এইরূপ একটি পার্টে অভিনয়ে আমার মনোরমা চরিত্রকে যেইরূপে শনাক্ত করিতে পারিলেন, এক্ষণে হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমার আরেকটা দৃশ্যের অভিনয়াংশের কথা শুনিয়া বলুন তো পূর্বের স্বভাবা মনোরমার সহিত এইবারে মনোরমা চরিত্র মিলিল কি-না–?

এই দৃশ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা কহিল– 'ভাই! আজ তুমি অমন কেন?'

হেম– 'কেমন আমি?'

মনো– 'তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মতো অন্ধকার; ভাদ্র মাসের গঙ্গার মতো রাগে ভরা; অত ভ্রুকুটি করিতেছ কেন? চক্ষের পলক নাই কেন– আর দেখি– তাই ত, চোখে জল; তুমি কেঁদেছ?... হেমচন্দ্র, তুমি কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে?'

হেমচন্দ্র কহিলেন–'কিছু না।'

মনো– 'কিছু না– বলিবে না! ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে?... আমাকে বলিবে না কেন? আমি যে তোমার ভগিনী।'

'আমার যে যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কথনীয় নহে।'

'তবে আমি ভগিনী নহি।'

'আমি তোমার কেহ নহি।'

'আমার দুঃখ কি? তাহলে শোনো– দুঃখ কিছুই না। আমি মণিভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।'

মনোরমা কহিল– 'বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালোবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।'

'ভালোবাসিতাম।' এইকথায় হেমচন্দ্র অশ্রুজলে ভাসিয়া উঠিলেন।

মনোরমা বিরক্ত হইল। বলিল– 'ছি ছি! প্রতারণা! যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্বনাশ ঘটে।'

'কি প্রতারণা করিলাম?'

'ভালোবাসিতাম কি? তুমি ভালোবাস। নহিলে কাঁদিরে কেন? কি? আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালোবাসা গিয়াছে? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে?... তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ; ইহা জগদীশ্বর-পাদ-পদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতের পবিত্র,– যে ইহাতে অবগাহন করে সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ। সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শত পাত্রে ন্যাস্ত হয়–পরিশেষে সাগর সঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়– সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।'

হেম– 'তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই? পাপাসক্তকে কি ভালোবাসিতে হইবে?'

মনো– 'পাপাসক্তকে ভালোবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালোবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে; কেননা, প্রণয় অমূল্য। ভাই যে ভালো, তাকে কে না ভালোবাসে? যে মন্দ, তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালোবাসে, আমি তাকে বড় ভালোবাসি।'

এই হচ্ছে মৃণালিনী নাটকে আমার 'মনোরমা' চরিত্রের অভিনয়। একদিন 'মৃণালিনী'র এই অভিনয় দেখিতে স্বয়ং বঙ্কিমবাবু আসিয়াছিলেন।... মনোরমার অংশ অভিনয় দর্শন করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন,– 'আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া আমার সে ভ্রম ঘুচিল! মঞ্চের মনোরমাকে দেখিয়া আমার সত্যিকারে মনে হইল যে,– আমার মনোরমাকে আমি সামনে দেখিতেছি।'

বেঙ্গল থিয়েটারে মৃণালিনী নাটকে 'মনোরমা'র অভিনয় বিভিন্ন মহল হইতে প্রসংশিত হইয়াছিল। তখনকার বড় বড় ইংরাজি খবরের কাগজ 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটসম্যান' ইত্যাদিতে আমায় কেহ 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ' কেহ কেহ বা 'সাইনোরা বিনোদিনী' বলিয়া উল্লেখ করিতেন! পরবর্তীকালে আমার সেই সময়ের বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রায়শ তাঁহারা আমাকে বলতেন,– 'সাইনোরা, ভালো আছ তো!'

মূল-চরিত্রাভিনেত্রীর হঠাৎ অনুপস্থিতে একাধিক চরিত্রে অভিনয়

একবার স্টার থিয়েটারে 'নল-দময়ন্তী' নাটকের অভিনয় হইতেছে। এই নাটকে একটি সরোবরের দৃশ্য ছিল, সরোবরে পদ্ম ফুটে রহিয়াছে, মধ্যস্থলের পদ্মটি সব চায়তে বড়, সেই পদ্মের মধ্য একজন কমলবাসিনী বাহির হইতেন, বাহির হইয়াই তিনি পা বাড়াইয়া আরেকটি কম্পমান পদ্মে গিয়া দাঁড়াইতেন। এমনই ভাবে একে একে ছয় জন পদ্মবাসিনী বাহির হইয়া আসিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গান গাহিতে হইত। প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গিরিশবাবু নিজে দাঁড়াইয়া সখীদেরকে এই ক্রিয়াটি শেখাতেন। সরোবরের এই দৃশ্যটি দেখিতে ভারি সুন্দর হইত। জহর ধর মহাশয় এই সিনটা সাজাইয়া ছিলেন, তিনি সত্যিকারের একজন কলাবিদ ছিলেন।

আমি দময়ন্তী সাজিয়া সাজঘর হইতে বাহির হইয়া সবে উইংসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় দর্শকবৃন্দে খুব হাততালি দিয়া উঠিলেন। শুনিলাম একজন সখি না-আসায় সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে– সিন তুলিতে দেরি হইতেছে, তাই এইরূপ ঘন ঘন হাততালি। আর তো দেরি করা চলিবে না। গিরিশবাবু আসিয়া আমায় ধরিলেন– 'বিনোদ তোকে বেরুতে হবে।' আমি তো হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সর্বনাশ! সেই কম্পমান পদ্মের উপর সখীদের দেখিলেই যে ভয়ে আমার বুকটা দুড় দুড় করিয়া উঠিত! আর আমাকেই কিনা সেই পদ্মের উপর গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, আমি যে একদিনও অভ্যাস করি নাই! এ তো দেখিতেছি ভারি বিপদ! তাহার উপর দময়ন্তী সাজিয়া মাথার সব চুল ফিটফাট করিয়া আসিয়াছি! ফুলের মুকুট পরিয়া কমলবাসিনী সাজিতে যাইলে যে আমার সব চুল খারাপ হইয়া যাইবে।... ভগবানের কৃপায় আমার চুলের খুব বাহার আছিল, আমার ঘন চুল এমন নরম আছিল যে যেমনিভাবে ইচ্ছা তাহাকে কুচকিয়া ঘুরিয়া নিতে পারিতাম। তাই আমায় কখনো ধার

করা পর-চুলা পরিতে হয় নাই। তখনকার দিনে কেশ প্রসাধনের জন্য আমায় বেশ খ্যাতি আছিল। যাক সে কথা, গিরিশবাবু তো আমায় আদর করিয়া মিষ্টি কথা বলিয়া সখি সাজাইয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া স্টেজে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু একটা চলতি কথা আছে– 'খোঁড়ার পা খালে পড়ে'; 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে।' আমার ঠিক তাহাই হইল। যেমনি ক্রেনে চড়িয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি, অমনি আমার এলো চুলের রাশি পাক খাইয়া দড়ির সঙ্গে জড়াইয়া গেল– চড়চড় করিয়া চুল ছিড়িতে আরম্ভ করিল আমার অর্ধেক মুখ তখন পদ্ম হইতে বাহির হইয়াছে, এই অবস্থায় আমি নামিয়া পড়িতেও পারি না, ওইদিকে চুল ছিড়িয়া যাইবার সে কি জ্বালা! 'আরে চুল গেল'– বলিতে বলিতে দাশুবাবু একখানা কাঁচি আনিয়া আমার চুলের তিন চার জায়গা কাটিয়া মাথাকে ছাড়াইয়া দিলেন।

ভিতরে আসিয়া রাগে আমি ফুলিয়া ফুসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এইবার আমি গোঁ ধরিয়া বসিলাম– 'আমি আর সাজবো না কিছুতেই সাজব না।'

তখন গিরিশবাবু আসিয়া কেমন আদর করিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া মিষ্টি মিষ্টি করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন– 'ও এমন কত হয়! তোর খানিকটা চুল নষ্ট হয়ে গেছে বলে তুই কাঁদছিস, আর জানিস বিলেতের বড় বড় অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকের মাথায় একেবারেই চুল থাকে না, মুখে একটা দাঁত থাকে না। তুই চুলের জন্যে কাঁদবি কেন? একটা গল্প শুনতে শুনতে পোশাকটা পরে নে।' এই বলিয়া তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন– 'বিলেতের একজন খুব বড় অভিনেত্রী, অভিনয় শেষ করে ফিরে এসে প্রথমে পোশাকটা ছেড়ে ফেললেন, তারপর মাথায় কোকড়ানো বাহারে পরচুলার রাশ খুলে রাখলেন, তার দুপাটি দাঁতই বাঁধানো ছিল, তা মুখ থেকে টেনে বের করলেন। তার ৫/৬ বছরের একটা মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলে, তারপর তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার নাক ধরে টানাটানি করতে লাগল। তার ধারণা হয়েছিল, তার মার নাক-কানও বুঝি জোড়া দেওয়া।' এমন গল্প-কথা শুনিলে আর-কি রাগ থাকে, কোনো রকমে হাসি চাপিয়া আমি বলিলাম– 'যান মশায় আমার সঙ্গে আর কথা বলবেন না।' এই বলিয়া আমি হাসিতে হাসিতে স্টেজে গিয়া নামিলাম। গিরিশবাবুও এভাবেই কাজ উদ্ধার করিতে পারিবার আনন্দে হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইলেন।

গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার জবরদস্তি, মান-অভিমান, রাগ প্রায়ই চলিত। তিনি আমায় অত্যাধিক আদর করিতেন, প্রশ্রয় দিতেন। তাই আমিও বড্ড বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম, মাঝে মধ্যেই তাহার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করিতাম, কিন্তু তাহার জন্য তিনি আমায় একটি দিনের তরেও তিরস্কার করেন নাই, তাঁহার অনাদর অযত্ন তো জ্ঞানত কোনোদিনই পাই নাই। তবে আমিও একটি দিনের জন্য এমন কোন কাজ করি নাই, যাহাতে তাহার এতটুকু ক্ষতি হয়।

স্টার থিয়েটার সৃষ্টির কারণ

এক্ষণে প্রতাপ জুহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটার আমি কেন ছাড়িয়া ছিলাম তাহার কারণ ও স্টার থিয়েটার সৃষ্টির সূচনা কথার অবতারণা করিতেছি।

তখন গিরিশবাবুর নূতন নূতন বই ও নূতন নূতন প্যান্টোমাইমে আমাদের বড়ই বেশি রকম খাটিতে হইত। প্রতিদিন অতিশয় মেহনতে আমার শরীরও অসুস্থ হইতে লাগিল, আমি এক মাসের জন্য ছুটি চাহিলাম, তিনি অনেক জেদাজেদির পর ১৫ দিনের ছুটি দিলেন। আমি ছুটিতে শরীর সুস্থ করিবার জন্য কাশীধামে চলিয়া যাইলাম। কিন্তু সেখানে আমার অসুখ বাড়িল। সেই কারণে আমার ফিরিয়া আসিতে প্রায় একমাস হইল। এখানে আসিয়া পুনরায় থিয়েটারে যোগ দিলাম, কিন্তু শুনিলাম যে, প্রতাপবাবু আমার ছুটির সময়ের মাহিনা দিতে চাহেন না।

গিরিশবাবু বলিলেন যে,– 'ছুটির মাহিনা না দিলে বিনোদ কাজ করিবে না, তখন বড় মুস্কিল হইবে।'

সেই দিনই প্রতাপবাবু ভিতরে আসিলে আমি আমার মাহিনা চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন– 'মাহিনা কেয়া? তোম তো কাম নেহি– কিয়া!'

আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া জ্বলিয়া গেল,– 'বটে মাহিনা দিবেন না!'

শুধু এইটুকু বলিয়া চলিয়া আসিলাম। তারপর গিরিশবাবু, অমৃত মিত্র আমাদের বাটীতে আসিলেন। আমি তখন গিরিশবাবুকে বলিলাম যে,– 'মহাশয়, আমার বেশি মাহিনা চাহি, আর যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা চুক্তি করিয়া চাহি, নচেৎ কাজ করিব না।'

তখন অমৃত মিত্র বলিলেন,– 'দেখ বিনোদ এখন গোল করিও না, একজন মাড়োয়ারীর সন্তান, একটী নূতন থিয়েটার করিতে চাহে, যত টাকা খরচ হয় সে করিবে। এখন কিছুদিন চুপ করিয়া থাক, দেখি কতদূর কি হয়!'

আমিও তাহার কথা অনুযায়ী আর প্রতাপবাবুকে কিছু বলিলাম না। তবে ভিতরে সংবাদ লইতে লাগিলাম কে নূতন লোক থিয়েটার করিতে চাহে?

স্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা কথা

এই সময় আমার অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। আমাদের ন্যায় পতিতা ভাগ্যহীনা বারনারীদের টাল বেটাল তো সর্বদাই সহিতে হয়, তবুও তাহাদের সীমা আছে; কিন্তু আমার ভাগ্য চিরদিনই বিরূপ ছিল। একে আমি জ্ঞানহীনা অধম স্ত্রীলোক, তাহাতে সুপথ কুপথ অপরিচিতা। আমাদের গন্তব্য পথ সততই দোষণীয়, আমরা ভালো পথ দিয়া যাইতে চাহিলে, মন্দ আসিয়া পড়ে, ইহা যেন আমাদের জীবনের সহিত গাঁথা। লোকে বলেন আত্মরক্ষা সতত উচিত, কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষাও নিন্দনীয়! অথচ আমাদের প্রতি স্নেহ চক্ষে দেখিবার বা অসময় সাহায্য করিবার কেহ নাই! যাহা হউক; আমার মর্মব্যথা শুনন।...

আমি তখন যে সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তিনি ছিলেন অবিবাহিত। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ আমাকে না জানাইয়া অন্যের সহিত বিবাহ করিয়া বসেন। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম– যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি আমার সহিত যে সত্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা তিনি ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি পুনঃপুন ধর্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে,– আমিই তাহার একমাত্র ভালোবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালোবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নয়! তিনি বিষয় কার্যের ছল করিয়া দেশে গিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয়ে তাহার কার্য্য নয়, তিনি আসলে বিবাহ করিতে গিয়াছেন! তবে তাহার ভালোবাসা কোথায়? এ তো প্রতারণা! আমি কি আর তাহার বাধ্য থাকিব?...

আমি মনে মনে ভাবিতে থাকি– জীবিকা নির্বাহের সামর্থ্য কী আমার নাই? অবশ্যই আছে, ভালো করিয়াই আছে। আমি আরও ভাবিলাম– এইরূপ শারীরিক মেহনত দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে যদি সক্ষম হই, তবে আর দেহ বি□য় দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব না ও নিজেকেও উৎপীড়িত করিব না। আমা হইতে যদি একটি থিয়েটার ঘর প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমি চিরদিনের অন্ন সংস্থান করিতে পারিব। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখনই থিয়েটার করিবার জন্য গুর্মুখ রায় ব্যস্ত।... ঘটনাচ□ এই সময় আমার আশ্রয়দাতা সম্ভ্রান্ত যুবকও কার্যানুরোধে দূরদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এদিকে অভিনেতারা আমাকে অতিশয় জেদের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে,– 'তুমি যে প্রকারে পার একটি থিয়েটার করিবার সাহায্য কর।'

থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ! আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। গিরিশবাবু বলিলেন,– 'থিয়েটারই তোমার উন্নতির সোপান। আমার শিক্ষা সাফল্য তোমার দ্বারাই সম্ভব। থিয়েটার হইতে মান সম্ভ্রম জগদ্বিখ্যাত হয়।'

এইরূপ উত্তেজনায় আমার কল্পনা স্ফীত হইতে লাগিল।... আমার মন থিয়েটারের দিকেই টলিল। ... কিন্তু মধ্যে মধ্যে আবার মনে হইতে লাগিল, যে সেই যুবার হয়তো কোনো দোষ নাই। হয়তো আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি তাহার একমাত্র ভালোবাসার পাত্রী হইয়া তবে এ কী করিতেছি! রাত্রে এ ভাব উদয় হইলে অনিদ্রায় যাইত, কিন্তু প্রাতে বন্ধুবর্গ আসিলে অনুরোধ তরঙ্গ ছুটিত ও রাত্রের মনোভাব একেবারে ঠেলিয়া ফেলিত।... এই পরিস্থিতিতে পড়িয়া থিয়েটার করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম। কেন করিব না? যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরবশীভূত, তাহারাও সত্য কথা বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সঙ্কল্প দৃঢ় হইল, গুর্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম।

একেরে ত্যাগিয়া অন্যেকে গ্রহণ
এই আমাদের চির-প্রথা।

তবু তো মনে ব্যথিত দিবা-নিশি
কেমনে ত্যাগিয়া এক প্রেম
অন্যেরে কহি– ভালবাসি ।
হৃদয়ে হাত দিয়া কহি– এই আমি
অর্থে বেচি নাই ভালবাসা বাসি ।
অর্থের প্রলোভন এজীবনে আসে বারবার
তাকে ঠেলে দূরে অনিবার
হৃদয়ে হৃদয়ে চাহি মন বিনিময়ে
খুঁজি নিত্য সবখানে কোথা সে হৃদয়॥

একটি কথা আজ আপনাদের বলি– পতিপ্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, না-কি প্রতারিত হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?...

অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালোবাসা কেনেন নাই । আমরাও অর্থে ভালোবাসা বেচি নাই । এই আমাদের সংসারের অপরাধ । অনেক প্রদেশে জল জমিয়া পাষাণ হয়! আমাদেরও তাহাই! উৎপীড়িত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে । যাহা হউক, এখন ও কথা থাকুক ।

প্রথম প্রেমিকের প্রেমজাল থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না এবং একটি ঘটনা

প্রথম প্রেমিকের আশ্রয় হইতে অবস্থান্তর গ্রহণ করিতে আমাকে ও থিয়েটারের লোকদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল । কেননা যখন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক শুনিলেন যে আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি থিয়েটারে চিরদিন সংলগ্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তখন তিনি ক্রোধ বশত-ই হউক, কিংবা নিজের জেদ বশত-ই হউক, নানারূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । সে বাধা সহজ নহে! তিনি নিজের জমিদারি গুণ্ডা আনাইলেন, মারামারি পুলিশ হাঙ্গামা চলিতে লাগিল । এমন কি একদিন আমার জীবন সংশয় হইয়াছিল!

একদিন রিহার্সালের পর আমি আমার ঘরে ঘুমাইতে ছিলাম, ভোর ছয়টা হইবে, ঝন্ ঝন্ মস্ মস্ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! দেখি যে মিলিটারি পোশাক পরিয়া তরওয়াল বান্ধিয়া সেই যুবক একেবারে আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে,– 'মেনি এত ঘুম কেন?'

আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতে, বলিলেন যে,– 'দেখ বিনোদ, তোমাকে উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে । তোমার জন্য (উহাদের) যে টাকা খরচ হইয়াছে আমি সকলই দিব । এই দশ হাজার টাকা লও; যদি বেশি হয় তবে আরও দিব ।'

তাহার ঔদ্ধত্য ভাব দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল– 'না কখনই নহে, আমি উহাদের কথা দিয়াছি, এখন কিছুতেই ব্যতিক্রম করিতে পারিব না ।'

তিনি বলিলেন– 'এমন কথা যদি টাকার জন্য বলে থাকো তবে আমি আরও টাকা দিব । কত টাকা তোমার লাগিবে ।'

দাঁড়াইয়া বলিলাম– 'রাখো তোমার টাকা! টাকা আমি উপার্জন করিয়াছি বই, কিন্তু টাকা আমায় উপার্জন করে নাই! ভাগ্যে থাকে অমন দশ বিশ হাজার আমায় কত আসিবে, তুমি এখন চলিয়া যাও!'

আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আগুনের মতন জ্বলিয়া উঠিলেন, নিজের তরওয়ালে হাত দিয়া বলিলেন,– 'বটে!– ভেবেছ কি যে তোমায় সহজে ছাড়িয়া দিব, তোমায় কাটিয়া ফেলিব! যে বিশ হাজার টাকা তোমায় দিতে চাহিতে ছিলাম তাহা অন্য উপায়ে খরচ করিব, পরে যাহা হয় হইবে ।'

বলিতে বলিতে ঝাঁ করিয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া, চক্ষের নিমেষে আমার মস্তক লক্ষ করিয়া এক আঘাত করিলেন । আমার দৃষ্টিও তাঁহার তরবারির দিকে ছিল, যেমন তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত আমি অমনি একটি টেবিল হারমোনিয়াম ছিল তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম । আর তরবারির চোট হারমোনিয়ামের ডালার উপর পড়িয়া ডালার কাঠ তিন আঙ্গুল কাটিয়া গেল! নিমেষ মধ্যে পুনরায় তরওয়াল তুলিয়া লইয়া আবার আঘাত করিলেন, তাঁর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আমারও মৃত্যু নাই, সে আঘাতও যে চৌকিতে বসিয়া বাজান হইত তাহাতে পড়িল, মুহূর্ত মধ্যে আমি উঠিয়া তাহার পুনঃউদ্যত তরওয়াল শুদ্ধ হস্ত ধরিয়া বলিলাম– 'কি করিতেছ, যদি কাটিতে হয় পরে কাটিও; কিন্তু তোমার পরিণাম? আমার কলঙ্কিত জীবন গেল আর রহিল তা'তে ক্ষতি কি! একবার তোমার পরিণাম ভাব, তোমার বংশের কথা ভাব, একটা ঘৃণিত বারাঙ্গনার জন্য এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইবে, ছি! ছি! শুন! স্থির হও! কি করিতে হইবে বল? ঠাণ্ডা হও! ঠাণ্ডা হও!'

শুনিয়াছিলাম দুর্দমনীয় ক্রোধের প্রথম বেগ শমিত হইলে লোকের হিতাহিত ফিরিয়া আইসে! এ তাহাই হইল, হাতের তরওয়াল দূরে ফেলিয়া দিয়া মুখে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন! তাহার সে সময়ের কাতরতা বড়ই কষ্টকর! আমার মনে হইল যে– সব দূরে যাউক, আমি আবার ফিরিয়া আসি । কিন্তু চারিদিক হইতে তখন আমায় অষ্ট বজ্র দিয়া থিয়েটারের বন্ধুগণ ও গিরিশবাবু মহাশয় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন; সেখান থেকে আর কোনোদিকে ফিরিবার পথ ছিল না ।

যাহা হউক, সে হইতে তখন তো পার পাইলাম । তিনি কোনো কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন! তাঁহার সেই চলে যাওয়া দেখিয়া আমার অন্তরে হঠাৎ কেন যেন বেদনা জাগিল, কিন্তু সে আর ফিরিয়া চাহিল না । আমার অন্তর হু হু করিয়া উঠিল–

কোথা যাও ফিরে চাও ওহে শশধর
বারেক দাঁড়াও শশি, হেরি ও মধুর হাসি,

চিরদিন পিপাসায় হৃদয় কাতর।
ক্ষণেক দাঁড়াও হেরি জুড়াই অন্তর॥
বারেক দাঁড়াও আর শুন এক কথা।
ধীরে ধীরে ভেসে ভেসে, যাও তুমি কোন দেশে,
কাহারে জানাতে যাও মরমের ব্যথা
কোথা সেই দেশ শশি সীমা তার কোথা।

ভালবাসার মানুষকে বেদনা দেবার বেদনায় আমার কয়েকটা দিবস ভালো যাইল না। আমি আপন মনে আপনার সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইলাম রাতের আকাশের চাঁদের পানে চাহিয়া। যাক সে কথা।

বিনোদনীর নামে শেষ পর্যন্ত থিয়েটার হলো না

এদিকে আমরা যে কয়জন একত্র হইয়াছিলাম সকলে প্রতাপবাবুর থিয়েটার ত্যাগ করিলাম। এখন গুর্মুখবাবুও ধরিলেন যে– আমি একান্ত তাঁর বশীভূত না হইলে তিনি থিয়েটারের কার্য করিবেন না। কাজে কাজেই গোলযোগ মিটিবার জন্য পরামর্শ করিয়া আমাকে মাস কতক দূরে রাখিতে সকলে বাধ্য হইলেন। কখন রানীগঞ্জে, কখন এখানে ওখানে আমায় থাকিতে হইল। ইহার ভেতর কেমন ও কিরূপ থিয়েটার হইবে এইরূপ কার্য চলিতে লাগিল। পরে যখন সব স্থির হইল, যে বিডন স্ট্রীটে প্রিয় মিত্রের জায়গা লিজ লইয়া এতদিন থিয়েটার হইবে, এত টাকা খরচ হইবে; তখন আমি কলকাতা ফিরিয়া আসিলাম। আমি কলকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন গুর্মুখবাবু বলিলেন যে,– 'দেখ বিনোদ! আর থিয়েটারের গোলযোগে কাজ নাই, তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নিকট হইতে লও! আমি একেবারে তোমায় দিতেছি!' এই বলিয়া কতকগুলি নোট বাহির করিলেন।

আমি থিয়েটার ভালোবাসিতাম, সেদিন আমি ঘৃণিতা বারনারী হইয়াও অর্ধ্ব লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিয়াছিলাম। সাথে সাথে তাহাকে বলিলাম– 'আমি স্থির করিয়াছি থিয়েটার করিব। আর থিয়েটার ঘর প্রস্তুত না করিয়া দিলে আমি কোনো মতে আপনার বাধ্য হইব না।'

তিনি আমার কথায় সম্মত হইলেন। তখন আমারই উদ্যমে বিডন স্ট্রীটে জমি লিজ লওয়া হইল এবং থিয়েটার প্রস্তুতের জন্য গুর্মুখবাবু অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। আর যখন থিয়েটার প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন সকলে আমায় বলেন যে,– 'এই যে থিয়েটার হাউস হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যুক্ত থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম বি-থিয়েটার হইবে।' এই আনন্দে আমি ভীষণ রকমে উৎসাহিত হইয়াছিলাম।

এই সময় আমরা বেলা ২/৩টার সময় রিহার্সালে গিয়া সেখানকার কার্য শেষ করিয়া থিয়েটার নির্মাণের কাজে আসিতাম। সে কাজ হইতে অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া মাটি বহিয়া পিট, ব্যাক সিটের স্থান পূর্ণ করিতাম, কখন কখন মজুরেদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক ঝুড়ি পিছু চারিকড়া করিয়া কড়ি ধার্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতের জন্য রাত্র পর্যন্ত কার্য করাইয়া লইতাম। আমার সে সময়ের আনন্দ দেখে কে? প্রত্যেকে বলেছে,– আমার নামে থিয়েটার হইতেছে।

কিন্তু কার্যকালে উহারা সে কথা রাখেন নাই। কেন রাখেন নাই– তাহা জানি না!

যে পর্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজেস্ট্রি না হইয়াছিল, সে পর্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে থিয়েটারের 'নাম' হইবে। কিন্তু যেদিন উহারা রেজেস্ট্রি করিয়া আসিলেন... আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে,– 'থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল?'

দাশুবাবু প্রফুল-ভাবে বলিলেন যে,– 'স্টার।'

এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিটকাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিন্তু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম– 'বেশ।'

পরে মনে ভাবিলাম যে উহারা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহ মমতা দেখাইয়া কার্য উদ্ধার করিলেন? কিন্তু করিব, আমার আর কোনো উপায় নাই! আমি তখন উহাদের হাতের ভেতরে! আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমন ভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন!...

আমি যাহাতে উক্ত থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী হইয়াও না থাকিতে পারি তাহার জন্যও সকলে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি তাহাদের উদ্যোগে ও যত্নে আমাকে মাস দুই ঘরে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পর আবার গিরিশবাবুর যত্নে ও স্বত্বাধিকারীর জেদে আমায় পুনরায় থিয়েটারে যোগ দিতে হইয়াছিল। এইবার আমার অবস্থা হইল বড়ই অদ্ভুত, এ যেন– 'তোমার মাঝেতে থেকে তোমারে হারাই'।

তোমার মাঝেতে থেকে তোমারে হারাই
ধরি ধরি মনে করি ধরিতে না পাই।
প্রাণভরে গায়ে মেখে আরো যেন চাই
দেহ রেখে মন লয়ে তোমাকে মিশাই॥

থিয়েটার আবার আমার মন-চিত্তের আনন্দ প্রকাশ হইয়া উঠিল। বি-থিয়েটারের পরিবর্তে আমি স্টার থিয়েটারের একজন সাধারণ অভিনেত্রী হইলাম।

স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয় জীবন

এখনকার প্রথম অভিনয় 'দক্ষযজ্ঞ'। ইহাতে গিরিশবাবু মহাশয় 'দক্ষ', অমৃত মিত্র 'মহাদেব', ভুনীবাবু 'দধীচি'। আমি 'সতী', কাদম্বিনী 'প্রসূতি' এবং অন্যান্য সুযোগ্য লোক সকল নানাবিধ অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই খড়খড়ি দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর

দুর দুর করিয়া কম্পন– বর্ণনাতীত! আমাদেরই সব দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার! কিন্তু অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সত্যই দক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর সেই গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি যখন স্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ! তাহার অভিনয় উৎসাহ... সে কথা বলিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়!

গিরিশবাবু 'দক্ষ', অমৃত মিত্রের 'মহাদেব' যে একবার দেখিয়াছে, সে কখনই তাহা ভুলিতে পারে নাই।

'কে-রে, দে-রে, সতী দে আমার'– বলিয়া যখন অমৃত মিত্র স্টেজে আসিতেন তখন সকলের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত তখন সে বোধ হয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত। অভিনয়কালীন স্টেজের উপর যেন অগ্নি উত্তাপ বাহির হইত।

যাহা হউক, এই থিয়েটার হইবার পর গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের আগ্রহ উৎসাহে দিন দিন উজ্জ্বলতর উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। এই থিয়েটারেই কার্যকালীন নানাবিধ গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট উৎসাহ পাইয়া আমার কার্যের গুরুত্ব আমি অনুভব করিতে পারিলাম। অভিনয়-কার্য যে রঙ্গালয়ের রঙ্গ নহে, তাহা শিক্ষা করিবার ও দীক্ষা দিবার বিষয়। অভিনয়-কার্য যে হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া লইয়া সে কার্য মন ও হৃদয় এক করিয়া লইতে হয়; তাহাতে কতকটা আপনাকে ঢালিয়া মিলাইয়া লইতে হয় তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলাম, এবং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের যে কতদূর উচ্চ কার্য সমাধার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইলাম। সেই কারণ সতত যত্নের সহিত হৃদয়ে সংযম রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ভাবিতাম যে ইহাই আমার কার্য ও ইহাই আমার জীবন। আমি প্রাণপণ যত্নে মহামহিমান্বিত চরিত্র সকলের সম্মান রক্ষা করিতে হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিব।

স্টার থিয়েটারের অর্ধেক স্বত্ব যে কারণে বিনোদিনীর হইল না

এই সময়ে নানা কারণে ও অসুস্থ হইয়া গুর্মুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ও বলিলেন যে,– 'এই থিয়েটার যাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আমি তাহাকেই ইহার স্বত্ব দিব, অন্তত ইহার অর্ধেক স্বত্ব তাহা থাকিবে, নচেৎ আমি হস্তান্তর করিব না।'

কিন্তু গিরিশবাবু মহাশয় তাহাতে রাজি হইলেন না, তিনি আমার মাকে বলিলেন যে,– 'বিনোদের মা ও সব ঝঞ্ঝাটে তোমাদের কাজ নাই, তোমরা স্ত্রীলোক অত ঝঞ্ঝাট বহিতে পারিবে না। আমরা আদার ব্যাপারী আমাদের জাহাজের খবরে কাজ নাই। তোমার মেয়েকে ফেলিয়া তো আমি কখন অন্যত্র কার্য করিব না; আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে অতি প্রয়োজনীয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না! আমরা কার্য্য করিব; বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই! গাধার পিঠে বোঝা দিয়া কার্য করিব।'

গিরিশবাবুর এই সকল কথা শুনিয়া মা আমার কোনো মতেই রাজি হইলেন না। আবার যেহেতু আমার মাতাঠাকুরানীও গিরিশবাবু মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সেহেতু তাহার কথা অবহেলা করিতে তাহাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। এই রকম নানাবিধ ঘটনায় ও রটনায় বহু দিবসাবধি লোকের মনে ধারণা ছিল যে স্টার থিয়েটারে আমার অংশ আছে! এমন কি অনেকবার লোকে আমার স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছে– 'তোমার কত অংশ?'

সে যাহা হউক, স্টার থিয়েটার এবার হরিবাবু, অমৃত মিত্র, দাশুবাবু, অমৃতলাল বসুবাবু ও গিরিশবাবুদের হাতে আসিবার পর দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য আরম্ভ হইল। আমাদের আনন্দ উদ্যোগে এবং নতুন উৎসাহে সুবিখ্যাত 'নল-দময়ন্তী', 'ধ্রুবচরিত্র', 'শ্রীবৎস-চিন্তা' ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটক প্রস্তুত হয়।

চৈতন্যলীলার অভিনয়

এই (স্টার) থিয়েটারের যতই সুনাম প্রচার হইতে লাগিল, গিরিশবাবু মহাশয় ততই যত্নে আমায় নানাবিধ সৎশিক্ষা দিয়া কার্যক্ষম করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এইবার 'চৈতন্যলীলা' নাটক লিখিত হইল এবং ইহার শিক্ষাকার্য আরম্ভ হইল!

এই 'চৈতন্যলীলা'র রিহার্সালের সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এডিটর বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায়হীনার দ্বারা সে দেব-চরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন, এবং বার বার বলিতেন যে,– 'আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি।'... তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভু পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। কিন্তু আমায় মনে বড়ই আশঙ্কা হইত যে কেমন করিয়া এ অকূল পাথারে কূল পাইব।... যেদিন প্রথম 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই নাই; প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উদ্বেগ হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয় গঙ্গাস্নানে যাইলাম... রাত্রে মঞ্চে উঠিলাম।

এক্ষণে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্যে মাতা শচীদেবীর নিকট হইতে নিমাইয়ের বিদায় লইবার করুণ দৃশ্যের কথা স্মরণ করিতে পারি–

'মাতা! শুন মন দিয়া, বিদরে গো হিয়া জীবের দুর্গতি হেরি, ঘরে আর রহিতে না পারি, যাব মা গো, বিলাইতে নাম, যেন পুরে মনস্কাম, কর মাতা আশীর্বাদ, প্রাতে যাব গৃহ পরিহরি।'

এমত কথা শুনিয়া মাতা আকুল হইয়া বলিয়া উঠিল– 'নিমাই! নিমাই! কি বলিস? কোথা যাবি– কে আছে আমার!'

'মাগো হরি প্রেমে হইব সন্ন্যাসী।'

'আর আরে কেন বধ জননীরে!' বলিয়া শচীমাতা মূর্চ্ছা গেলে আমি নিমাই আকুল হইয়া বলিয়া উঠিলাম– 'মা, মা, উঠ মা আমার, উচ্চ কার্যে নাহি কর প্রতিরোধ, উঠ গো জননি– মায়াবশে দেবকার্যে নাহি বাধা।'

মাতা শচী এবার জ্ঞান পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন– 'নিমাই, নিমাই, ওরে আমার কি হলো, বাছ! তোরে ছেড়ে নাহি দিব, যাস যদি মাতৃঘাতী হবি।'

'মাতঃ! সংবর □ন্দন, দেবকার্যে কি হেতু নিষেধ কর, অন্য অন্য জন– নানা দেশ করিয়ে ভ্রমণ, আনে নান রত্নধন, কৃষ্ণধন আমি এনে দিব, তবে কেন কর মা রোদন? সামান্য রতন হেতু গেলে মা সন্তান, হাস্যমুখে জননী বিদায় দেয়, কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষণে করিব গমন, কি হেতু মা, কর নিবারণ? বুঝ মনে জননী আমার, দেবকার্যে বহি দেহভার, অকল্যাণ হয় মাতা সে কার্য হেলনে!'

এমত কথার মধ্যে মাতা শচী বলিল– 'আরে রে নিমাই! কি নিয়ে সংসারে রব বল? আছে মম একটি বন্ধন, কেন তাহা করিবে ছেদন, তোমা বিনা গৃহ মম অরণ্য সমান, শ্মশানে কেমনে রব একা? আরে রে নিমাই, নিমাই আমার, ব্রজাঘাত করো না হৃদয়ে, এই হেতু জঠরে ধরেছি তোরে?'

এমন সময় নিমাই-রূপে আমি যখন গাহিতাম,–

"'কৃষ্ণ' বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদ না 'নিমাই' বলে।
'কৃষ্ণ' বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে 'নিমাই' বলে, নিমাই হারাবে
কৃষ্ণ নাহি পাবে,
কেঁদ না মা মায়া কর দূর–
জেন মাতা কৃষ্ণ মাত্র সার,
কেবা আর কার–
কতবার পুত্রহারা হয়েছ জননী।
বার বার যতই কাঁদিবে,
মোহে মাতা, ততই মজিবে,
ততই মা বাড়িবে রোদন;
কাঁদ 'কৃষ্ণ' বলে আর না কাঁদিতে হবে।... "

এই গানের মধ্যে স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিত। আর মঞ্চে আবার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম-বিদারণ শোকাধ্বনি, নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের আশীর্বাদ

এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে– আমি পতিতপাবন পরমহংস দেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম।... সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়েছিলেন!

অভিনয় কার্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণ

সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন– 'হরি গুরু, গুরু হরি, বল মা হরি গুরু, গুরু হরি।'

তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে,– 'মা তোমার চৈতন্য হউক!'

এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন মনে নাই। তবে 'বক্সে' যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।

কতদিন থিয়েটারে বসিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মধুর কণ্ঠে মঙ্গলগীতি শ্রবণ করিয়াছি– 'সত্যং শিবং সুন্দরম।' এই নরেন্দ্রনাথবাবুই পরে বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিতি লাভ করেন। আমার অভিনয় জীবনে এত বড় বড় মহৎদিগের সান্নিধ্য আমার জন্যে অত্যন্ত প্রীতির ব্যাপার হইয়াছিল।

অভিনয়ে বিনোদিনী মূর্চ্ছা যাবার কাহিনী এবং ফাদার লাফোঁর সেবা প্রাপ্তি

'চৈতন্য-লীলা' নাটকের একবোরে শেষে থাকিত একটি সংকীর্তন। সেই সংকীর্তন এক একদিন এমন হইত যে অভিনয়ের গুরুভার বহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতাম।

একদিন অভিনয় করিতে করিতে মধ্যস্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়ি... । মাননীয় ফাদার লাফোঁ সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ড্রপসিনের পরেই স্টেজের ভিতর গিয়াছিলেন; আমার ঐ রকম অবস্থা শুনিয়া গিরিশবাবু মহাশয়কে বলেন যে,– 'চল আমি একবার দেখিব।'

গিরিশবাবু তাঁহাকে আমার গ্রীনরুমে লইয়া যাইলেন; পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিতে পাইলাম একজন মস্ত বড় দাড়িওয়ালা সাহেব ঢিলা ইজের জামা পরা আমার মাথার উপর হইতে পা পর্যন্ত হস্ত চালনা করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিতে গিরিশবাবু বলিলেন,– 'ইঁহাকে নমস্কার কর। ইনি মহামহিমান্বিত পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ।'

আমি তাঁর নাম শুনিতাম, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। আমি হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমার মাথায় খানিক হাত দিয়া এক গ্লাস জল খাইতে বলিলেন। আমি এক গ্লাস জল পান করিয়া বেশ সুস্থ হইয়া কার্যে ব্রতী হইলাম। অন্য সময় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, এবার তাহা হয় নাই; কেন হয় নাই তাহা বলিতে পারি না!

একই সঙ্গে দুইটি বিপরীতধর্মী চরিত্রাভিনয় কথা

'চৈতন্যলীলা'র ইহার দ্বিতীয় ভাগ 'নিমাই সন্ন্যাস' নামে অভিনয় হয়। এই দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলা স্পিচ দ্বারা পূর্ণ! প্রথম ভাগ হইতে কঠিন ও অতিশয় বড় বড় আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক। এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার অংশ মুখস্থ করিয়া আমারয় এক মাস মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল।...

এই সময় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রস্তুত হয়। ইহাতে আমি 'বিলাসিনী কারফরমা'র অংশ অভিনয় করি। কি বিষম বৈষম্য! কোথায় জগৎপূজ্য দেবতা মহাপ্রভু চৈতন্য চরিত্র; আর কোথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা হিন্দু-সমাজবিরোধী সভ্যা স্ত্রী বিলাসিনী কারফরমা চরিত্র! আমি তো ছয় সাত মাস ধরিয়া এক সঙ্গে চৈতন্য ও বিলাসিনীর অংশ অভিনয় করিতে সাহস করি নাই। যদিও পরে অভিনয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অনেকদিন পরে তবে সাহস হইয়াছিল।

অভিনয়কালীন কত যে বাধা-বিপত্তি সহিতে হইত... । সময়ে সময়ে এত অসুস্থ হইয়া পড়িতাম যে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রায় আমার অনিষ্ট হইত। মাঝে মাঝে গঙ্গার তীরের নিকট কোনো স্থানে বাসা লইয়া বাস করিতাম এবং শনি ও রবিবারে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতাম। আমার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহার ব্যয়-ভার থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যত্নের সহিত বহন করিতেন।

অবসর গ্রহণের অস্পষ্ট কারণ

এই সময়ের মধ্যে আর একটি পরিবর্তন ঘটে। অসুখে ও নানারূপ বাধা বিপত্তিতে আমার মনের ভাব হঠাৎ অন্য প্রকার হয়। মনে করি যে আমি আর কাহার অধীন হইব না। ঈশ্বর আমায় যে স্বকৃত উপার্জনের ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিব। আমার এই মনের ভাব প্রায় দেড় বৎসর ছিল এবং সেই সময় আমি বড় শান্তিতে দিন কাটাইতাম। সন্ধ্যার সময় কার্য স্থানে যাইতাম, আপনার কার্য সমাধা হইলে ভুনীবাবু ও গিরিশবাবু মহাশয়ের নিকট নানা দেশ-বিদেশের গল্প বা থিয়েটারের কথা সব শুনিতাম এবং কি করিলে কোনোখানে উন্নতি হইবে, কোন কার্যের কোথায় কি ত্রুটি আছে এই নানরূপ পরামর্শ হইত।... কিন্তু পরিশেষে নানারূপ মনোভঙ্গ দ্বারা থিয়েটারে কার্য করা দুরূহ হইয়া উঠিল। যাহারা একসঙ্গে কার্য্য করিবারকালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, সখা ও সঙ্গী ছিলেন; তাহারা ধনবান উন্নতিশীল অধ্যক্ষ হইলেন। বোধ হয়, সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমায় থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।

অবসর নেবার আরও কারণ ও অবসর জীবনের অবলম্বন কন্যার মৃত্যু

এক্ষণে নানা কারণ বশত থিয়েটার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখময় জীবন নির্জনে অতিবাহিত করিতে ছিলাম। এই নানা কারণের প্রধান কারণ যে আমায় অনেক রূপে প্রলোভিত করিয়া কার্য উদ্ধার করিয়া লইয়া আমার যে সকল ছলনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। থিয়েটার বড় ভালোবাসিতাম তাই কার্য করিতাম। কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই। তাই অবসর বুঝিয়া অবসর লইলাম।

এই দুঃখময় জীবনের একটি সুখের অবলম্বন পাইয়াছিলাম। একটি নির্মল স্বর্গচ্যুত কুসুমকলিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া এ কলঙ্কিত জীবনকে শান্তিদান করিতেছিল।... আমায়

শান্তির চরমসীমায় উপস্থিত করিবার জন্য সেই অনাঘ্রাত স্বর্গীয় পারজাতটি আমায় চিরদুঃখিনী করিয়া এই নৈরাশ্যময় জীবনকে জ্বালার জ্বলন্ত পাবকে ফেলিয়া স্বর্গের জিনিস স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। সে আমার বড় আশা ও আদরের ধন ছিল। তাহার সরল পবিত্র চক্ষু দুটিতে স্বর্গের সৌন্দর্য উথলিয়া পড়িত!

সেই স্নেহময় নির্ভরপরায়ণা হৃদয়টিতে দেবীর পবিত্রতা, ফুলের অসীম সৌন্দর্যরাশি, জাহ্নবীর পবিত্র কুল কুল ধ্বনি, বিকশিত পদ্মের ন্যায়, মধুময় হৃদয়ের পবিত্রতা রাশি সদাই উথলিয়া আমার জীবনকে আনন্দময় করিয়া রাখিত। তাহার সেই আকাঙ্ক্ষারহিত নির্মলতা কতউচ্চে আমাকে আকর্ষণ করিত।... আমার সকল আশা নির্মূল করিয়া আমার অন্ধকার হৃদয়ে বিষময় বাতি জ্বালিয়া দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এখন আমি একা পৃথিবীতে, আমার আর কেহ নাই, শুধুই আমি একা। এখন আমার জীবন শূন্য মরুময়! আমার আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ধর্ম নাই, কার্য নাই, কারণ নাই। এই শেষ জীবনে ভগ্নহৃদয়ে জ্বালাময়ী প্রাণ লইয়া অসীম যন্ত্রণার ভার বহিয়া আমি মৃত্যু পথপানে চাহিয়া আছি। আর গাইছি আমার সেই নির্মল স্বর্গচ্যুত কুসুমকলিকা কন্যা স্মরণের একটি গান—

অভাগিনীর জননী স্নেহ উপহার
লহ মাতা শকুন্তলা জননি আমার!
সংসারের সুখ যত, তোমাতে আছিল রত,
তুমি ফেলে চলে গেছ অমর ভবনে,
তব স্মৃতি লয়ে আছি সংসার কাননে॥
ফুরায়েছে সে স্বপন সে ঘুমের ঘোর;
হ'য়ে গেছে দুখিনীর সুখ-নিশি ভোর।
ক'বে আসি দয়া ক'রে, মৃত্যু লবে দুঃখ হরে,
এই আশাপথ চেয়ে রয়েছি এখন,
কালস্রোতে কতদিনে ডুবিবে জীবন॥

আশা, উদ্যম, ভরসা উৎসাহ, প্রাণময়ী সুখকল্পনা, সকলই আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! অহরহ শুধু যন্ত্রণার তীব্র দংশন! এই আমি— অসীম সংসার প্রান্তরে একটি সুশীতল বটবৃক্ষের একটু ছাওয়ায় বসিয়া, কতক্ষণে চির শান্তিময় মৃত্যু আসিয়া দয়া করিবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছি। সেই সুবিশাল সুশীতল তরুই আমার জীবন্মৃত অবস্থার আশ্রয় স্থান!... তিনি দেবতাস্বরূপ আমার আশ্রয়দাতা দয়াময় মহামহিমান্বিত মহাশয়।

অবসর জীবনের আশ্রয়দাতা এবং তার মৃত্যুকথা

এর মাঝে আমি মরণাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া চারি মাস শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকি; আমার জীবনের কোনো আশাই ছিল না; শত শত সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, নানাবিধ চিকিৎসা শুশ্রূষা, দৈবকার্য করিয়া, প্রায় অনাহারে, অনিদ্রায় বহু অর্থ ব্যয়ে আমার মহামহিম আশ্রয়দাতা মহাশয় মৃত্যুমুখ হইতে আমায় কাড়িয়া লইলেন।... সেই দয়াময়

তাঁহার ধন সম্পত্তি, তাঁহার মহজ্জীবন একদিকে; আর এই ক্ষুদ্র পাপীয়সীর কলঙ্কিত জীবন একদিকে করিয়া দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিলেন। আমি ব্যাধির যাতনায় বিগত নাড়ি হইয়া জ্ঞান হারাইলে, তিনি আমার মস্তকে হাত রাখিয়া স্নেহময় চক্ষুদুটি আমার চক্ষের ওপর রাখিয়া, দৃঢ়ভাবে বলিতেন,– 'শুন, আমার দিকে চাহ; অমন করিতেছ কেন? তোমার কি বড় যাতনা হইতেছে? তুমি অবসন্ন হইও না! আমি জীবিত থাকিতে তোমার কখন মরিতে দিব না। যদি তোমার আয়ু না থাকে তবে দেবতা সাক্ষী, ব্রাহ্মণ সাক্ষী, তোমার এই মৃত্যুতুল্য দেহ সাক্ষী, আমার অর্ধেক পরমায়ু তোমার দান করিতেছি, তুমি সুস্থ হও! আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি কখনই মরিতে পাইবে না।'

সেই সময় তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অমৃতময় স্নেহপূর্ণ জ্যোতি বাহির হইয়া আমার রোগাক্লিষ্ট যাতনাময় দেহ অমৃতধারায় স্নাত করাইয়া শীতল করিয়া দিত। সমস্ত রোগ-যাতনা দূরে চলিয়া যাইত।... এইরূপ প্রায় দুইবার হইয়াছিল; দুই তিনবারই তাঁহারই হৃদয়ের দৃঢ়তায় মৃত্যু আমায় লইতে পারে নাই। এমন কি শুনিয়াছি অক্‌সিজেন গ্যাস দিয়া ১২/১৩ দিন রাখিয়াছিল।... সেই সময় মাননীয় বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়, উপেনবাবু, কাশীবাবু প্রভৃতি প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া আমায় যত্ন করিতেন; সকলেই এ কথা জানিত।...

বুঝি এইরূপ অসহায় অবস্থায় অসীম যাতনার বোঝা বুকে করিয়া সংসার সাগরে ভাসিতে হইবে বলিয়া, একদিন আমার দূরদৃষ্টি আমাকে সব ফেলিয়া তাঁহার পানে আমায় টানিয়া আনিয়াছিল। বোধ তাহাতেই সেই সময় আমার মৃত্যু হয় নাই। তিনি আমার হৃদয়-দেবতা, তিনি তিলেকে শতবার বলিতেন, যে,– 'সংসারের কাজ করি সংসারের জন্য; শান্তি তো পাই না; তাই বলিতেছি যে তুমি আমার আগে কখন মরিতে পাইবে না।'

আমি যখন তাঁহার চরণে ধরিয়া কাতরে বলিতাম,– 'এখন আর ও সকল কথা তুমি আমায় বলিও না। ত্রিসংসারে এ হতভাগিনীর তুমি বই আশ্রয় নাই। এ কলঙ্কিনীকে যখন সংসার হইতে তুলে আনিয়া চরণে আশ্রয় দিয়াছিলে তখন তাহার সকলই ছিল। মাতামহী, মাতা, জীবন জুড়ান কন্যা, রঙ্গভূমের সুখসৌভাগ্য, সুযশ, আশাতীত সম্পদ, বঙ্গ রঙ্গভূমের সমসাময়িক বন্ধুগণের অপরিসীম স্নেহমমতা সকলই ছিল, তোমারই জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছি; তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি ফেলে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াইব।'

তিনি হাসিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে,– 'সেজন্য ভেব না, আমার অভাব ব্যতীত তোমার অন্য কোনো অভাবই থাকিবে না। এমন বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই যে এতদিন তোমার এত আদরে, এত যত্নে আশ্রয় দিয়া, তোমার এই রুগ্ণ অসমর্থ অবস্থায় তোমার শেষ জীবনের দারুণ অভাবের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাইব। তাহার প্রমাণ দেখ যে আমার আত্মীয়দিগের সহিত একভাবে তোমায় আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। এত জেনে শুনে যে তোমার বঞ্চিত করবে– আমার অভিশাপে সে উৎপন্ন যাইবে!'

তাঁহার মত সহৃদয় দয়াময় যাহা বলিবার তাহা বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু কার্যকালে আমার অদৃষ্ট, তীক্ষ্ণ অসি হস্তে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার জীবনভরা সমস্ত আশাকে ছেদন করিয়া দেয়।...

আমি একদিন চমকিত হইয়া দেখি– আমার আশ্রয় স্বরূপ সুধামাখা শান্তি-তরু, মহাকালের প্রবল ঝড়ে কাল সমুদ্রের অতল জল মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া যাইল। আমার সম্পূর্ণ ঘোর ছাড়িতে না ছাড়িতে দেখি যে আমি এক মহাশ্মশানের তপ্ত চিতাভস্মের উপর পড়িয়া আছি। আবহকাল হইতে যে সকল হৃদয় অসীম যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া চিতার ছাইয়ে পরিণত হইয়াছে, তাহারাই আমার চারিধার ঘেরিয়া আমার বুকের বেদনাটাকে সহানুভূতি জানাইতেছে। তাহারা বলিতেছে,– 'দেখ, কি করিবে বল? উপায় নাই। বিধাতা দয়া করে না, বা দয়া করিতে পারে না। দেখ, আমরাও জ্বলিয়াছি, তবুও যাই নাই গো! সে সব জ্বালা যায় নাই! শ্মশানের চিতাভস্মে পরিণত হয়েও সে স্মৃতির জ্বালা যায় নাই! কি করিবে? উপায় নাই!'

স্মৃতি লো বিষের জ্বালা দিও নাকো আর
এসংসারে চিরদিন কিছুই না রয়;
তবে কেন দুঃখ তুমি দাও অনিবার।
তুমি মনে হ'লে প্রাণে জ্বালা অতিশয়॥
যা হবার হইয়াছে পুড়েছে হৃদয়,
কেবল বিষের জ্বালা স্মরণে তোমার।
এখন জীবন মম শ্মশান আলয়;
তবুও তোমার চিন্তা দহে অনিবার॥

'যাহারা অমূল্য রত্ন পাইয়া হারাইয়া ফেলে তাঁদের উপায় নাই। আর তোমাদের মতো পাপিনীদের হৃদয় বড় কঠিন হয় ও হৃদয় শীঘ্র পুড়েও না ভাঙ্গেও না, এত জ্বালায় লোহাও গলিয়া যায়। তোমার মতো হতভাগিনী বুঝি আমাদের মধ্যেও নাই, ওরকম কঠিন পাষাণ হৃদয়ের কোনো উপায় নাই; তা কি করিবে বল?'– এই সকল কথা বলিয়া সেই জ্বালা যন্ত্রণায় পোড়া হৃদয়ের চিতাভস্মগুলি হায়! হায় করিয়া উঠিল। তাহাদের সেই ভস্ম হইতে হায় হায় শব্দ শুনিয়া আমার তখন খানিকটা চৈতন্য হইল। মনের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক আঘাতের মতো আঘাত লাগিল, মনে পড়িল যে,– আমিও তো ঐরূপ একটী সুধাময় তরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছিলাম।...

শুনিয়াছিলাম যে দেবতারাই অনাথ প্রাণীকে সময়ে সময়ে দয়া করিতে বৃক্ষ বা মানবরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন। সেই জন্য শ্রীরামচন্দ্র, গুহক চ াকে মিতে বলে স্নেহ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে ক্ষুদ খেয়েছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও যবন হরিদাসকে দয়া করিয়াছিলেন। দুখী অনাথকে দয়া করিতে কি দোষ আছে গা? কাঙ্গালকে আশ্রয় দিলে কি পাপ হয় গা? লৌহের স্পর্শে কি পরশ পাথর মলিন হয়? না কয়লার সংস্রবে হীরকের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে?...

আমিও তো তবে ঐ দেবতারূপ তরুবরের আশ্রয় পাইয়াছিলাম। কৈ সেই আমার আশ্রয়স্বরূপ দেবতা? কৈ– কোথায়? আমার হৃদয়-মরুভূমির শান্তি-প্রস্রবণ কোথায়?

হু হু করিয়া শ্মশানের চিতাভস্ম-মাখা বাতাস উত্তর করিল,– 'আঃ পোড়া কপালি,

এখনও বুঝি চৈতন্য হয় নাই? ঐ শুন চৈত্র মাসের বাসন্তী পূজার নবমীর দিনে, মহাপুণ্যময় শ্রীরাম নবমীর শুভতিথির প্রভাতকালে ৭টার সময় সূর্যদেব অরুণ মূর্তি ধারণ করিয়া, রক্তিম ছটার কিরণ বহিয়া, পবিত্র জাহ্নবীকুল আলোকিত করিয়া, ধরায় নামিলেন কেন, তাহা বুঝি দেখিতেছ না? পবিত্র ভাগীরথী আনন্দে উথলিয়া, হাসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, সাগর উদ্দেশে কেন ছুটিতেছে, তাহাও বুঝি দেখিতেছ না? জীউ গোপাল-মন্দির হইতে ঐ যে পূজারী মহাশয় মঙ্গল-আরতি সমাধা করিয়া প্রসাদী পঞ্চপ্রদীপ লইয়া ঐ কাহাকে মঙ্গল-আরতি করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, চারিদিকে এত হরিসংকীর্ত, হরিনামধ্বনি, এত ব্রহ্মনামধ্বনি কেন গো? একি? সুরধ্বনির তীরে দেবতারা আসিয়াছেন নাকি? প্রভাতী-পুষ্পের সৌরভ বহিয়া বায়ু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? দেবমন্দিরে এত শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি কেন? কিরণছটা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যদেব কাহার জন্য স্বর্গ হইতে রথ লইয়া আসিয়াছেন? তাহা কি বুঝিতেছ না?

চমকিত হইয়া দেখি, ওমা! আমার আজ ৩১ বৎসরের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইল! এই দীনহীনা দুঃখী প্রাণী আজ ৩১ বৎসরের যে রাজ্যেশ্বরীর সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল, মহাকালের ফুৎকারে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা কাল সাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল! অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া মস্তকে প্রস্তরের আঘাত পাইলাম, শত সহস্র জোনাকি-বৃক্ষ যেন চক্ষের ওপর দিয়া ঝক্‌মকিয়া চলিয়া গেল!...

পৃথিবীর ভাগ্যবান লোকেরা শুন, শুনিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইও। আর ওগো অনাথিনীর আশ্রয়তরু, স্বর্গের দেবতা, তুমিও শুন গো শুন! দেবতাই হোক, আর মানুষই হোক; মুখে যাহা বলা যায় কার্যে করা বড়ই দুষ্কর! ভালোবাসায় ভাগ্য ফেরে না গো, ভাগ্য ফেরে না!! ঐ দেখ আবার চিতাভস্মগুলি দূরে দূরে চলে যাচ্ছে, আর হায় হায় করিতেছে।

ওগো! আমার আর শেষও নাই, আরম্ভও নাই গো!... এই আমার পরিচয়।

ইতি– ভাগ্যহীনা, পতিতা কাঙ্গালিনীর এই নিবেদন। শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী। ১১ই বৈশাখ, ১৩১৯ সাল, বুধবার।

'বিনোদিনী'র জীবনের মঞ্চরূপ গড়নে অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে : ১. 'বাসনা' (কাব্যগ্রন্থ) : শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী, ২. 'কনক ও নলিনী' (কাব্যগ্রন্থ) : শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী, ৩. 'মেঘনাদবধ কাব্য' : মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৪. 'মৃণালিনী' : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫. 'নীলদর্পণ' : দীনবন্ধু মিত্র, ৬. 'চৈতন্য-লীলা' : গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বিনোদিনী নাটক প্রযোজনার কলাকুশলী :
একক অভিনয় : শিমূল ইউসুফ; প্রথম প্রদর্শনী : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ।
নাট্যরচনার মুখ্য উপদেষক : সেলিম আল দীন
নাট্যগবেষণা : নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, শিমূল ইউসুফ, সেলিম আল দীন ও সাইমন জাকারিয়া।

বি. দ্র. : এই নাটকের ভাষারীতি ও বানানরীতিতে শ্রীমতি বিনোদিনী দাসীকৃত রীতি অনুসৃত হয়েছে।

রচনাকাল : ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

যুগান্তরো রপালো নাচি

বন্দনা

বেড়াই রাকা পিড়িল পিড়িল
লৌ কো-রিলাং দেজো॥
তালা নয় রে তালা নয় রে
লৌ কো-তিংগো এ
লৌ কো-রিলাং দেজো॥

আম গে তে হপন বাবু
লৌ কো-দাগোম লাগা॥
মাছে বাবু লাগা লাগা
লৌ কো-পারমমে
লৌ কো-দাগোম লাগা
লৌ কো পারমমে॥[১]

প্রস্তাবনা

আমি এমন দেশ ঘুরে এলাম সেই দেশ এই দেশ থেকে মোটেও দূরে নয়। বরং এই দেশের গভীরে আছে সেই দেশ। সেই দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে একশটিরও অধিক আদিবাসী-গোষ্ঠী, অথচ সেই দেশের সরকারী হিসেবের মধ্যে সর্বোচ্চ চুয়াল্লিশটি আদিবাসী-গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে।

আসলে কী জানেন, এই সেই রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের শরীরে আরও অর্ধশতাধিক আদিবাসীদের বসবাস। আর এই রাষ্ট্রের কোনো এক গূঢ় খেয়ালে সেই আদিবাসী অধিবাসীদের অনেকেই যখন আত্মপরিচয়কেই হারিয়ে ফেলেছে, হারাতে বসেছে ঠিক তখনই আমি ঘুরে এসেছি সেই সব আদিবাসী অধিবাসীদের ভেতর। এখন আমি আমার মর্মের ভেতর এদেশের সবগুলো আদিবাসী-গোষ্ঠীর উজ্জ্বল উপস্থিতি টের পাই। টের পাই।

এই তো আমার মর্মের ভেতর কে যেন মাদের বাজিয়ে নাচের তালে গেয়ে চলেছে একটি গান– শুধু একটিই গান–

আহা দাদা লে
এ দাদা লে
মনে পড়ে প্রেমী ঘর কে ছেলো॥
আহা দিদি লে
এ দিদি লে
মনে পড়ে প্রেমী ঘর কে ছেলো।

এক সঙ্গে রিহি দাদা
ভাই আর বহিন প্রিয়া লে দাদা ।
এক সঙ্গে রিহি দিদি
ভাই আর বহিন প্রিয়া লে দিদি ।[২]

দাদা, দাদা, আহা দাদা লে, আজ এই গাহান লয় । ওই দেইখো আকাশজুড়ে চাঁদে চাঁদে কারামের তিথি এলো । আমি তোহার বহিন হই তোহার মঙ্গলে কারামতিয়া হয়ে রইনু । আর তোহাই ভুল পাড়িছো গাহানে । আমিও তো দাদা বেশ! তোহার মুখের পানে চাই আজ এই ভাদ্রের মঙ্গল একাদশীর সন্ধ্যায় বৃথায় গাহান পাড়িছি । দাদা আর লয় । তোহাই অনুরোধ পাড়ি– কারাম ঝুড়ফু[৩] লে লই আইসো খৈড়ানে[৪] ।

দিদি, মুই আর ভুল না পাড়িছি । তোহাই মোহার লাগি উপাবাসী । আর ওই দিকত গুরুর-বা-নার[৫] আইয়ে ডাক পাড়িছেক– 'আওয়ারে উপবাসী মিয়ামানে । তোহারার ঝুড়ফু আনবার লগ্ন আইয়ে ।'

দিদি, মুই এহনই যাইছি । কাল মুই কারামগাছক পান-সুপারি দিই নিমন্ত্রণা আইয়েছি । তোহারা আইছো দিদি, মুই যাইছি । মুই কারাম ঝুড়ফু কাইটে তোহারার লাগি পেক্ষা করবেক । তোহারা আইছো দিদি ।

মোহার দাদার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার তিথি আজ । ভাই মে ছুটে গিহাছেক কারাম ঝুড়ফু কাটিতেক । এই দিকে গুরুর-বা-নার ডাক পাড়িয়েছেক–'আওয়ারে উপবাসী মিয়ামানে ।' তাহের ডাইকে পাড়ার কারামতিয়া মিয়ামানের সগাই সেই খৈরানে আইয়ে ।

ভাই মোহার কারাম ঝুড়ফু কাটিতেক গেইছে । সে যে ঝুড়ফু কাটি মোহারার লাগি পেক্ষা করিবেক গাছের গোয়াড়ে । চলোহ সগাই কারামতিয়া মিয়ামানে–চলোহ জলদিত সেইহানে ।

মোহারা সগাই কারামতিয়া মিয়ামানে ছুটে যাইছিক ঝুড়ফু আনিবারে । মুই থাকোছি সগার আগোত । মোহারা গাহান গাইতে গাইতে নাচোর তালে তালে এগোইছি কারামবৃক্ষের কাছোত–

'কারাম কাটতে গেলি লে ভাই টিলার উপারে
নাগ ছাম দিয়া রইছে মাথার উপারে॥'

ভাই লে, তোহাই টিলার উপ্‌রে কারাম কাটিতেক গিহাছো । আর তোহার মাথার উপ্‌রে মোহারার বন্ধু নাগ ছায়া বিস্তার করে আছে । ভাই লে, তোহার ভয় কী–'নাগ ছাম দিয়া রইছে মাথার উপারে ।' ভাই লে, মোহারা আইছি তোহার প্রিয়মঙ্গল কামনাতেক ।

উতুঙ্গ এক বাদান-নাচোন আর গাহানের সুরে ভাদ্রের ওই একাদশী চাঁদকে সাক্ষী মেনে মোহারা কারামতিয়া মিয়ামানে, মানে বহিনেরা ভাইয়ের দিকে যাইওছি । আর ওইদিকোত মোহারার ভাইয়ে নিমন্ত্রিত কারামগাছকে আরতি দেয়ছেক ।

'হে হে কারাম, গতদিনকে তোহায় নিমন্ত্রণ পাড়ি গেছি । তোহার মনে আছেক লয় । আজ্‌কা এহাই আরতি লহ । এইহন তোহার একখানকা ঝুড়ফুঁ কাটিবোক । তোহার অনুমতি চাহোছি । তোহায় অনুমতি দেহ । ওই শোনো–মোহার বহিনেরা আগোত আহিছে–নাচ্‌নে গাহানে... উহেরা তোহারার ঝুড়ফুঁ সাথেত লে গিই সারা রাতত পূজা দিবেক । মোহারা সগাই তোহাই ভজিবাক, পূজা করিবাক ।

শোনো হে কারাম, তোহাই মোহারা খৈরানে পুতিবাক, তোহাই ঘিরে কিছা করিবাক, গাহান গাহিবাক, ঝুমুর নাচিবাক । এই লহ আরতি । আর ভিক্ষা দেহ কারাম, একখানকা ঝুড়ফুঁ ।

কারাম, হে হে কারাম, তোহার অনুমতি লেই এইবার দিইছিক কোপ, হে হে কারাম হে হে ।'

কারামের এই ঝুড়ফুঁ, মানে এই একটি ছোট্ট ডাল বা শাখা কাইটে লে মুইপেক্ষা করোছিক । আর মোহের বহিনেরা এই চাঁদের আলোয় আগমনী গাহানে গাহানে নেইচে নেইচে কারামগাছের নিচে আয়ছেক । তাহেরা মোহার হাতোত ধরা কারামের ঝুড়ফুঁক ঘিইরে নেইচে নেইচে পূজা-আরতি দেইছে । তাহের পর ঝুড়ফুঁটাক হাতোত তুইলে নাচতে গাইতে বাড়ির দিকোত আগাইতে থাকে–

'চলো চলো কারাম ওগো বাড়ির আঙনে ।
তোহায় আজি পূজা দিবো ঝুমুরনাচে গানে॥'

এই কারাম-ঝুড়ফুঁ নিয়ে গৃহাঙ্গনে আয়লে বাড়ির সগাই ধান-দূর্বা, কলা, পিঠা আর প্রদীপের আলোয় তাহেক বরণ করে লয় । তাহেক বাড়ির বাইরে উঠানে পুইতে কারামের কিছা হয় ।

সে এক বিরোক্ষপ্রেমী কিছা । কিন্তু কী সেই কিছা? আর সেই কিছার ভেতরত কোন কোন কথা থাকে তা তোহেরা শুনবেক লয়?

হ হ শুনবেক ।

তাহে শুনো, ভাই আর বহিন–

হ হ দাদা কহ ।

হেই যে ঝুড়ফুঁ, হেই কী কারাম লয়?

হ হ, তাহি তো দেখবার পাই ।

হেই বৃক্ষ মোহারার কিবা দেয়? হেই লে, চুপ গেলা কাই? কহ কহ? বৃক্ষ মোহাদের কিবা দেয়?

হেই দাদা তোহাই কি কোনো এনজিও মার্কা কথা পাড়বার চাহ?

আরে না । পূজার ভেতরত এনজিও আনবু কেলাই...

ওই কথা কহ না কো... আজকালকা সগাই এনজিও ঢুকি পড়িছে...

আরে কয় কী! মুই কহি কারামের কিছার কথা আর ওই কহছো কি-না এনজিওর কথা! মুই এই কারামের ভেতরত নাই গো নাই । তোহেরাই কারাম কর । মুই যাছি ।

আরে দাদা ভাইয়ে কই যাছেন–কারামের রাতত অভিমান না লিও... তোহাই অনুরোধ পাড়ি– কারামের কিছা পাড়ো।

না এলাই মোহার মুড অফ হই গেইছে।

মুই তোহাই অনুরোধ পাড়ছি। কারামের কিছা তোহার চেয়ে আর কে-বা ভালো জানে কহ? কহ মোহারা সগাই কছি–কারামের কিছাখানি পাড়ো তোহাই। উই ভুপেন, মাপ চেহে লে। আরে আজকা রাতত বিরূপ থাকবার রাত লই। চেহে লে মাপ।

হ হ দাদা-ভাইয়ে তোহায় মোহার উপ্‌রে অভিমান না রাখিও, মুই মাপ চাছি।

তাই শোনো সগাই ধারাম-কারামের কিছা। ধারাম বড় ভাইয়ে টাকা-পয়সা বড় ভালোবাসিয়ে, হেই ব্যবসা করে দেশে দেশে। অনেক বড় তাহের কারবার।

হ হ হেই জবর কারবার।

আর কারাম ছোটকা ভাই একটু আমুদে, হাড়িয়া খেয়ে এই কারামের পূজা করতেক বহুত পছন্দ।

মোহারার মতো লয়? মোহারার মতোই তো। মোহারারও তো হাড়িয়া বহুত পছন্দ।

কারাম-পূজাও মোহারার পছন্দ। মোহারার কথা থাউক। কারামের কিছা শোনো, একদিন বড় ভাই ধারাম ব্যবসা কয়রে অনেক টাকা আর ধন-দৌলত লিয়ে বাড়িত আইসে। খৈরানে ঢুকোতেই সেহে দেইখে এরকম একখানি ডাল পুতে তাহের বউ-মিয়ামানের সাথে ভাই কারাম নাচন-গাহান পাড়িছে।

ফুর্তি লুটাছে।

হ হ ফুর্তি লুটাছে। বড় ভাইয়ে ধারাম তাহে দেইখে ভাবলে–হামি ব্যবসা কইরে এত টাকা-ধন-দৌলত উপার্জন করি বেড়াই মোহার ভাই কি-না একটা গাছের ঝুড়ফুঁ পুতি মোহারার বউগোর সাথেত ফুর্তি লুটাছে।

দাঁড়াও দেখোছি তোহার ফুর্তি।

বড় ভাইয়ে রেইগে তাহেদের নাচন-গাহানের ভেতর থেইকে কারামের ঝুড়ফুঁ ঝুড়ফুঁ-টাক পায় লাথি দি দূরেত উপাড়ে ফেল দেয়গা। ছোটকা ভাই তাহেক অনেক বাধা দেইছে–'লে মিয়া ভাই এবা করেন লা। এবা কারাম দেবতা। এবার পূজা তো জীবনের লাগি। লে মিয়া ভাই এবা করেন লা।'

আহারে কি-বা করে মিয়া ভাইয়ে।

ছোটকা ভাইয়ে তাহেক রুখতে পারল না। ছোট ভাইয়ে হেই দুঃখে হায় হায় কইরে কাঁদত লাগলো।

হায় হায়রে।

তাহেরপর বড় ভাইয়ে পেছন দিকোত তাকায় দেখোছে ব্যবসা কইরে আনা টাকা আর ধন-দৌলতের বস্তা বোঝাই ঘোড়াগুলোর একটাও নেই।

সব হারায় গেছে গা।

সে সারা গ্রাম খুঁজে তাহেদের কোথাও পায়ে না। এবার সে বাড়িত ফিরে আসে। কিন্তু কোথায় তার সেই বাড়ি-ঘর? বাড়িত ঘর-দোর সব এক ঘূর্ণিঝড়ে চুরমার হয়ে গেছে গা।

ভিটেয় যেন্ ঘুঘু চরোছে।

আর ভিটার একপাশে দেখোছে ছোটকা ভাইটি কাঁদছে। সে ভাইয়ের কাছেত গিই কহে–'এ কী হলো লে ভাই? মোহার ব্যবসার সবই টাকা-ধন-দৌলত হারায় গেছেত আর এদিকে মোহাদের বাড়িটাও দেখছি ভূমিনের সাথোত মিশে গেছে গা! ব্যাপার লে কী ভাইয়ে? কেনে এমন হলো লে ভাইয়ে?'

'মুই কিছুই না বুঝতো পারি।'

ছোটকা ভাই কহে–'মিয়া ভাই মুই জানি, মুই বুঝতো পারি কেনে মোহারার এমন হলো রে।'

'কেনে ভাইয়ে?'

'তুহি কারমাক অপমান করিছো। লাথি দিয়ছো। এটা তাহের প্রতিশোধ।'

'তাই! মুই আগেত না বুঝি ভাইয়ে। এখন বুঝোছি। এখন কেংকা করোত মোহাদের দুর্দশা কাটিবেক ভাইয়ে, তাহেই বলো।'

'কারামদেবতাকে ডেকে আনতে হবেক।'

'তাহোছে এহার প্রতিকার পাবো ভাইয়ে?'

'হ হ পাবোই।'

'মুই যাবো ভাইয়ে কারামদেবতাক আনতে। কিন্তু তাহেক কোথায় পাবো?'

'সে চলে গেছে বহুদূরে। আমি জানি না তার পথ। তার পথ তোহাকে নিজেরই খুঁজে নিতে হবে।'

'আমি তাই করবো রে ভাই।'

এই কথা কয়ে লিয়ে বড় ভাইয়ে বেরিয়ে পড়ে। যেতে পথে তার ভীষণ ক্ষুধা লাগে– সে পথের একটি বাড়িতে চিঁড়া কোটার ঢেঁকির শব্দ শুনে সে বাড়িতে গিয়ে চিঁড়া খেতে চাহোছে। কিন্তু মেয়েটা কহে–'এই চিঁড়া তো একটু খারাপ। পেক্ষা করো ভালো হলে তোহায় দিবো।'

ভালো চিড়া তোহারাক দিবো–পেক্ষা করো।

এহারপর মেয়েটা যতই চিঁড়া কোটে সব চিঁড়া আরও বেশি খারাপ হইয়ে। মেয়েটা রেগে গি তাহেক অভিশাপ দি বিদায় দেয়–'যা যা তুই একটা খারাপ লোক।'

জবর খারাপ কথা কহে।

এবারকা পথের ধারেত একটা পেয়ারা গাছ দেখবার পাইয়ে। সেই গাছ থাকি একটা পেয়ারা পাইড়ে খাইতে চাহে। কিন্তুক পেয়ারা পেড়ে হাতোত নিয়ে দেখে তার ভেতর পোকা। আবার একটা পেয়ারা পাড়ে, আরেকটা পাড়ে, আরও পাড়ে, সবটাতেই সে দেখে পোকা। এইভাবে যতগুলো দেখে সবটাতে পোকাভর্তি।

তাহের আর পেয়ারা খাওয়া হছে না?

না।

তারপর তারপর।

তারপর পথত যেতে যেতে। পিপাসার্ত হয়ে ওঠে। সে পাশের পুকুরে নেমে হাতের আঁজলায় পানি তুলে নি খাইতে যাইছো অমনি পুকুরে সব পানি রক্ত হয় গি।

রক্তপানি খাওয়া না যায়।

এবার মাঠের ভেতর রাখেলদের গরু চরাতে দেখে সে ছুটে গিয়ে বলে–'ভাই লে মোহার ক্ষুধায় পিপাসায় জান যাই। তোহারা যদি একটু দুধ দাও তো আমি প্রাণে বাঁচি।' রাখেলেরা যেই দুধ দিতে চেয়েছে অমনি গাইয়ের বাট দিয়ে রক্ত ঝরছে। রাখেলেরা তখন মনে কয়েছে–এই লোক তো কোনো খারাপ কাজ করেছে।

বহুত খারাপ লোক।

রাখেলেরা তাহেকে তাড়িয়ে দিছে। সে তখন 'হায় কারাম' 'হায় কারাম' করে ছুটতে লাগছে। ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত এক সমুদ্র পাড়ে কারামদেবতাকে খুঁজে পায়। সে কারামের কাছে তার সব দুর্দশার কথা জানিয়ে ক্ষমা চায়।

ক্ষমা করো কারাম।

কারাম কহে–'মুই গাছের দেবতা। তোহাই মোহাক অপমান করি যে দুর্দশায় পড়িছো তাহের জন্য তোহাই নিজেই দায়ী।'

'মুই অপরাধ স্বীকার করোছি। হায় কারাম মুই এর প্রতিকার চাহোছি।'

'প্রতিকার আছে। মোহাকে যদি সেবা করো তোহারা... তাহলে সব পাবে। আমি টিকে থাকলে পৃথিবী টিকে থাকবে... মোহাকে কেন ফেলে দিলে? আমি যতদিন আছি তোহার ছেলেমেয়ে সবাই টিকে থাকবে... তবে তার জন্য প্রতিবছর ভাদ্রমাসের একাদশীতে তোহাদের বাড়িতে মোহার পূজা দিতে হবে। আর মোহায় যদি তোহারা ভক্তি করো... কোনো অভাব হবে না খাবার দাবারের। মোহার জন্যে তোহারা বেঁচে যাবে। এখন বলো মোহাকে পূজা দেবে তো?'

'আমি দেবো। আপনাকে আমি সেই জন্যই তো নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

'তবে যাও পূজার আয়োজন করো। আমি তোহায় আশীর্বাদ করি।'

কারামদেবতার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে আসার পথে বড় ভাই ধারাম এবার সব কিছু ভালো পায়।

চিড়া ভালো পায়, পেয়ারা ভালো পায়, গরুও দুধ ভালো পায়।

হ হ সব ভালো পায়ে। তারপর বাড়ি ফিরে এসে দেবতা কারামের বাত্‌লে দেওয়া নির্দেশমতো রাতে ভাই-বোন ও বউদের সঙ্গে মিলে কারামপূজা করে।

বহুত আনন্দ করে। মোহারার আজকা রাতের মতো।

হ হ। পরদিন সকালে দেখে–বাড়ির বাইরের উঠানে তার হারানো ঘোড়াগুলো টাকা, ধন-দৌলত সমেত ফিরে আহোছে।

তাইলে তো বহুত ধনি হয় গেছে।

এবার তোহারা কহ– গাছ মোহাদেরকে কী দেয়? কী জানো না? আসলে কিন্তু তোহেরা সগাই সে-কথা জানো, আমি বলি শোনো– গাছ ফল দেয়... তারপরে মাটির নিচে কী আছে? আলু পাওয়া যায় না? মোহাদের লোকজন আলু খেয়ে থাকতে পারে। তাই এই গাছের সেবা মোহাদের করতে হবেক। আর এই হচ্ছে কারামের মর্মকথা।

আর এখানেই কারামের কিছা হইল সমাপন।

'এবার তোহারা ঝুমুর শুরু করো।'

'হ হ ঝুমুর লাগাও ভাইয়া, আরে দিদি ঝুমুরে টান দে না লে, ঝুমুর হইল কারামপূজার আসল আমোদ, মানে আসল আনন্দ... ॥'

সাথোত সাথোত তাহেরা ঝুমুরের আমোদে বিভোর হয় যায়ছে।

চুয়ানি খাইয়ে ঝুমুর গানার সঙ্গেক সগাই নাচিতে শুরু করছেক।

আহা সে কি আনন্দ গো... চাঁদের মায়ার নিচোত উহারা আরেক মায়া করি ফেরে।

দূর থেকে তাহেদের মাদেরের ধ্বনি দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হই ছড়িয়ে যায়ছে আরও দূরে।

মাদেরের সেই হৃদ-তরঙ্গে বনবৃক্ষের শাখারা পাতারা চাঁদকার আলো ছড়ানো মায়ার ভেতরত কেঁপে কেঁপে উঠিছে।

মাদের বাদক নবীন ওরাওঁ জানে যত দূরে এই গানের স্বর-সুর আর এই মাদেরের ধ্বনি চলে যায়ছে তাহের সগাই একদিন তাহোদেরই আপন ভূখ ছিল। তাহে এই গাহান টানিলো–'আর পাড় জুটিলা বিছেনবাড় বুহিলা'। সাথোত সাথোত সগাই ওরাওঁ আদিবাসী নাচোনে গাহান গাহিছে–

আর পাড় জুটিলা বিছেনবাড় বুহিলা
উচা নিচা ক্ষেত-ক্ষেতো হামনিতো রূপিলা
হানহিকি আদিবাসী
রে জগৎবাসী হানহিকি আদিবাসী॥ ...
আর পাড় জুটিলা লালপাগড়ি বাঁধিলা
উচা নিচা ক্ষেত-ক্ষেতো হামনিতো রূপিলা
হানহিকি আদিবাসী
রে জগৎবাসী হানহিকি আদিবাসী॥৬

এই গাহানের মধ্যেক চিৎকার করি মাদেরে একটি বাড়ি দিই নবীন ওরাওঁ কহে ওইঠেনছে–'এই থাম থাম। মোহাদের দুঃখ কত! থাম থাম।'

তাহের এহি কথায় গাহান সগাইর গাহান-নাচন থামি যায়ে। আর তাহের মিয়ামানে সুমিতা ওরাওঁকে কাছেত পায় কহোছে–'মুই কেনে এই মাদেরের ধ্বনিটাকে প্রতিধ্বনি করে দূরে দূরে বাতাসে আকাশে আর ওই যে দূরের চাঁনের আলোয় ভরে থাকা বনের সীমান্ত ছাড়িয়ে আরও ছড়িয়ে দিতে চাই জানিস সুমিতা?'

না তো বাবা। এমন কথা তো কোনোদিন তোহাই বলো নি কো!

হ হ ঠিক কইছিস মুই এমন কথা তোক বলি নি... তোই আজ তোক হেই বাস্তব কথাখেন বলবো লে বলবোই... কেহ মোহাকে থামিয়ে না লাখতে পারবেক লে কেহ লা।

বাবা তোহাই আজ এ্যাম্‌কা লাগছো কেনে বাবা!

মুই চুয়ানু খাইছু... আজ হঠাৎ মোহার মুক্তি ঘটছে লে মুক্তি... মুক্তি।

বাবা!

হামাকে তোহাই বাধা লা দিবি... মুই মুক্তির ভেতর ঢুকে পড়ছি।

বাবা, তোহাই কী হইলো বাবা!

যা যা তোহাক আমি চিনি... এহানে সগাই লে আমি চিনি।

বাবা, কি-বা কহ! কি-বা! ক্ষ্যান্ত দেহ।

আজকা রাতোত ক্ষ্যাত লা দিবোই। মুই দেহোছি–সগাই পরাধীন হই গেছে গা... আজকা রাতোত শুধু একটুখানি চুয়ানি মোহাক মুক্তির ভেতর লিয়ে গেছে গা। তোহারা কেহ সেই বাস্তব খান জানতে চাও না? না, মুই বলিবেক, বলিবেক মুই... ওই দূরের যে বন দেখা যাইছে... সগাই মোহাদের স্বাধীন ভূমিন... ওই ভূমিনরে দখল করে আছে যাহেরা তাহেরা সগাই বাঙ্গাল... মুই থু দে সগাই বাঙ্গালরে। তাহেরা মোহাদের বেবাক ভূমিন দখল লিয়ে তোহাদের বলে উপজাতি... ট্রাই-বাল... হামাক চ্যাটের বাল... তাহেরা সগাই মোহাদের বাল... চ্যাটের বাল... হা হা হা... বাঙ্গাল মুই আর কহিবো লা, কহিবো- বাল... হামাক চ্যাটের বাল।

নবীন ওরাওঁয়ের চুয়ানি খাওয়া ঘোরের ভেতরকার এমন কথায় কারাম দেখতে আসা কোনো বাঙালির পক্ষে কী সহ্য করা সম্ভব?

আর সে যদি হয় ভূমিদস্যু?

তাহলে তার পক্ষে, তার পক্ষে কী সহ্য করা সম্ভব?

সবার কথা বলতে পারবো না। তবে এইটুকু বলতে পারি–কারামের আসরে উপস্থিত ভূমিদস্যু রহমত কাজীর পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হয় না। সে দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করে ফেসে ওঠে–

'উই শালার ঝাঙ্গরনীর পুত ঝাঙ্গর। তোহার ছোট মুখে এতো বড় কথা! শালার ঝাঙ্গর, আজই তোহাদের দেখাই দিবো কারা আসল চ্যাটের-বাল। কারা... ।'

ও ভাইয়ে... ভাইয়ে রক্ষা দেহ... চুয়ানির ভরে নবীন ওঁরাও কি কহছে না কহছে... তোহায় মনে না লইও ভাইয়ে, মনে না লইও।

না কোনো রক্ষা নাইকো। তোদের কারামে আমি লাথি দি, হিসি করি।

ও ভাইয়ে মোহাদের জানে মারো... তাহেও মোহাদের কারামদেবতায় অসম্মান না করিও। ও ভাইয়ো মোহার জান লেহ।

রহমত কাজী কোনো কথা না শোনে। সে চুয়ানির ঘোরে মাতোয়ারা এই আদিবাসীদের সকল বাঁধা ডিঙিয়ে কারামের ডালটিকে পায়ে পায়ে লাথি দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দূরে।

'শালার ঝাঙ্গরনীর পুত ঝাঙ্গর, তোরা শুনে ল, সগাই শুনে ল, কাল থেকে এহানে তোদের ভিটে আর রইবেক নাকো। রইবেক না।' এমন একটা কথা বলে রহমত কাজী চলে যায়।

ততক্ষণে নবীন ওঁরাও তাহের স্বজাতির সবাকার চোখের দিকে মুখের দিকে চায়।

আর নিজের ভেতর থেকে জেগে ওঠা এক তীব্র অপরাধ-বোধে মাটির সাথে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? নবীব ভাবে,–'এ সে আজ কী করল, কেন সে মনের কষ্ট আর তাদের জীবনের এক নিগূঢ় নিত্য-সত্য বাস্তবকথাখান আর সকল আদিবাসীদের মতো বুকের খোঁড়লে কেন লুকিয়ে রাখতে পারলো না! কেন কেন?

হঠাৎ তার চোখ যায়, রহমত কাজীর পায়ের আঘাতে ম্লান হয়ে পড়ে থাকা কারাম ঝুড়ফুঁটার দিকে।

সে আগায়ে গিয়ে মহাযত্নেও সাথে কারাম ঝুড়ফুঁ-টাক হাতে তুলে নিয়ে আবার খৈরানে পুঁতে দেয়। তাহেরপর ভঙ্গ আসরের সব পূজারির কাছে গিয়ে গিয়ে কহোছে–

'তোহারা, ওইভাবে মন মরা হই দাঁড়ায় লা থাকো। এই দেবতা মোহাদের খৈরান হতেত অপমান হহছো... এহন আহছো এহার অপমান ভাঙি... আহো... দেবতার কৃপা হয়লে আজকা মোহারা প্রাণে বাঁচি... আহো আহো... '

নবীন ওঁরাও অসহায়ের মতো মেয়ে সুমিতার হাত ধরে টানে। বহিন মিনতির হাত ধরে টানে। আর নিজে নিজে মাদের বাজিয়ে গাহানের সুরে কারাম ভজনা করবার গাহছে–

দিগে দিগে দিগে বালা
যুগান্তোরো রপালো নাচি॥
যায় হারায় দশাই বন
কোথায় লে আল খেজুরবন
হায় লে সোনা দেশেল জন
তোহাই লে দেখাই লে ভাল
এ চারাগাছে বাঁধছো নি দিয়াল
এ চারাগাছে বাঁধছো নি দিয়াল॥[৭]

এই গাহানে নবীন ওরাওঁ নতুন করে পোঁতা কারাম ঝুড়ফুঁকে ঘিরে কাঁপা কাঁপা শরীর নিয়ে মাদের বাজিয়ে নাচোন পাড়িছে।

সে লক্ষ করে–ঝুমুরের এবাকার লয়টা কাহেকেও আনন্দ দেহে লা। সে তাই অন্তর্গত কান্নার ভেতর কারাম ঝুড়ফুঁকে কহোছে–

'হা হা কারাম, মোহাই মাপ দেহ, ক্ষমা দেহ... তোহার অপমান মানে মোহাদেরও অপমান... মোহারা তোহার সম্মান না রাখিতে পারি। তোহাই মোহাদের ক্ষমা দেহ... ওহারা যেন মোহাদের কোনো ক্ষতি না করিতো পারে। কারাম, হে হে কারাম।'

'কারাম কা রাতি
মোহের এহে ট্যারা সিঁথি
কাঁপেরে সিন্দুরা
আজুক দিনা রাইলে গে সাথী
সইরষা তেলকের বাতি
কারাম কা রাতি॥'

নবীন ওরাওঁয়ের এই গাহানের মধ্যে তাহের বহিন মিনতি ওরাওঁ মনের আবেগে কহোছে–

'আজ কারামের রাত। আমার মাথায় বাঁকা সিঁথি। কপালে সিঁদুর। আজকের দিনটা থেকে যাও গো সাথী... ॥ কি হে থাকবে না কারাম? মোহারা তো অন্তরের ভেতর থাকি তোহাই ডাক পাড়িছি, সম্মান দেছি, ভজনা করোছি।'

আর ওইদিকে তখনে বাঘা বাঙ্গাল রহমত কাজী কী করে?

সে কথাই কহিতে হছে–

সে বাড়িত গেই তাহের গোহালে আশ্রয় লওয়া একখানা পায়রা ধরে ছুরি মেরে তাহের রক্ত ঝরায়–'আহ বাকুম বাক'–ধান কাটার মাঠের মধ্যে গে পায়রাটি আর কোনোদিন ডাকিবে না গো–ডাকিবে না। পায়রার গা থেকে তীরের বেগে বেরিয়ে আসা রক্তস্রোত ঘাতক রহমত কাজী গায়ে ও গায়ের পোশাকে মেখে নেয়।

তাহেরপর মহাদেবপুর থানায় ছুটে যায়। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি আকরাম সাহেবের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে হাফাতে হাফাতে রহমত কাজী বলে–'স্যার, স্যার, মোক বাঁচান।'

কেনে কি হছে?

কেনে স্যার, দেখবার পায়ছেন না–মোক সারা গায় রক্ত।

আরে তাই তো... এটেম টু মার্ডার কেস লয় তো?

ইয়েস স্যার, এটেম টু মার্ডার কেস... থ্যাঙ্ক ইউ স্যার... আপনি ঠিকই আইডেন্টিফাই করেছেন... মুই আর না বাঁচি স্যার... ।

আমি আছি। কে, কারা ঘটালো এই কাজ?

স্যার, ওই ট্রাই-বাল... ওই উপজাতি ওরাওঁ-রা।

কিন্তু এ কী করে সম্ভব? ওরাওঁ-রা তো সংখ্যায় বেশি না। বলতো, আসলে– কী হয়েছিল ঘটনাটা?

স্যার, ওদের পূজায় মানুষ বলি দেওয়ার নিয়ম আছে।

আরে বলো কী!

আমি ঠিকই বলছি স্যার... মোক জোর করি বলি দিতে চায়ছিল স্যার। মুই কোনো রকমে ওদের হাত থেকে দৌড়ে পালাছি স্যার। না হলে এতক্ষণ, কখন বলি হয়ে যেতাম স্যার।

আমি এখানে নতুন এসেছি, ওদের কালচার সম্পর্কে খুব একটা জানি না... তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে–ওরা খুব ড্যাঞ্জারাস মানুষ।

ইয়েস স্যার, ভেরি ড্যাঞ্জারাস। আমার গায়ে রক্ত দেখে বুঝছেন না স্যার–আমি কী অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম।

কিন্তু আমি এই ভেবে বিস্মিত হচ্ছি যে–আমাদের দেশে এখনও পূজার জন্য মানুষ বলি দেওয়া হয়!

কিন্তু স্যার ওদেরকে চোখে দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না যে ওরা মানুষ বলি দিতে পারে... মনে হবে ওরা খুব নিরিহ... শান্ত... যেন ভেজা মাছটাকেও উল্টে খেতে জানে না।

স্ট্র্যাঞ্জে।

এখন স্যার, আমার জন্য একটা কিছু করেন।

অবশ্য করবো। চলো... ।

স্যার, যেতে পথে একটা কথা বলবো, অবশ্য আপনি যদি কিছু না মনে করেন।

বলো।

স্যার, আপনিও বাঙ্গাল মুইও বাঙ্গাল, মোরা বাঙ্গাল-বাঙ্গাল ভাই ভাই... না-কি বলেন স্যার?

হ্যাঁ, কিন্তু একথা বলছেন কেন?

স্যার, আসলে বাঙ্গাল হয়ে এই বাংলাদেশে ওই ট্রাইবালদের আর সহ্য হয় না স্যার।

আচ্ছা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি...

জি স্যার, করেন।

আমি জীবনের শেষ বয়সে এসে প্রোমোশন পেয়ে ওকি হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আপনাদের এখানে এসেছি। তাছাড়া, আগে কখনো ট্রাইবালদের ভেতর কাজ করিনি। তাই ওদের বিষয়ে একটু কম জানি।

ওকে স্যার, আমি আপনাকে হেল্প করবো।

থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, তোমাদের এলাকার এই ওরাওঁ, সাঁওতাল, মালো... এই ট্রাইবালরা কি নিজেদেরকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেয় বা দিতো কোনো দিন?

স্যার, আপনি পাগল নি? ওরা বাঙালি হইবে কেলায়? ওরা তো ট্রাইবাল, মানে উপজাতি। আমরা বলি ঝাঙ্গর।

আহা রহমত কাজী, আমি তোমাদের কথা জানতে চাচ্ছি না, আমি জানতে চাচ্ছি ওদের কথা।

না স্যার, আমি ওদেরকে কোনো দিন বাঙালি বলে পরিচয় দিতে শুনি নাই।

তাহলে তো ওরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান মানে না।

কী বলছেন স্যার!

বলছি–বহুকাল আগে চাকরির প্রথম দিকে একবার সংবিধান পড়েছিলাম। পড়েছিলাম–আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে সংবিধানের ভাষাটা... ।

কী স্যার?

বাংলাদেশের সংবিধানে পড়েছিলাম–'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।'

তাই স্যার?

হ্যাঁ হ্যাঁ–ঠিক তাই। তাহলে, এদেশে জন্ম নেওয়া এবং এই দেশে থেকে যাওয়া মানে বসবাস করা ওই ওরাওঁ আদিবাসীরা নিজেদেরকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেয় না? তুমি কী ঠিক বলছো রহমত কাজী?

জ্বি স্যার হান্ডেড পারসেন্ট রাইট বলছি স্যার।

তাহলে তো ওরা বাংলাদেশে বসবাস করে বাংলাদেশের সংবিধান মানে না–আমি নিশ্চিত যারা সংবিধান মানে না তারা রাষ্ট্রদ্রোহী।

স্যার! এই কথা বলছেন! তো আগে বলবেন না! না স্যার, ওরা কোনোদিনই এদেশের সংবিধান মানে না। ওরা স্যার এক নম্বর রাষ্ট্রদ্রোহী।

রাষ্ট্রদ্রোহী!

ইয়েস স্যার। এবার ওই ঝাঙ্গর-ঝাঙ্গরনীদের একটা কিছু করেন, স্যার।

অবশ্যই করবো। আমি আইনের রক্ষক। ওরা দেশের সংবিধান মানে না। আমার হাত থেকে ওদের মুক্তি নাই।

দ্রুত পায়ে রহমত কাজীর সঙ্গে ওসি আকরাম সাহেব ওরাওঁদের গ্রামে ঢুকে পড়ে।

তখন সকাল। আর তাহে নবীন, মিনতি, সুমিতা এবং পাড়ার সকল ওরাওঁ মাদের বাজিয়ে গাহান গেয়ে কারামের পূজা করা ঝুড়ফুঁ লয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যাইছে।

'চলো চলো কারাম ওগো নদীর উজানে/তোহাকে আজ যাইতে হবে শুধুই উজানে॥'

হঠাৎ তাদের এ পথের সামনে এসে দাঁড়ায় বাঙ্গাল রহমত কাজী এবং ওসি আকরাম। রহমত কাজীর ইশারায় ওসি সাহেব বুটের শব্দ তুলে কারামকে নিয়ে ওরাওঁদের নদীযাত্রার নাচন গাহান থামিয়ে দেয়–'স্টপ, স্টপ।'

ওসি আকরাম সাহেবের চিৎকারে কারাম ভজনায় নবীন ওরাওঁয়ের মাদের তাল এবং গাহান থেমে যায়ে।

আর এই সুযোগে নবীন ওরাওঁকে দেখিয়ে রহমত কাজী ওসি সাহেবকে বলোছে–

এই যে স্যার এই সেই ঘাতক। এহারা সগাই ঘাতক। পূজার নাম করে এরা মোহাক বলি দিবার চাইছিল।

না স্যার মোহারা উহার কিছুই করি নাই স্যার।

কিছুই করি নাই। চুপ শালা। শালা দেশের আইন মানো না, সংবিধানই মানো না।

স্যার, আমরা কোনো দিন দেশের কোনো ক্ষতি করি নাই স্যার, কারো কোনো ক্ষতি করি নাই।

কিন্তু পূজার নামে মানুষ বলি দাও।

না স্যার, মোহারা এই গাছকে পূজা করি।

স্যার মোহারা কোনো মানুষকে মারি না, অন্য কোনো জীবকেও মোহারা মারি না স্যার।

স্যার, মোহারা পৃথিবীর সব জীবের সাথেত বন্ধুত্ব করি স্যার... স্যার মোহারা যে সাপের সাথেতও বন্ধুত্ব কইরে সংসার করি।

রহমত কাজী তাদের এমনই সব কথার মধ্যে হঠাৎ করে বলে ওঠে–'স্যার, শুনলেন তো কী কয় এরা... এই শালার ঝাঙ্গরনীর জাত ঝাঙ্গরেরা না-কি সাপের সাথে বন্ধুত্ব করে স্যার... বুঝছেন তো স্যার এরা কী ড্যাঞ্জারাস।

বুঝছি... সাপের সাথে বন্ধুত্ব সিরিয়াস বিষয়!

স্যার, ওইটাই বলছি স্যার, সাপের সাথে বন্ধুত্ব করে ওরা মানুষ মেরে সাপেরে খাওয়ায় আবার নিজেরাও খায়।

না স্যার মোহারা কোনো দিন মানুষ মারি না স্যার।

স্যার, সব মিথ্যে কথা, আপনি লেট করলে ওরা আপনার উপরও হামলা করতে পারে। স্যার, প্লিজ স্যার, আপনি লেট করেন না। তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করেন স্যার।

ইয়েস, অ্যারেস্ট। হ্যান্ডস আপ। অ্যারেস্ট অল আর মেল ওরাওঁ। চল শালা, চল... জেলের ভাতের টেস্ট না নিলে তোর চলবে না। চল শালারা।

স্যার, মোহাদের কোনো অপরাধ লেই স্যার। তাও ক্ষমা চাছি স্যার। মোহারা কোনো অপরাধ করি লেই স্যার। সগোই মিথ্যে কথা স্যার।

মিথ্যে কথা! রহমত কাজী মিথ্যা বলছে, না? আর তোরা সগাই সত্যবাদী হয়ে গেছো? এই শালা, রহমত কাজীর এই কাঁচা শরীর দিয়ে এই যে রক্তের পদ্মা-যমুনা বইছে এটা কি মিথ্যে? এখন কহ মোক তুই মারিস নাই।

কাজী সাহেব, কি-বা কন! তোহাই তো মোহাদের কারামকে অপমান করলেন।

স্যার, সত্যি কহোছি–মোহারা কেহ ওহারে আঘাত না করোছি–মুই মোহার শরীর ছুঁই কহি স্যার। মোহার ভাই নির্দোষ স্যার। মোহার ভাই লে ছাড়ি দেন।

বহিন মিনতির এই আকুতি ওসি আকরাম তাহের বুটের এক লাথিতে দূরে ছুড়ে দেয়।

আর সে লাথিতে বহিন মিনতি পথের মাঝখানে পড়ে থাকে ।

সে সময় ওসি আকরাম ভাই নবীন ওরাওঁ-সহ নাটশাল গ্রামের সকল ওরাওঁ পুরুষকে ধরে বেঁধে থানায় নিয়ে গিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয় ।

এবারে নাটশাল গ্রামের সুমিতা, মিনতির মতো আরও অন্য ওরাওঁ নারীরা পুরুষ শূন্য হয়ে অসহায় দিন যাপনের বেদনায় ঢুকে পড়ে ।

তাহেরা বাবা, ভাই কিংবা পতি হারিয়েও বিচারের জন্য কোর্টে-কাছারিতে যেতে পারে না, এমনকি জেলখানাতে গিয়েও খোঁজ নিয়ে আসতে পারে না তাদের সমাজের বন্দি পুরুষদের ।

আর তাদের এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বাঙাল রহমত কাজী ও তার মতো আরও অন্য ভূমিদস্যু ওরাওঁদের সকল জমি দখল নিয়ে আবাদ শুরু করে ।

আর জীবন বাঁচাতে ভাই-হারা, পিতা-হারা আর স্বামী-হারা হয়ে ওরাওঁ নারীরা ভূমি দখলের খেলায় জিতে যাওয়া বাঙালদের বাড়িতে ঝি-চাকরের কাজ লয় ।

সে কাজের ভেতরে ভেতরে মিনতি, সুমিতা কিংবা অন্যান্য ওরাওঁ নারীরা মাঝে মাঝেই ভেবে চলে–তাদের এ পরিণতির কথা–

'না এর জন্য কেই দায়ী নয়, দায়ী মোহারা নিজেরাই ।'

'মোহারাই তো কারামদেবতাকে বাঙালদের অপমানের হাতোত থাকি রক্ষা করতে পারি নাই ।'

মিনতি, সুমিতা দিনে দিনে কান্নার ভেতর রহমত কাজীর বাড়িতে ধান সিদ্ধ করে, ধান ভানে ।

অথচ আগে, এই তো সেদিনও একই ধান নিজের বাড়িতে সিদ্ধ ও ভানতে তাদের মনে মনে যতটা আনন্দ লেগে থাকতো আজ ততটাই মনের কোণে কোণে নিরানন্দ জাগে ।

আহা, যে ভূমিনের ধান আজ রহমত কাজীর ঘরে উঠছে সে ভূমিন তো মিনতি, সুমিতাদের নিজের ভূমিন । আজ যার পুরোটাই রহমত কাজীর দখলে ।

শুধু ভূমিন নয়, এমনকি তারাও তো রহমত কাজীর দখলে–রহমত কাজীর বাড়ির ঝি-চাকরানী ।

এ যে আর সহে না দারুণ জ্বালা । কিন্তু এ জ্বালা থেকে উদ্ধার পাবারও যে কোনো পথ নেই । তাদের পুরুষেরা সগাই জেলাখানায় ।

এইভাবে বহুদিন যায় ।

বহুদিন পর একদিন–কোন এক ভাগ্যের ফলে সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে নবীন ওরাওঁ বেকসুর জেল থেকে ছাড়া পায় । সে ছুটে আসে তাদের নাটশাল গ্রামে । কিন্তু নাটশালে এসে দেখে–অবাক কা !

কোথায় মোহার বাড়ি, কোথায় মোহার ঘর?

কোথাও কিছু নাই কেনে দাদা?

ওরে মোহারা কী কারাম-কিছার চরিত্র হই গেনু! সেই যে ধারাম, কারামকে অপমান করার পর তাহের বাড়ি-ঘর, টাকা-কড়ি-সম্পত্তি সব নিশ্চিহ্ন গিয়েছিল । আজ সে স্পষ্ট দেখতে পাই তার জীবনেও তাই ঘটেছে । সে ভাবে–কিছার ধারামের মতো সেও জানে কারাম দেবতাকে আনতে । দ্রুত সে আবার ঘুরে পথে রওনা দেয় ।

এবার পথ ঘুরতেই তার সাথে বহিন মিনতির দেখা হয় ।

আরে দাদা, তোহাই!

হ হ দিদি, মুই, কিন্তু তোহার এমন দশা কেনে দিদি?

বহিন মিনতি চোখের জলে কেঁদে ওঠে । তাহের পর কেঁদে কহে আপনার মর্মকথা–

'আহা দাদা লে । এ দাদা লে
মনে পড়ে লে দাদা ঘর কে ছেলো॥'
'ভাত নে কাঙাল হলাম
লুকালে বেহাল দাদা লে দাদা ।'
'ভাত নে কাঙাল হলাম
লুকালে বেহাল দিদি লে দিদি॥'
'আহা দাদা লে । এ দাদা লে
মনে পড়ে লে দাদা ঘর কে ছেলো॥'
'আহা দিদি লে । এ দিদি লে
মনে পড়ে লে দিদি ঘর কে ছেলো ।'

দিদি আর দাদা দুজনের চোখ দিয়ে জল ঝরে যাচ্ছে । বুক ফেটে যাচ্ছে তাঁদের অন্তরের বেদনায় ।

'দাদা রে ভাতের জন্য আজ কাঙাল হয়ে গেলাম । আর লজ্জা ঢাকবার কাপড়ের অভাবে যে আমি বেহাল হয়ে গেলাম দাদা ।'

দাদা বলছে–'ওরে দিদি মোহার সেই চুয়ানি খাওয়া শেষ কারামের রাতত মুই হঠাৎ স্বাধীন হই কি-না কি কহোছিলাম । তাহের পর কে কোথায় হারিয়ে গেলাম দিদি জানি না । শুধু এইটুকু জানি দিদি সেই চুয়ানি ঘোরের ভেতর মোহাদের চিরদিনের জন্য দুঃখ লেখা হয়ছো দিদি ।'

'ঠিকই কহিছো তোহাই মাদের ধ্বনি আর কি কোনোদিন বাজবে না মোহাদের অন্ত রে এসে দাদা?'

'জানি না দিদি, জানি না ।'

দুই

অনিকেত তার মর্মের ভেতর থেকে এদেশের ওরাওঁদের জীবনকথার চালচিত্রকে ভবিষ্যতের সাথে মেলাতে পারে না–সে তাই দিশাকে বলে ওঠে–

'ওদের জীবন কথার পরবর্তী ঘটনায় সব কিছু কেমন জানি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দিশা, আমি আর সে কথা পাঠ করতে পারি না।'

'না, আমিও না। কিন্তু, এই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে কেন যেন মধুপুর বনের গারো-মান্দি, কোচ, হাজংদের কথা মনে পড়ে! কেন মনে পড়ে অনিকেত?'

তাহলে শোন তোকে বলি।

বল।

শোন দিশা, ওরাওঁদের মতোই ওই গারো-মান্দি, কোচ, হাজংদের জীবনও এক বিমূঢ় প্রহসনে ভরা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।

ওদের জীবনে প্রথম প্রহসন ঘটে ১৮৭২-৭৩ সালে। সে সময় মধুপুর গড়ের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক বন কেটে ব্রিটিশদের ইচ্ছে মতো লাগানো হয়েছিল শালগাছ, গজারিগাছ।

এখন সেইখানে আবার নতুন করে লাগানো হচ্ছে কলাগাছ... সব শালা গাজাখুরি কারবার... হা হা হা... মোর প্রোফিটেবল ফ্রুটস ইজ বে-না-না! তাই না?

না না।

নানা? ডু ইউ মিন ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডফাদার ইজ নানা?

ওহ নো, আই মিন নো, মানে না, ওদের ব্যাপারটা নিয়ে তুই এইভাবে তামাশা করতে পারিস না।

হোয়াই নট মাই ফ্রেন্ড, রাষ্ট্র ওদের সাথে তামাশা করে। আর আমি অ্যাজ এ ম্যান, অ্যাজ এ পারসোন... আমি এইটুকু তামাশা করতে পারবো না!

না। একটুও না।

কেন বন্ধু? কেন? তোর কি বনমন্ত্রীর সেই মধুপুর গড়ের 'ন্যাশনাল পার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে'র[৮] কথা মনে নেই?

মানে ইকো পার্ক নির্মাণের কথা তো?

ইয়েস।

বল।

ইকো পার্ক প্রকল্পের শুরুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বনমন্ত্রী বলেছিলেন–'এ প্রকল্পের আওতায় মধুপুর গড়ের ৩ হাজার একর বনকে দেওয়াল নির্মাণ করে ঘিরে ফেলা হবে, এতে থাকবে ২টি কালভার্ট, ১০টি পিকনিক স্পট, ৩টি কর্টেজ, ২টি টাওয়ার, ৬টি রেস্ট হাউস, ২টি পানির ট্যাঙ্ক, ৬টি রাস্তা, আর জঙ্গলকর্মীদের জন্য থাকবে ৬টি ব্যারাক এবং পাখির অভয়ারণ্যের জন্য জলাধারসহ ৯টি লেক।'

বাহ বেশ... পাখির জন্য ঘটা করে বনের ভেতর দেওয়াল তুলে লেক কেটে অভয়ারণ্য তৈরির স্বপ্ন সত্যি অভিনব।

শুধু তা-ই নয় বন্ধু, আমাদের বনমন্ত্রী এই প্রকল্প-স্বপ্নে জীবজন্তু ও পশুপাখি কিনতে চেয়েছিলেন ৪০ লাখ টাকা দিয়ে আর ৩০ হেক্টর জমির গজারিগাছ কেটে ঘাস, লিগুম আর কলাগাছ লাগাতে চেয়েছিলেন।

বাহারি বলি বনমন্ত্রীর... স্বপ্ন তার সত্যিই অভিনব... গারো-মান্দি-কোচ-হাজংদের ৩০ হেক্টর জমির গজারিগাছ কেটে ঘাস, লিগুম আর কলাগাছ লাগানোর স্বপ্ন তো সাধারণ কিছু নয়, বলতে হয় অসাধারণ।

মন্ত্রীর স্বপ্ন বলে কথা! তার স্বপ্ন তো সাধারণ থেকে একটু আলাদা হবেই। তাছাড়া বনমন্ত্রী তো আর কোনোদিন বন ঘুরে দেখেননি। বরং মন্ত্রী হবার পর বন রচনার স্বপ্ন দেখেছেন।

ইস্ একবার যদি আমরা তাকে সাথে নিয়ে বনের পথে যেতে পারতাম... সেই যে পথে আমরা হেঁটে গিয়েছিলাম দোখলা থেকে গারো গ্রাম সাধুপাড়ার দিকে।

পথে যেতে আমাদের চোখ আটকে গেলো একটি ঝাঁকড়া-শেওলা গাছে। ছোট ছোট ফুল ভর্তি গাছ। আর শত শত কীট-পতঙ্গ-প্রজাপতি কোথা থেকে যেন ছুটে এসে উড়ে উড়ে গাছটির ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় আনন্দ শিহরণে নেচে যাচ্ছে।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখি পিতরাজ, আনাইগোটা, কাশিগোটা, কাইক্কা, সিন্দুর, আমলকী, শেশ্রা, গাদীলা, দামন, তিথিজাম, দুকানাসিন, তি□ং, চোকাপাতা-সিলকিং, শুশুতুম, দুধকুরুজ, মনকাটা, কাঞ্চনপাতা আরও কত বৃক্ষ বৈচিত্র্য।

আহা মধুপুরবন তোহার আদি ও আসল সন্তানের তোহার এই বৃক্ষ বৈচিত্র্যের মাঝ থেকেই চোকাপাতা-সিলকিং আর আদুরাকপাতার সুস্বাদ নিয়ে প্রথম থেকেই আনন্দে ছিল। আর তোহার মাটির ভেতর থেকে জঙ্গলি আলু তুলে নিয়ে লবন দিয়ে সেদ্ধ করে খেয়ে ক্ষুধাকে বশে রাখতো।

আজ তোহার বনভাগে কে লাগলো আকাশিয়া?

একজন কৃষক ছুটে এসে আমাদের দেশী বৃক্ষপ্রেম দেখে বলল–'বাবারা তোহারা এই আকাশিয়ার একটা হিলে- করো বাবা।'

কেনে বাবা? কি হয়েছে?

আকাশিয়ার বাগানে প্রচুর গান্ধী পোক জন্ম হছে তাহের আ□মণে মোহাদের কৃষি ফসল (আমনধান) ও লেবু বাগানের বহুত ক্ষতি। বাবা লে, এই আকাশিয়া বাগানে গো-খাদ্য একেবারে নেই। তাকাই দেহো এই বনে কোনো পাখিও নেই।

আরে তাই তো।

আমরা তাকিয়ে দেখেছিলাম সেদিন–গারো সে কৃষকের কথাটা কতটা সত্যি–আকাশিয়ার বনে কোনো পাখি ছিল না। তবু বাংলাদেশের বনে বনে কেনো যে আকাশিয়ার এত বিস্তার ঘটে তা জানে শুধু সরকার।

সে তো আরেক কথা বন্ধু। ও কথা আজ থাক। আজ বলি–বনমন্ত্রীর সেই স্বপ্নের প্রকল্প ইকো পার্ক নির্মাণের বাস্তবটা কী হলো, সেই কথা।

তার আগে ওই দেখো দূরে–
গারো মেয়ে শিশিলিয়া স্থান নেচে নেচে সারাটা বনে গাইছে গান–

হা দুকা হা দুকা। মনা বিচ্ছি সিজা
সিনা মুন সিনা দুন। সেম সং দিগজা॥
ওহে পাখি ওহে পাখি, মনের কথা তোরে বলি–কেন তুই কোন কারণে ডিম পাড়িস না॥

গজারির শাখায় শাখায় উড়ে উড়ে বসা পাখিদের উদ্দেশে শিশিলিয়া স্থানের এই গান গারোদের সহজ-সরল জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

শুধু তা-ই নয়, প্রকৃতির প্রকৃত সংসারেক ভেতর গাছ ও পাখিদের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্কের কথাও কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে সরল ইঙ্গিতে প্রকাশ করে এই গান–'হা দুকা হা দুকা। মনা বিচ্ছি সিজা। পাখি রে তোরে বলি মনের কথা।'

বন, পাখি, আকাশ, নদী, ফসলকে মধুপুর গড়ের গারো আদিবাসী গোষ্ঠী নিজেদের প্রাণেরও অধিক জ্ঞান করে। তারা বনের বৃক্ষদের দিকে তাকিয়ে বলে–

বন হামাদের মা। হামরা মায়ের অনুমতি ছাড়া তাহের শরীরত একটা আঁচড়ও কাটি না।

অথচ একদিন হামাদের মায়ের শরীর থেকে কারা যেন বৈচিত্র্যময় বৃক্ষ কেটে লাগালো শালগাছ, গজারিগাছ, হামরা ভেবে নিলাম–এটা মায়ের নতুন পোশাক। শাল-গজারির নতুন পোশাক পরা মাকে হামরা আগের মাতোই ভালোবেসে চলি। কিন্তু... ।

কিন্তু কেন দাদা?

তোমেরা শোনো লাই... এই মধুপুর বনের ৩০ হেক্টর জমির গজারিগাছ কেটে লাগানো হবে কলাগাছ।

কি-বা কও দাদা!

শোনো শোনো, এহিটা দেশের বনমন্ত্রীর কথা... তেনাই আরও কহিছেন–হামাদের এই মধুপুর বনের ৩ হাজার একর ভুমিনকে দেওয়াল তুলে ঘেরোন দিওয়া হবেক। আর ঘেরোন দিওয়া বনকে হামাদের কোনো অধিকার থাকবেক লয়।

তার মানে এই বনকে হামরা আর প্রবেশ করতে পারবোক লয়।

না রে না।

দাদা, হামাদের মাকে ওরা দখল লিয়ে নেবেক?

হ হ।

কেনে দাদা? হামরা তো কোনোদিন হামাদের মায়ের কোনো ক্ষতি করি লয়, বিপন্নতায় ঠেইলে দেয় লাই। তবেত, কেনে ওরা হামাদের মাকে দখল লিবে? দাদা, এহা হামরা হতে দিবে লয়–হতে দিবার পারি লাই দাদা।

না দাদা, হামরা কেউ তা হতে দিতে পারি লাই।

এমনকা কথার ভেতরত হঠাৎ করি এক গারো শিশু রবীন সাংমা ছুটে আইসে। সেহি হাফাতে হাফাতে কহোছে–

হাপনারা সগাই এইহানে।

কী-বা হইছে? হাফাইছেস কেনে?

কহোছি।

ক

ওইদিকোত উহারা বন কাটিয়ে দিয়াল তুলিবার ফন্দি আটিছে।

তুহি জানছি কেমনে?

হামি আর শিশিলা দিদির পাখির ডিম খুঁজিবার গেছি ওই দিকোত–যাই দেখি–উহারা বনকে ভেতরত কি জানি সব মাপ-জোক পাড়িয়ে আর কহিছে–তাড়াতাড়ি বন ঘেরোন দিতা হবু।

তাহে?

হয় হয় দাদা, হামার খুব ভয় লাগাছে–হামাদের বনের শরীর কাইটে বাঙালরা কী সত্যি সত্যি দিয়াল তুলি দিবেক দাদা? হামরা খুব ভয় করছেক–এহাই বন কী আর হামাদের থাকবেক লয়?

আর তো সময় লাই। রবীন সাংমা যে কথা কহিছে–তাহেরপর হামরা আর কেউ বইসে থাকোতি পারি লাই–হামাদের সগাইকে এখনই মায়কে রক্ষায় এক হইতে হইবেক।

অবশ্যই দাদা।

তাই হামার সাথোত দঃফিৎরিক্কার গাহান গায় চলোহি আগায়–বনের সগাই বোন-ভাইকে এক করতে হইবেক বন রক্ষায়–বনেক শত্রু বাঙাল-পাখ তাড়েবার–গাহো সগাই–গাহো–

রা রা ননো রা
দঃফিৎ রিককে দংবরা
অংজাওদে মিগিমিক খো
ওাংসান ছা এ গালগেনরা
ভাইয়েরা বোনেরা তাড়াতাড়ি আসো। ওদের না তাড়ালে বন ঘিরে ফেলবে। ওরা অনেক বড়। ওদেরকে একা তাড়ানো সম্ভব নয়।
রা রা ননো রা হাই
আ সাম মাললে রিবাব
ওয়াল্লামে দনবাব
দংত্র দংত্র ওয়াখাপ খাপখো

সালথিক থিককে দংবরা
রা রা ননো রা হাই॥[৯]

ও আমার ভাইয়েরা বোনেরা তাড়াতাড়ি আসো। সবার সম্মিলিত হাততালিতে ওরা আপনি ভয়ে পালাবে। বনের চারপাশ দিয়ে আসো। আসার সময়ে আগুন জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে আসবে।

এই গাহানের মধ্যে পীরেন আরও আবেগে চিৎকারে সারাটা বন কাঁপিয়ে ডাকতে থাকোছে–

'ওহে বনবাসী, ওহে মধুপুর বনের সব আবাসী গারো-মান্দি, কোচ, হাজং, সগাই একত্রিত হও, সগাই–হামাদের মা এই মধুপুর বনকে বাঁচাতে হইবেক।'

এই ডাকে বন-বনান্তর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে কেঁপে ওঠে।

মুহূর্তেও মধ্যে বনাঞ্চলের শোলাকুরি ইউনিয়নের সাধুপাড়া, কাঁকড়াখুলি, জয়নাগাছা, সাতারিয়া, বিজয়পুরের কয়েক হাজার আদিবাসী নারী-পুরুষ ও শিশু গয়রা গ্রামে সমবেত হয়ছে এবং মিছিল দিবার লাগছে।

ওইদিকে এই বিক্ষোভ সমাবেশের খবর পায় সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত বনরক্ষীরা।

তাহেরা বিপুলসংখ্যক পুলিশ সাথোত কইরে ছুটে আইসে।

বিক্ষোভকারী বনবাসী আদিবাসী জলাবাধা-কাঁকড়াখুলি এলাকায় দেয়াল নির্মাণে বাধা দেয়ছে।

সাথোত সাথোত আদিবাসীদের সঙ্গেক পুলিশ ও বনরক্ষীর সংঘর্ষ বাঁধি যায়ে। ব্যাপক সংঘর্ষ। হই হই।

এক পর্যায়েক পুলিশ ও বনরক্ষীরা মিছিলকারী আদিবাসীদের উদ্দেশে সরাসরি গুলি ছুড়ি দেয়ে–'গুড়ুম' 'গুড়ুম'।

আহা, আহা।

শিকারীর বন্দুকের মুখে যেভাবে পাখির মৃত্যু হয়।

ঠিক সেইভাবে পুলিশ ও বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত হয় পীরেন স্নাল (২০)।

জলাবাধা গ্রামের মাটিতে পড়ে যায়ে পীরেনের প্রাণহীন দেহ।

সে জয়নাগাছা গ্রামের নেছেন নকরেকের ছেলে।

শুধু পীরেন লয়, পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হয় কাঁকড়াখুলি পিসিলমাঝির শিশুপুত্র রবীন সাংমা (১২)।

বেদনায় ভেসে যায়ে মধুপুর গড়ের সবটুকু প্রকৃতি–বৃক্ষ-বনানী, ফুল-পাখি, বংশীনদী, বনের প্রাণ কীট-পতঙ্গ, আকাশ-মানুষ, সগাই।

তাহের মাঝোত একটি গাহান যেন-বা সে বেদনার বনভূমির গভীর থাকি পৃথিবী জুড়ি ব্যক্ত হবার চাহে–

সিম শন সিম শন কাঁদোই প্রাণ হায় গো
বনোত কারণে হারাইলো ভাইয়েরা প্রাণ গো
সিম শন সিম শন
যোজন যোজন বছর ধরোই যে বনোত
কোনোদিনোত কোনো রক্ষী লাগে লাই
তহন হামারাই ছিলাম বনোত বনোত
আজ বনোত রক্ষীরা আইয়ে করিছে আঘাত
সিম যা সিম যা মনোত মনোত॥[১০]

আশ্চর্য একটা প্রশ্ন তো–যে বনোত সহস্র বছর ধরে কোনো রক্ষীর প্রয়োজন হয় লাই। সেই বনোত হঠাৎ কেনো রক্ষীর প্রয়োজন হলো?

বনের বুকেত যহনে ওই আদিবাসীরাই শুধু বসবাস করতো তহন তো ওরা কোনোদিন বনোত কোনো ক্ষতি করে লাই। অথচ বনরক্ষীরা আইয়ে দেহোছি বন-বান্ধব আদিবাসীদেরও প্রাণে মারলো, বন ছাড়া করলো, এবং বন কাইটে লাগাছে কলাগাছ।

আচ্ছা, বনের বদলে কলাগাছ লাগানোর রীতি পৃথিবীর আর কোথাও কী আছে?

সে কথা, আমি জানি দিশা। আমি শুধু জানি, বনের সন্তানগণ মাতৃত্ব রক্ষার প্রতিভায় প্রতিবাদে এইভাবে প্রাণ দিলে কিছু দিনের জন্য বনের শরীর কেটে ইকো পার্কের নামে লোভের দেয়াল তোলাটা থেমে যায়।

কিন্তু রাষ্ট্রের রক্ষক-পরিচালকদের লোভের জিহ্বাটা বড়ই বহুরূপী। তাই ওই দেয়াল তোলা সাময়িকভাবে থেমে গেলেও একেবারে থেমে যায় না কোনোদিনই।

এবার সেই লোভের জিহ্বা অন্য কোনো রূপে কখন যে কীভাবে আবার ওই দেয়ালটাকে বনভূমির ভেতর দিয়ে ঠিকই তুলে দেবে তা আমরা কেউ জানবো না।

তোর মনে আছে অনিকেত, একবার পীরেন আমাদের কী বলেছিল?

কোন কথা?

বুঝেছি তোর মনে নেই। আমার মনে আছে।

কী কথা?

সেই যে একদিন শরতের এক সকালে বনের পথে হাঁটতে হাঁটতে পীরেন বলেছিল–

'দাদারা, জানেন–এই বন হচ্ছে আমাদের মা, আমরা গারোরা এক মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়ে এই বন মায়ের সঙ্গে বড় হয়ে উঠি। আরেকটা কথা জানবেন–আমরা আমাদের এই বন মাকে কোনো দিন ধ্বংস করি না, কেবল ভালোবাসি। এই মাকে ছাড়া আমরা একদিনের জন্যও বাঁচবো না দাদা।'

আজ আরেক শরতের সকালে ওর কথা বলতে গিয়ে তোর ভেতর থেকে একটা দীর্ঘ বেরিয়ে এলো। কী আশ্চর্য তাই না!

আমি ভাবতেই পারছি না–ও আজ নেই ।

আমারও খুব খারাপ লাগছে । ওর কথা আর না ।

দুজনে দুজনার চোখ মোছে। তাহেরপর ওরা একটুখানিক স্বাভাবিক হইয়ে কহোছে–

মধুপুরের বন এলাকার বনভাগ কেটে কলাগাছ এখনও বোধকরি লাগানো থামে লাই ।

এই তো সেদিন আমরা মধুপুর গড়েত গিয়েছিলাম–নির্বিচারে বনের সব বৃক্ষ কাটা দেখতো, আর গাছ কাটি ফেলা বিরান বনভূমির ছবি তুলতো ।

যেখানে কিছুদিনের মধ্য কলাগাছ লাগোনোর কথা ছেলো–বনের গাছ কাটি কলাগাছ লাগোনোর প্রোফিটেবল পরিকল্পনা ছেলো ।

ঠিক তাহোই–তোর দেখি সবোত মনে আছি ।

খুব মনেত আছি–একদল রক্তচক্ষু মানুষ রাম-দা তুলি আমাদের ধাওয়া করোছিল । আমরা ছুটছিলাম গাছ কাটি ফেলা বিরান বনভূমির মাঝ দিয়ো । আর বারবার আমরা কাটি ফেলা গাছের কাণ্ডে ও শিকড়ে বেঁধে পড়ে যাইছিলাম । তাহেরপর উঠে আবার দৌড় । আবার কাটি ফেলা গাছের কাণ্ডে বেঁধে মাটিত পড়ে গেলাম । পিছন ফিরা দেখি রাম-দা হাতে রক্তচক্ষু মানুষটি আমাকে আঘাত করোতি–আমাকে হত্যা করোতি আমার খুব কাছোত চইলে আইয়ে । আমি প্রাণ বাঁচোতি লাফাই উঠি দৌড় দিই । দৌড় দৌড়–আমার প্রাণ যেন-বা সে দৌড়ের ভেতর উবাই যেতে চাহোছিল বাতাসে ।

ওদিকে আমাদের ক্যামেরাম্যানকে দেখলাম–ক্যামেরা বাঁচোতি বাঁচোতি গাড়ির দিকে দৌড়ে চলোছে । আমি একটু পিছায় পড়েছিলাম । তাই আমাকে আরও শক্তি নিয়ে দৌড়াতে হইছিল । আমরা জানতাম–ওরা আমাদের নাগাল পাইলে নির্ঘাত খুন করি ফেলবেক । তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়িত উঠি পালায় যাওয়াই ভালো ।

গাড়ির কাছোত থাকি আমাদের ড্রাইভার দেখোছে–আমরা ধারালো রাম-দায়ের আ□মনের আগে আগে প্রাণপণে দৌড়ে আসোছি । সে দ্রুত গাড়ির দরজাগুলো খুলে দিয়া গাড়িত উইঠা স্টার্ট দেহে । গাড়িতখান ঘুরাইয়া সে রাস্তার দিকোত মুখ করি এমনভাবে প্রস্তুত থাকোছে–যেনে আমরা পৌঁছানোমাত্র গাড়িতে উঠতে পারি । আর গাড়িতে ওঠামাত্র সে এক টানে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পারে শহরের দিকে ।

আমরা পড়ি মরি করি দৌড়ে দৌড়ে একসমে কোনো রকমে গাড়িতে উইঠে বসি ।

সাথে সাথে আমাদের ড্রাইভার স্ট্রিয়ারিং ধরি গাড়িকে লয় রাস্তায় উইঠে দেয় এক টান ।

আমরা গাড়ির জানালাত চোখ রাখি হাফাতোই হাফাতোই দেখি তাহেরা এবার রাম-দা হাতোত গাড়ির পাছোত পাছোত ছুটিছে ।

ড্রাইভার গাড়িত আরও জোরে টান দি তাহেদের পেছান ফেলা আমাদের শহরে লয় আইসে ।

শহরে আসি হাসপাতালে যাই রক্তঝরা পায়ের প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে ।

ডাক্তার আমাদের জুতা ছেঁড়া পায়ের অবস্থা দেখে প্রশ্ন করেন–'এমনটা হলো কেমন করে?'

আমরা উত্তর করলে ডাক্তার বিস্মিত হই বলেন–'আপনাদের সাহস তো মন্দ না–আজ তো আপনারা জীবন বোনাস নিয়ে ফিরে এসেছেন । আপনার যা বললেন তাতে আপনাদের আজ বাঁচার কোনো কথাই ছিল না । কেন ভাই কি দরকার ছিল জীবনের এমন ঝুঁকি নেওয়ার?'

দরকার আছে ডাক্তার–সব বন যদি কাটি ফেলে ওরা তাহলে ওই বনবাসী গারো, হাজং, মান্দিরা কোনখানেত যাইবে?

কিন্তু ছবি তুলে বন কাটা থামাবেন কিভাবে?

সেইটা হয়তো বুঝবেন আপনায় । তবে, আপনাকে এইখানি বলি–ডাক্তার, এ কথা তো সারা দেশবাসী জানে না যে গারো-হাজংদের আবাস থাকি বন কাটি ফেলা হচ্ছে, বলেন জানে? আপনি জানতেন?

না ।

আমরা সেই কাজটি করবার চাইছি ।

আসলে বন কাটার ছবি তুলে রাষ্ট্রের সচেতন নাগরিকদেরকে জানাতে চাইছি–এটা অন্যায়, তাই একে প্রতিরোধ করা দরকার ।

আমি আপনাদের কাজকে সম্মান করছি। কিন্তু জানি না, আপনারা কতটুকু সাকসেস হতে পারবেন ।

পারবো ডাক্তার, কারণ, আপনার কথার ভেতর দি আমাদের সমর্থন পেয়ে গেইছি ।

আমার একার সমর্থন দিয়ে কি হবে?

হবে ডাক্তার । হবে । কারণ, আমরা জানি, একা একা একসঙ্গে মিলে গেলে একদিন হাজার জনতা পূর্ণ হয় । সেই দিন যা ইচ্ছে তা-ই সম্ভব করা যায় ।

ইউ সুড বেস্ট লাক ।

ডাক্তারের এই শুভ কামনা আমাদের প্রত্যয়কে আরও কয়েক গুনাই বাড়িয়ে দিয়ে ছিল । কিছুদিন বাদে আমরা বিভা সাংমার বাড়িতে গারোদের একটি দুঃখু সু আঃ দেখতে গিয়েছিলাম ।

সেদিনের আসরে উঠানে মাঝখানে দাঁড়িয়ে শিশিলিয়া স্থান ও বিভা সাংমা পাখির মতো দেহের ভঙ্গি করে নাচের সঙ্গে গেয়েছিল একটি গান–

হাই সারি রিঃনামা
দখু সুএ রঃনামা
ফাংসি রোরো জাজং নাম্মা
নক্মা ওয়ানগালেং আনা॥

ওগো সারি চলো যাই/ঘুঘুর নাচ দেখতে যাই/ফুটেছে চাঁদের আলো/ওয়ানগালার সময় এলো॥

জাংগিৎ থিংগিৎ দাকগাছা
আইওজাংখি রপবেহা
গাকগু দাকদাক নিথোরিরি
হাই সারি রঃবনে॥

তালে তালে হেলে দুলে/নাচবো মোরা সবাই/গলা নেড়ে নাচলে পরে/কত সুন্দর দেখায়॥

বিলদিং বিলদিং দাকনাবে
বিলদিং অনি জিৎনাবে
রনদো রনদো জারিক গেহা
হাই সারি রঃবনে॥

তাল মাত্রা খেয়াল রেখে/নাচবো মোরা সকলে/দলে দলে নাচবো মোরা/এক সাথে গাই মিলে॥

দামা দাদি থিংচাং এ
আইও খ্রা থো স্রাংএ
নাম্‌মে নাম্‌মে দংএ দংএ
দাদি ছাংএ রঃবনে॥[১১]

দামা দাদিক বাজিয়ে/নাচবো মোরা সবাই/মন মাতানো ঢোলের আওয়াজ/থেকে থেকে নাচায়॥

পাখি হয়ে বিভা আর শিশিলিয়ার এই নাচা-গাহানার আসরের রাত্রি পারিয়ে যায়ে মুহূর্তে যেন। আনন্দ ঝরলে নাকি এমনই হয়–সময়টা দেখতো দেখতো চলি যায়। আর দুঃখ ভার এলে সময় পাথর হয়ে যায়। দুঃখভারের সময় সহজে যেতে চায় না। থির হয়ে বসে থাকে।

তাহেদের দুঃখু সু আঃ-র রাত্রে মানে ঘুঘু নাচের রাত্রে কোনো দুঃখ ছিলো না। তাহে বুঝায়–রাত্রিটা দেখতো দেখতো পার হই যায়ে।

রাত্রি শেষ দিন আয়ে। দিনের আলোয় সেই আসরের নারীরা মধুপুর গড়ের ইকোপার্ক এলাকা থেকে গাছের শুকনো ডাল কুড়াতে যায়ে।

সারাদিন শকনায় ডাল-খড়ি কুড়িয়ে উহারা বোঝা বেঁধে মাথায় করে বাড়িতে ফেরার পথে হাঁটে। আর তখনই পথের কাটা হই বাঙালি বনরক্ষীরা চিৎকার করি কহে–

এই জঙলারানীরা থাম থাম।

কি-বা দাদারা? হামাদের থামাইছো কেনে?

তোমরার মাথায় এবা কী?

কেনে দেখবার পাও না? শুকনা ডাল-খড়ি।

পার্ক-বাগানের ডাল-খড়ি আমরার সামনে দিই নিয়ে যাবার লাগছো–তোমারার সাহস তো কম লয়! সব ডাল-খড়ি নামা, নামা কহোছি।

দাদারা, হামাদের কথা লেও–হামারা গাছোত থাকি এই ডাল-খড়ি ছাটাই লাই–হামরা গাছোর তলাত তোই কুড়াই আনছি। হামাদের ছাড়ি দেহো দাদা, ছাড়ি দেহো।

ছাড়ি দেহো ছাড়ি দেহো। কীয়ের লাই ছাড়ি দিবাম? চাঁদাও তো দিস নাই।

চাঁদা পাবো কোহাই দাদা? হামাদের ছাড়ি দেহো। এই ডাল-খড়ি লাই হোলি রাদনা করি কেবাই দাদা। রাদনা না করতেক পারলে যে উপাস মানতে হবে দাদা, ডাল-খড়ি লই যেতোই দেহো দাদা।

চাঁদা না দিয়ে যাতোই পারবাম না।

চাঁদা পাবো কোহাই দাদা? হামারা বহুত গরিব আদমি।

কি কহোছে–শুনলে হাসি আইসে। আরে তোমরার শরীরখান আছে লাই?

শরীর সুখ দিলাই আর চাঁদা চাহোবো লাই। শরীরটা দে নারে বনের হরিণীরা... দে নারে।

লা। লা লা। লা লা লা।

না করিস নে... আয়ে আমরার বুকের মাঝোত।

লা।

আয়।

লা। ছাইড়ো দেও।

আরে লাজ পাড়িস। সব ঠিকোই হয় যাইবে। আয়ে আমার বুকের মাঝোত।

লা আমি তোরে লাথি দিই।

কী আমরারে তুই লাথি মারলি–আজ তোরই এক দিন কী আমরার একদিন দেখে নিচ্ছি।

এই পর্যায়ে বাঙালি বনরক্ষীরা ক্ষেপে গি উহাদের উপর গুলি চালায়। প্রাণ-বিপন্ন হই শিশিলিয়া স্থান রক্তাক্ত মাটিত পড়ি যায়ে।

আর আমরা তখন বনভাগের বুকোত দাঁড়িয়ে শিশিলিয়া-বিভার রাত্রে গাওয়া দুঃখু সু আঃ বা ঘুঘু নাচের আনন্দ গাহানকে করুণ সুরে প্রতিধ্বনিত হতে শুনি।

খুবই আশ্চার্য! না?

অথচ বনের ভেতর এ সব আজ সাধারণ চিত্র।

তোকে যদি প্রশ্ন করি–বন ভাগটার উত্তরাধিকার কে? বাঙালি না-কি আদিবাসী?

আমরা সবই জানি, সবই মানি, কিন্তু বন দখলের প্রশ্নে কিছু মানি না, এই হচ্ছে, আমাদের দেশের বিধান, বিশ্বেরও বিধান, পৃথিবীর সব দেশে আদিবাসীদের প্রশ্নে কেন এমনই হয়?

জানি না ।

জানি না মানে?

আমি কী আদিবাসীদের বন দখল করেছি কোনো দিন!

তা আমি করিনি । কিন্তু আদিবাসীদের প্রশ্নে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের মানুষ কেন নীরব থাকে? আমি সেই কথাটি জানতে চাচ্ছি ।

উত্তরটা জানি না ।

এটা তোর ভান কথা । তোর এই কথার মধ্যে দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুই জাতে বাঙালি এবং এই রাষ্ট্রের ঘাতক প্রতিনিধিদের প্রতিচ্ছায়া মাত্র ।... ইয়েস, এই রাষ্ট্রের ঘাতক প্রতিনিধিদের প্রতিধ্বনি তোর কথার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে... এই রাষ্ট্রের ঘাতক প্রতিনিধিদের প্রতিচ্ছায়া–আই হেইট ইউ ।

আমিও তোকে একই কথা বলি–আই হেট ইউ ।

নো । আই হেইট ইউ ।

আই হেইট ইউ ।

আই হেইট ইউ ।

আই হেইট ইউ ।

আই হেইট ।

আই হেইট ।

হেইট ।

হে-ই-ট ।

উভয় উভয়ের প্রতি যখন এইভাবে ঘৃণা উদ্গারের মত্ত হয়ে ওঠে তখন সে স্থানে আকস্মিকভাবে ছুটে আসে আদিবাসী তরুণী রূপ্না চাকমা ।

তিন

রূপ্না চাকমা আকূল হয়ে অনিকেত ও দিশাকে লক্ষ করে বলে–

‘ও দাদা, ও দিদি, মোর বহিনরে ওরাই লয় গেইছে । লয় গেইছে... মোর বহিনরে তোমরা কেহ উদ্ধার করি দেহোছে... উদ্ধার করি দেহোছে... মোর বহিন ছাড়া ন চলিবেক... চলবেক ন বহিন ছাড়া ।’

রূপ্নার হৃদয় আকূল কান্না-আবেদনের ভেতরত তাহেদের নিজেদের ঘৃণা উদ্গার থেইমে যায়ে ।

কিন্তু উভয়ে সেই ক্রন্দনরতা চাকমা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে তখনও কোনো আবেগ প্রকাশ করতো পারে না ।

বরং চোখ ফিরিয়ে গভীর আক্রোশে ভরা নিজেদের চোখের দিকই নিজেরা তাকায় ।

ওইদিকে পাহাড়ি মেয়েটা তখন আরও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে কহোছে–

‘তোমাদের কারো মনে এতটুকু মায়া নাই... এতটুকু নাই... মুই মোর বহিনের লাগি কাঁদি... আর তোমরা কেহ না মোর দিকোত ন চাও... দাদা রে, দিদি রে, তোমরা কী মোকে পাহাড়ি দেইখে ভয় পাও... মুই কহোছি... মোরা পাহাড়ি হলেও মোরা তো রক্ত-মাংসের মানষ... তোমাদের মতোই... আজ মোর সেই বাহিন নাই রে... যে বহিন মোরে কহেছেলো–বাঙালিরা যেমন এইদেশের মানষ–পাহাড়িরাও তেমন এই দেশেরই মানষ... মোর বহিনের কথাত কী কোনো ভুল ছেলো দাদা? কহো দিদি মোর দিদি কী ভুল বলিছেলো?’

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে দিশার পায়ের উপর পড়োছে । এবার দিশা তাহেকে দুই হাতে ধরে মুখোমুখি বইসে কহে–‘রূপ্না, কী হয়েছে?’

দিদিকে আর্মিরা ধরি লই গেছে–তোমরা তাকে ফিরাই আনি দাও দিদি, ফিরাই আনি দাও ।

আবার কাকে ধরে নিয়ে গেছে রূপ্না? তুমি আজ কার কথা বলছো?

তুমি এখনও বুঝতে পারোনি দিদি!

না । বল কে?

দিদি, মুই কহোছি বহিন কল্পনা চাকমার কথা । কল্পনার কথা ।

কল্পনা!

বহিনকে তোমরা উদ্ধার করি আনি দাও । রাতের আন্ধারে আর্মিরা মোর বহিনকে বাড়িত থাইকে ধইরে লই গেছে ।

কল্পনাকে ধরে নিয়ে গেছে... না না, এ হতে পারে না । না ।

দিদি, মুই জানি, খবরটা মিথ্যা লয় । সত্যি বলছি দিদি, মোর বহিন কল্পনারে আর্মিরাই ধইর লয় গেছে ।

এতক্ষণে অনিকেত কথা বলে ওঠে–‘আমি জানতাম এমন একটা কিছু ঘটবে ।’

মানে!

না, বিস্ময়ের কিছু নাই, তুই যতটুকু জানতি, আমি তার থেকে যে খুব বেশি জানতাম তা কিন্তু নয় ।

তাহলে তুই কী বলতে চাইছিস?

কল্পনার সাহসী কথাবার্তা আর কর্মকাণ্ডের কথা বলছি । আর বলছি... ।

কী?

না, এই কথাটা থাক । এখন বরং চলো কল্পনার খোঁজে রাঙামাটির উদ্দেশে পথে রওনা দেই ।

দাদা রে, দিদি রে, তাই চলেন ।

চলো ।

পথে যেতে যেতে তাদের মন-কানে বেজে চলে এক পাহাড়ি নদীর গাহান–সে গাহানের সুর-শক্তি নিয়ে তারা পথ চলতে থাকে দুর্গম পাহাড়ের দেশে ।

কর্ণফুলি দুলি দুলি কদু যেবে কনা
যেদুং চাং মুই ত সমারে মরে নে যানা॥
কর্ণফুলি হেলে দুলে কোথায় যাবে বলো না/যেতে চাই তোমার সাথে আমাকেও নিয়ে চলো না॥
কোন মোনত্তুন এচ্ছোস তুই কোন সাগরত যেবে
মুইও যেম ত সমারে মরে কি তুই নিবে॥
কোন পাহাড় থেকে এসোছো তুমি/কোন সাগরে মিশে যাবে/আমিও যাবো তোমার সাথে/আমাকে কি সাথে নেবে॥
হাতজোড় গরং ও বোন মরে নে যানা সমারে
ন অলে মুই হেনে যেম মরে তুই কনা
যেদুং চাং মুই ত সমারে মরে নে যানা॥[১২]
করজোড়ে করি মিনতি/ও বোন আমাকেও সাথে নিয়ে চলো না/এছাড়া আমি কীভাবে যায় তুমি আমায় বলো/যেতে চাই তোমার সাথে/আমায় নিয়ে চলো না॥

একটা ঘুটঘুটে রহস্যাবৃত রাতের ভেতর দিয়ে আমরা পথ চলতে থাকি।

জানি জানি, খুব বেশি আশাবাদী না হলে এই অন্ধকারের ভেতর এক পাও ফেলা সম্ভব নয়।

সম্ভবত আমরা একটু বেশিই আশাবাদী। কেননা, আমাদের ভাবনা বলে–কল্পনার মতো কোনো উজ্জ্বল মেয়ে সে পাহাড়িই হোক আর বাঙালিই হোক সে হারিয়ে যেতে পারে না।

আমরা ভাবতে থাকি–একবার, শুধু একবার যদি রাঙামাটির পাহাড়ে পৌঁছাতে পারি, তাহলে নিশ্চয় কল্পনাকে পেয়ে যাবো। সেই আশা নিয়েই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পথ চলা।

রাঙামাটি শহর জুড়ে আজ লোডশেডিং, এমনকি মাথার উপরকার আকাশটাও মেঘলা হয়ে আমাদের জন্য এতটুকু আলো অবশিষ্ট রাখেনি।

তবুও আমরা কল্পনার অন্বেষণে রাঙামাটি শহর থেকে কল্পনার বাড়ি নিউ লাল্যাঘোনার উদ্দেশে লঞ্চে উঠি। নীচের কাঁচালং নদীটাও পাহাড়ি ঢলে ফুলে ফেঁপে উঠছে।

আর লঞ্চ চলছে সে ঢলের উজানগতি ঠেলে অতিমন্থরে সামনে। নদী তীরবর্তী রঙরাঙ পাহাড়ের চূড়ায় খানিক পর বসা অসংখ্য সেনা ছাউনির কাঁপা কাঁপা আলো দেখে আমরা ভাবি, প্রকৃতির বুকে ওরা ভৌতিক প্রহসনের মতো এই অন্ধকারেও জেগে আছে।

তারপর কয়েকবার নৌকা বদল করে দূরছড়ি, বাঘাইছড়ি পেরিয়ে আমরা কল্পনা চাকমার বাড়ির ঘাটে পৌঁছি।

কল্পনার ষাটোর্ধ্ব মা বাঁধুনি চাকমা বেরিয়ে আসেন।

বেরিয়ে আসেন পুত্রবধূ চারুবালা।

দুই ভাই কালীচরণ চাকমা ও লালবিহারী চাকমা তাদের পাশে এসে বসে।

আর উঠানে জুড়ে ভিড় করে নিউ লাল্যাঘোনার গ্রামবাসীরা।

কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই স্তব্ধ, বিহ্বল।

এতগুলো স্তব্ধ-বিহ্বল মুখ আমরা আগে কখনো দেখি নাই। তাদের সেই স্তব্ধতার মধ্যে মাতা বাঁধুনি চাকমা ডুকরে কেঁদে বলেন–'রাত্রি তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। ওরা আইয়েছিল সেই ক্ষণে।'

তার কথার সঙ্গে পুত্রবধূ চারুবালা যোগ করে–'ওরা দুয়ারের দড়ি কেটে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আমি বাতি জ্বালাতে গেলে ওরা ধমক দিয়ে আমাকে বাঁধা দেয়।'

এপর্যায়ে কালীচরণ বলে ওঠেন–'ওরা প্রথমে ছোটভাই লালবিহারীর চোখ বাঁধে। তারপর আমার। কল্পনার চোখ বেঁধেছিল কি-না তা আমি জানি না। সব কিছুই তো অন্ধকারের ঘটেছে। কল্পনা হাঁটছিল আমার হাত ধরে। হঠাৎ জল তোলা, স্নান করা ঘাটের কাছাকাছি এসে ওরা গুলির নির্দেশ দেয়।'

লালবিহারী বলেন–'সে কথা শোনামাত্র মুই বিলের জলোত ঝাপাই পড়ি।'

কালীচরণ বলেন–"পরক্ষণে মুই গুলির শব্দ শুনতে পাই। মুই ভাবলাম ছোট ভাইকে মেরে ফেলেছে। এবার মোকে মারিবে। এই ভাবি হঠাৎ করি কল্পনার হাত ছাড়ান দিয়া ছুইটে পালাতে থাকি। তখন আরেকটা গুলির শব্দ শুনি। আর শুনি কল্পনার 'দাদা' 'দাদা' চিৎকার।

সেই রাতোত আমি বাড়ি ফিরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে লই মশাল জ্বালি মোর বোন কল্পনাকে খুঁজতে বের হই। কিন্তু সারা রাত কোথাও বোনকে পাই নাই। বিলের জলোত শুধু লালবিহারীর লুঙ্গি এবং ওদের ফেলে যাওয়া গুলির থলে ছাড়া কিছুই পাই নাই।"

লালবিহারী বলেন–'পরদিন মুই কল্পনার অপহরণকারীকে শনাক্ত করি।'

কীভাবে শনাক্ত করলেন?

মোরে ধইরে নিই যাইবার সমে ওরা যখন সবার চোখে আলো মারে তখন মুই হাত দিয়ে সেই আলো আটকাতে যাই। অমনি সে আলোর প্রতিফলনে লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস এবং দুজন ভিডিপি নুরুল ও সালাহকে মুই চিনে ফেলি।

তাই পরদিন মোরা প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান সম্রাটসুর চাকমার সঙ্গে কজইছড়ি সেনা ক্যাম্পে যাই। সেখানে লেফটেন্যান্ট ফেরদৌসের সাথোত মোদের দেখা হয়য়ে।

ক্যাম্পে গিয়ে তাকে দেখামাত্র আমি জিজ্ঞেস করি–'মোর বোন কোথায়?'

সাথে সাথে তিনি গর্জে ওঠেন–'শালা মদ খাইছো, পাগল নাকি! এই শালা শান্তি বাহিনী থেকে ফিরেছো কবে? যা শালা, নইলে তোরেই বন্দি করে রাখবো।'

লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস এভাবেই মোদের তাড়িয়ে দেয়।

মোর বোনটা একটু প্রতিবাদী ছিল।

মোরা পাহাড়ি। মোদের উপর করা বাঙালি হোক বা সেনা অফিসারদের অত্যাচারকে মোরা যেভাবে মেনে নিতাম। ও তেমনভাবে কোনো কিছু মানতে পারতো না।

এটাই বোধহয় ওর সব থেকে বড় দোষ ছিল।

দিশা তাদের কথার মধ্যে বলে ওঠেন–'দোষ বলছেন কেন? এটাই তো ওর গুণ হবার কথা।'

কালীচরণ বলেন–'না দিদি। পাহাড়ি হয়ে এই পাহাড়ে টিকে থাকতে গেলে অত্যাচারের কোনো প্রতিবাদ জানতে নেই।'

এ কি বলছেন!

আমি ঠিকই বলছি। আমার বোনটা প্রতিবাদী ছিল।

এই তো কিছুদিন আগে সেনাসদস্যরা আমাদের গ্রামের কৃপামোহন, রাঙ্গামোহা, দাদিরাম, ভাটারাম, ননীগোপাল, কাশ্মীর ও অজয়ের সাত সাতটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। কল্পনা এ ঘটনার প্রতিবাদ করেছিল।

এরপর বিজু-উৎসবের কিছুদিন আগে লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ও ১৫-২০ জন সেনা সদস্য আমাদের বাড়ি এসে কল্পনার কাছে ভুল স্বীকার করতে আসে। কিন্তু কল্পনা তাদের দেখামাত্র ক্ষেপে ওঠে–

আপনারা কেন এসেছেন?

আমরা আপনার কাছে ভুল স্বীকার করতে এসেছি।

ভুল স্বীকার! কীসের ভুল স্বীকার?

আমরা খবর পেয়েছিল ওই বাড়িগুলোতে শান্তিবাহিনী আশ্রয় নিয়েছে... কিন্তু ওটা রং ইনফরমেশন ছিল।

শুনুন শুধু শুধু শান্তিবাহিনীকে দুষবেন না... আপনারা যা করছেন তাতে শুধু শান্তি বাহিনী কেন সাধারণ আদিবাসীরা আপনাদেরকে ছেড়ে কথা বলবে না। এই কথাটি মনে রাখবেন। আজ আপনি এতগুলো সৈন্য নিয়ে এক আমার কাছে ক্ষমা চায়তে এসেছেন, একদিন প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে আপনাদেরকে ক্ষমা চেয়ে আসতে হবে। আমি সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছি জেনারেল।

তোমার ওই স্বপ্ন-কল্পনা কোনোদিনই... ।

চুপ জেনারেল, আমার স্বপ্ন নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন না... ভুলে যাবেন না, আমরা এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সমগ্র লাল্যাঘোনার চাকমাদের কণ্ঠস্বর মিশে আছে... এ আমার মুখের কথা নয় জেনারেল, এটা আমি বিশ্বাস করি।... আপনি এখন যেতে পারেন জেনারেল।

যাচ্ছি, তুমিও শুনে রাখো কল্পনা, পাহাড়িদের কোনো চেষ্টায় কোনোদিন সফল হবে না।

আমি বলছি হবে।

হবে না।

হবে।

না।

লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস যেতে যেতে এইভাবে 'হবে না' 'না' বলে গ্রাম ছেড়ে ক্যাম্পে চলে যায়।

আর এই দিকে কয়েকটা দিন বাদেই আসে বিজু উৎসবের দিন। ফুল বিজুর জন্য ভোরের আলো ফোটার আগে চাকমা নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে ফুল তোলার জন্য বাগানে, বনবাদাড়ে–যেখানে ফুল পাওয়া যায়। আজ নিজের বাগানে তো বটেই, প্রতিবেশীর বাগান থেকে পর্যন্ত ফুল চুরি করতে কারো কোনো বাধা নেই।

কল্পনা কোনো দিন ফুল চুরি করেনি। আজও করলো না।

সে শুধু নিজের রাতভর জেগে জেগে নিজের ফুলের বাগান পাহারা দিয়েছে যেন অন্য কেউ তার বন থেকে ফুল চুরি করে না নিয়ে যায়।

ভোরে উঠে নিজের বন থেকে ফুল তোলার আনন্দ তাই তার হাতে হাতে ভরে যায়।

কল্পনা পাড়ার সব চাকমা মেয়েদের সঙ্গে তোলা ফুলের একাংশ দিয়ে মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের পূজা দেয়, আর বাকি ফুল নিয়ে চলে যায় নদীতে ভাসাবে বলে। নদীতে নেমে গোসল করতে করতে বিজুর আনন্দময় নিয়ম মেনে ফুল ভাসিয়ে দিয়ে গায়–

'জু মা গঙ্গী
ম-র পুরোন ঝরঝর আপদবলা
ফিবলাবেগ ধোয় নে যা'

প্রণাম হে মা গঙ্গা, আমার পুরানো বছরের যাবতীয় আপদ-বিপদ সব ধুয়ে নিয়ে যাও।

কল্পনার এই মন-কথা ও সুরের ভেতর পাশ থেকে কথা বলে ওঠে আনুচিং চাকমা–

'দিদি লে এই গঙ্গা কী আর পুরানো বছরের আপদ-বিপদকে ধুইয়ে লয় যাইতে সক্ষম দিদি?'

কল্পনার হাত থেকে ফুলগুলো ভেসে যায় তখন। কল্পনা কোন আবেগে জানি প্রতিবেশী বোন আনুচিংয়ের মুখের দিকে তাকায়। আনুচিং কল্পনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে চলে–

'সামোনের জুম্মও লাগি মোদের কোনো ভূমিনই যে ওহেরা ফাঁকে রাখে নাই দিদি। সগাই দখল করি লয় রাখছে বাঙালি আর ওই রাষ্ট্রের সৈন্যরা। দিদি তোহাই একটা কিছু করোছি দিদি। ভূমিন হারালে মোদের জীবন হারাই যাইয়ে দিদি। তোহাই একটা কিছু করোছি দিদি।'

'ই ফুল ভাসানি গাঙ্গের সাক্ষী, সাক্ষী ওই ভেসে যাওয়া ফুল, সাক্ষী মানি মোর জীবন, ওরে মোর জানা আছোত–এই আদিবাসী সগার জীবন গ্রথিত আছে এই ভূমির সঙ্গীন, মুই জানোছি ভূমিন হারানো মানে আদিবাসীদের জীবন হারানো। মুই জানোছি–ভূমিনই আদিবাসীদের রক্ত। রক্ত ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচতে পারে না।

ভূমিহীন আদিবাসী মানুষও অকল্পনীয়। সামনের জুম্ম আসার আগে মুই আদিবাসীদের সগার ভূমিন ফেরত আনব। সাক্ষী, মোদের পাহাড়গুলান, সাক্ষী ভুমিন হারা সগাই আদিবাসীদের প্রাণ। জাগো জাগো, পাহাড়িয়া মা-বোন, সঙ্গে আইসো বাবাই-কাকা-ভাইয়ে, আইসো আইসো, প্রাণের ভূমিনরে আনতে হইবেক দখলে।

হয় হে, আইসো সগাই।

মোরা না মানি কাপ্তাই বাঁধ। হেই তো মোহেদের উচ্ছেদের প্রথম ফাঁদ। হা হা মোরা না মানি কাপ্তাই বাঁধ। বাঙালিদের জন্য একটি জলবিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ১৯৫৭ এবং ১৯৬৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কাপ্তাইয়ে বাঁধ দেওয়া হলো। আর চোখের নিমিশে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের চাষযোগ্য জমির অর্ধেকই তলিয়ে গেল সেই কৃত্রিম হ্রদের নিচে। ওই বাঁধ মোদের কোনো কাজে আসে নি। ওই বাঁধ মুই না মানি। ওই বাঁধের জন্য ১ লাখ পাহাড়ি আদিবাসীকে সরে যেতে হয়েছে দূরে, বহু দূরে। এত দূরে যে, এদেশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে। এখনও তারা দেশহীন অবস্থায় অরুণাচল প্রদেশে বসবাস করছে। মুই তাহেদের ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখি, সাক্ষী দুই চোখের, সাক্ষী মোহের কুমারী ইজ্জতের, সাক্ষী মোহের দুই বক্ষরে, সাক্ষী মোহের সব থেকে বড় ধন প্রাণের, আহা প্রাণ মুই যেন দেশের মানুষরে দেশে এনে আপান ভূমিন ফিরাই দিতো পারি। না না মুই পারিতোই হবেক। নির্ঘাত হবেক। কল্পনার জন্ম তখোনাই ধন্য হবে, তাহের আগে লয়।

দিদি, তোহাই কী ইতিহাস পড়ি কথা কহোস?

কোথায় পাহোবো মোদের ইতিহাস কথা! কেহ না লিখিছে। তহে মোর চিত্তের ভেতর আমো সমাজের পূর্বলোকের ক্ষোভগুলিন কেমন করে যেন আপনাকে ঝিলিক দি ওঠে– মুই তখন আর থির থাকোতি পারি না–এই তো এহনই মুই দেখোছি–

কী দিদি?

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাহাড়ের বুকে বাঙালিরা এলো, জঙ্গল কেটে ফেলল, হারিয়ে গেল গভীর জঙ্গল, জুম চাষের জায়গা। মুই আরও দেখি–

কী?

সেনাবাহিনীর পোশাক পরে ১৯৭৯ সালে এ দেশের এক প্রেসিডেন্ট গোপন এক বৈঠকে মোদের পাহাড়ে হাজার হাজার গরিব বাঙালিকে বসতিস্থাপনের সরকারি নীতি প্রণয়ন করে।

দিদি!

সেই নীতির আওতায় মোদের অনুমতি ছাড়াই মোদের পাহাড়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ১ লাখ বাঙালি বসবাস শুরু করে।

দুই বছরের এক লাখ!

পরের বছর মাত্র এক বছরে আরও ১ লাখ বাঙালি আসে আমাহের পাহাড়ে।

এ কী বলোছিস দিদি!

'সে সময়ের ঘটনাগুলোন মুই দেখোছি–তখোনে মোদের বাস ছেলো মাটিরাঙ্গার কাছে বাঘমারা তাইনডং পাড়ায়। ১৯৮১-র বছর। বাংলাদেশ সরকার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানদের নিয়ে আসে মোদের পাহাড়ে। তাহের আগোত মোদের গ্রামে শুধু চাকমা, ত্রিপুরা আর মারমারা বাস করতো। মোদের সেই গ্রামে সৈন্যদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানরা এসে অকারণে মোদের আদিবাসীদেরকে মারধোর করে ও সহায় সপত্তি লুট করে। বাঙালিরা এসে মোদের ঘর হতে সব খাদ্যশস্য নিয়ে যেতে থাকে। মোরা আইনের শাসক সৈন্যদের কাছে বিচার চাহি। কিন্তু হায় কখনই মোরা বিচার পাই নাই। তখোকার ঘটনায় একদিন গ্রামের আদিবাসীরা চটে গেলে বাঙালিদের সাথোত যুদ্ধ বাধে।

এ ঘটনায় ছয় জন বাঙালি নিহত হয়। তাহের তিন দিন পর সন্ধ্যার অল্প আগে বহুসংখ্যক বাঙালি 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে গ্রামে ঢোকে। তাদের আগনে মোরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাই। ফলে তাহেরা গ্রামে অবাধে আগুন লাগানোর সুযোগ পেয়ে যায়।

গ্রাম ছেড়ে পালানোর পর মোদের ওই গ্রামের অধিবাসীরা নিকটবর্তী জঙ্গলে ঢুকে পড়ি এবং লুকিয়ে থাকি। কখনো কখনো বিভিন্ন পরিবার এক বছরেরও বেশি সময় পালিয়ে থেকেছে সেনাবাহিনী ও বসতিস্থাপনকারী বাঙালি লোকদের ভয়ে। ওই সময় মোদের জংলী আলু, বাঁশের চারা এবং বনের ফলমূল খেয়ে কাটতে হয়েছে। কখনো আমরা না খেয়ে কাটিয়েছি।'

'মোর মা কহিছে–মোহাদের আদি গ্রাম ছিল মহালছড়ি। সেই গ্রাম বাঙালিরা দখল নেয় মুই যখোনা মায়ের পেটে। মা কহিছে–তখোনা মুই পেটে লয় মা তিনখানা মাসো জঙ্গলে থাকোছে। জঙ্গলে বাবাই নাকি ছোট একটা কুঁড়েঘর বাঁধাই ছেলো।

মা কহিছে–তখোনা বাবাই জঙ্গলে ঘুরে কোনো খাবার জোগাড় করতে না পারলে মোহের পোয়াতি মায়কে না খায় থাকত হতো। মোহের মা আরও কহিছে–জঙ্গলি আলু আর বনের ফল-সার খেয়ে তাহেদের দিনগুলোন পার হতো।

মা কহিছে–তখোনা নাকি গ্রামে আসা বাঙালি মুসলমানরা আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোকোরা তাহেদের খোঁজ করত। ফলত তাহেরা আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে যেতোন।

মা কহিছে–এভাবে সপ্তাহে দুই থেকে তিন বার তাহেদের জঙ্গলের গভীরে চলে যেতে হতো। নতুন নতুন ঘর বাঁধাই নিত হতো। মা কহিছে–তখোনা জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণকারী অপর কোনো চাকমাদের সঙ্গে তাহেদের সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ ঘটেনি, তবে তাহেরা জানত অনেক চাকমারাই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়োছে।'

'হায়রে রাষ্ট্র! তোহার ওই নীতির মুখে থু দিই–যে নীতিতে মোদের মতো শত শত পাহাড়ি আদিবাসীকে গ্রাম ছাড়া করে জঙ্গলবাসী করে দিলে, পাঠিয়ে দিলে আরও গভীরের এই পাহাড়ে। এখন এখানেও ফেলতে চাইছো নতুন থাবা তা হবার লয়, তার বদলে আমোদের পুরানো গ্রামগুলোনকেও ফেরত চাহছি। ফেরত।'

তা কী কোনোদিন হইবেক দিদি?

কেনো হইবেক লয়? পর্যায়ক্রমে মোদের পাহাড়ে যেইভাবে বাঙালিদের আনা হইয়েছে সেইভাবেই পর্যায়ক্রমে তাহেদের তাহেরা ফিরিয়ে লিয়ে যাইবেক। ১৯৭৯-৮০ সালে পাহাড়ে আনা হলো ১ লাখ বাঙালি। ১৯৮১ সালে আরও ১ লাখ। আর তার পরের দুই বছর ১৯৮২-৮৩ সালে আরও ২ লাখ। বছরের পর বছর এই পাহাড়ে পাহাড়ে বাঙালিদের এই আগমন প্রক্রিয়া চলছে।

কিন্তু আর নয়, আর নয়। কেননা, আজ মোরা তাকায় দেখি–মোদের সব কিছু যে বাঙালিদের দখলে, পাহাড়, নদী, মাছ, বন, জুম্মের আবাদী মাঠ–সব কিছু। মোদের হাজার বছরের নিজস্ব কৃষি ব্যবস্থা জুম্মকে বাঙালিরা বহুদিন ধরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাহে... তাহেরা কহে– 'বাজে জিনিসগুলোর একটি হচ্ছে জুম চাষ, যা বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার প্রধান কারণসমূহের অন্যতম।'

কিন্তু তাহেরা জানে না–জুম চাষ আমাদের সমাজেরই অংশ। বহু আগে মোদের পিতা ও পিতামহগণ জুম চাষ করেছেন এবং মোহরা সেই জুম চাষ চালিয়ে এসেছি। বহুদিন ধরে বাঙালিরা মোদের সকল সত্তাকে বিলুপ্ত করে ফেলতে চাইছে। মোদের ওই বাঙালিদের জন্য নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে আছি। কিন্তু আর না মুই সব কিছু আবার মোদের অধিকারে ফিরাই আনাবো। আজ বিজুর ফুল ভাসানি পানির সাক্ষী লয় আমি ঘরে ফিরছি, মুই পাহাড়ি আদিবাসীদের সকল অধিকার ফিরাই আনাবো। ফিরাই আনাবো।

কনদিন মানেইয় বুগ ভূঁইয়ত্
বেল পহ্র ছদগ ভাজি যেন
পহ্রে পহ্রে ভাজি যেব
এই জুম, এই বিজু, এই অরণ্য॥

কোনো দিন বুকের জমিন/আলোকিত হবে সূর্যে/আলোয় আলোয় ভরে যাবে/এই জুম, এই বিজু, এই গভীর অরণ্য।

এক কাজলঙ অভিমান
পুঝি যোক এপাড় ওপাড়
এই মাদি এই বুগ ভূঁই
দিঘোল কোচপানাত ভিজি যোক, ভিজি যোক, ভিজি যোক॥[১৩]

এক কাজলঙ অভিমান/মুছে যাবে এপাড় ওপাড়/এই মাটি, এই বুকের অরণ্য/ভালোবাসার বর্ষায় ভিজে যাক, ভিজে যাক।'

এহার পর নিশিত হয়য়ে। আকাশত চান উদিত্ হয়য়ে। তাহের দিকত্ তাকায়া হামারা গানান পাড়ি–হামারার নিজত্ ভাষার গানান–দিদিও হামাদের সাথত্ গাহে–

'দূরর দেজর তারাগুন
ওই আগাজর দোল্ চানান
এজ লামি এ দেজত্
সোনেম্ পজ্জন নানাগান॥

দূরের দেশের তারাগুলো/ওই আকাশের সুন্দর চাঁদ/এসো মর্ত্যে নেমে/আমি তোমাদের নানা রূপকথা।

এজ এজ লামি এজ
সমারে লই জুন পহ্রান্
তোমা পহ্রে পহ্রে হব
মানেই কুল আন্ধারান॥

এসো এসো তোমরা নেমে/নিয়ে এসো জ্যোৎস্নার আলোক/তার আলোকে আলোকিত হবে/মানব-রাজ্যের অন্ধকার।'

কিন্তু না মানব-রাজ্যের সে অন্ধকার দূর হলো দিদি। বরং হামারার প্রাণের দিদিকেই এক অন্ধকার এসে নিয়ে গেল। দাদা রে, হামার দিদি রে কী ফেরত পাবো না? ফেরত পাবো না?

অবশ্যই পেতে হবে। আমরা যাবো কল্পনাকে উদ্ধার করে আনবো। চল দিশা চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চল।

আপনারা কেউ আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন?

হ্যাঁ চলুন–আমি যাচ্ছি আপনাদের সাথত্।

লেফটেনেন্ট ফেরদৌসকে তো কজইছড়ি সেনা ক্যাম্পে গেলেই পাওয়া যাবে? না?

জ্বি।

কজইছড়ি সেনা ক্যাম্প কত দূর?

খুব বেশি না–ওই তো সেনা ক্যাম্পের আলো দেখা যাইছে।

কিছুক্ষণ পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হেঁটে নিউলাল্যাঘোনা গ্রামটা পেরিয়ে ৪৬ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ম্যারিশ্যা জোনের অন্তর্ভুক্ত কজইছড়ি সেনা ক্যাম্পে পৌঁছানো যায়। পথের মধ্যে দেখা হয়ে যায় ক্যাম্পের সুবেদার মোজাম্মেল হকের সাথে। তিনি দুইজন বাঙালির সঙ্গে এক আদিবাসী তরুণীকে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন–

আপনি! আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আপনি কি ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছেন?

না আমি ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছি না। ক্যাম্পেই যাচ্ছি।

ক্যাম্পে–আপনি! কে আপনি?

আমি আনুচিং চাকমা। ওই নিউলাল্যাঘোনার মেয়ে।

নিউলাল্যাঘোনা!

হ্যাঁ নিউলাল্যাঘোনা। এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন?

বিস্মিত হচ্ছি না বোন–লজ্জিত হচ্ছি।

কেন? আপনার আবার লজ্জার কী হলো।

বোন রে, আপনাদের ওদিকে লজ্জায় যাই না। একটা মেয়েকে আমাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেছে। সে জন্য আমি খুবই লজ্জিত–দুঃখিত।

আপনি তাহলে ব্যাপারটা স্বীকার করছেন?

আমার স্বীকারে কি আসে-যায়। আমি ক্যাম্পের সামান্য একজন সুবেদার। আপনারা যান, সময় নষ্ট কইরেন না, যান দেখেন মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারেন কি-না।

চলো আনুচিং দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চলেন।

আরও কিছু দূর হেঁটে ক্যাম্পে পৌঁচ্ছুলে লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস সদর্পে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ান। তীর্যক চোখে তিনি একবার দিশার চোখের দিকে তাকান–আরেকবার অনিকেতের চোখে। তারপর সে তাদের সঙ্গে আসা এক আদিবাসী তরুণীকে দেখে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শ্লেষের চোখে তাকিয়ে আবার ফিরে এসে অনিকেত ও দিশার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন–

'আপনাদের দেখে তো বাঙালি মনে হচ্ছে–তা আপনাদের পরিচয় জানতে পারি?'

আমি দিশা।

আমি অনিকেত।

আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। কল্পনার সন্ধানে।

কল্পনার সন্ধানে! পেয়েছেন কল্পনাকে! আমরাও তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে মরছি।

কি যা তা বলছেন–আমরা শুনেছি, আপনারা কল্পনাকে অপহরণ করে এই ক্যাম্পে লুকিয়ে রেখেছেন। প্লিজ, কল্পনাকে ফিরিয়ে দিন।

হা হা হা–এতটা ইমোশনাল হবে না ম্যাডাম–ক্যাম্পে ইমোশনের কোনো মূল্য নেই।

মানে। কি বলতে চান আপনি?

আমি বলতে চাই–এটা একটা সেনা-ক্যাম্প, এখানে ইমোশনাল হওয়ার সুযোগ নেই। যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলুন। আর শুনে রাখুন... প্লিজ, মুখ খুলবেন না–আমার কথার মধ্যে কোনো কথা বলবেন না।

তাই বলে... ।

আমি আপনাকে চুপ থাকতে বলেছি। আমার কথার মধ্যে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেছি। আমার কথার মধ্যে একটাও কথা বলবেন না– । না কোনো কথা বলবেন না। শুনুন–আমরা বাংলাদেশের সেনারা এই পাহাড়ে এসেছি বাংলাদেশের সংবিধান রক্ষা করতে–এদেশের ভূ-সীমাকে রক্ষা করতে–বাংলাদেশে শান্তি রক্ষা করতে–পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা দিতে।

তাহলে কল্পনা অপহৃত হলো কেন?

সেটা প্রতিটি পাহাড়ি মানুষ জানে।

আপনিও জানেন। আর কাজটা যে আপনারাই করেছেন তা এদেশের সবাই জানে।

স্টপ। স্টপ ইয়োর টাঙ্ক। নাও, লিসেন ক্লিয়ারলি। এদেশের সবাই খুব ভুল জানে।

মানে?

আপনাদের মতো বিপ্লবীরা তারও অধিক ভুল জানে–আপনারা জানেন, এই দেশ আদিবাসীদেরকে অবহেলার চোখে দেখে, নির্যাতন করে, অধিকার কেড়ে নেয়–আর আমাদের সেনা-সদস্যরা ওদের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করে। কিন্তু আপনারা একটা সত্য জানেন না–শুনবেন সেই সত্যটা কী?

আপনার মুখ থেকে সত্য জানতে হবে!

হ্যাঁ আমার মুখ থেকেই সত্য জানতে হবে–কারণ, বিপ্লব আপনাদের অন্তরে অন্ধত্বের সিল মেরে দিয়েছে–তাই সত্যটা আমার মুখ থেকেই শুনুন–আপনার তো বাঙালি? তাই না?

তা তো দেখতেই পাচ্ছেন–কি বলতে চান তাই বলেন।

বলবো–তবু, আপনারা বাঙালি কি-না এ প্রশ্নের উত্তরটা আপনাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এলে ভালো হতো।

ভণিতা না করে যা বলতে চায়ছেন বলে নিয়ে কল্পনাকে ফিরিয়ে দিন।

কল্পনা! তবে, শুনুন–আমরা এই সামান্য একজন পাহাড়ি মেয়ের জন্য যা করেছি তার জন্য আমাদেরকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমরা হেলিকপ্টার থেকে মেয়েটার সন্ধান জানতে চেয়ে সন্ধানদাতার জন্য ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে লিফলেট ছেড়েছি। বলুন, বৃহত্তর বাংলাদেশে কত কত বাঙালি মেয়ে ধর্ষিত হয়-অপহৃত হয়, তাদের জন্য আমাদের দেশের কেউ কী কোনোদিন এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন। আপনারা পারবেন? পারবেন না। আপনাদেরকে আমার ঘেন্না হয়।

চুপ করুন লেফটেন্যান্ট সাহেব, চুপ করুন।

চুপ করবো কি? এখনও তো আমার কথা শেষ হয় নি। মাই ডিয়ার ম্যাডাম এ্যন্ড ব্রাদার, প্লিজ লিসেন টু সিনসিয়ারলি–জানেন, আমি মাঝে মাঝে একটা হিসেব মেলাতে পারি না–কী, প্রশ্ন করুন ব্যাপারটা কী? পারস্পারিক কথাবার্তা না চললে ঠিক জমে না–এখন প্রশ্ন করুন, আমি কোন হিসাবটা মেলাতে পারি না?...

ঠিক আছে আমার প্রশ্নের আমিই উত্তর করছি। আচ্ছা–বলুন তো বাংলাদেশের সবগুলো ইউনিভার্সিটিতে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য কোটা সংরক্ষিত নেই? চাকরির ক্ষেত্রেও কিন্তু আদিবাসী কোটা আছে।

আমি বাংলাদেশের সব রকম কাজ-কর্মে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারটা দেখেছি... আর অবাক হয়ে গেছি–এই পাহাড় না-কি শুধু আদিবাসীদের...

এটা কেমন কথা! বাংলাদেশ তো একটা ভূখণ্ড এই ভূখণ্ডের সব স্থানে সব নাগরিকের আছে বসবাসের অধিকার, চাষের অধিকার, সব কিছুর অধিকার অথচ, আপনারা আদিবাসী বলে পাহাড়কে রাখতে চান বাংলাদেশীদের থেকে আলাদা করে... সমতলে জনসংখ্যার ঘনত্ব থাকবে বেশি আর পাহাড়ে থাকবে চিরদিনই কম... তা তো হতে পারে না। এক দেশে দুই নিয়ম কেন থাকবে। কেন?

আমার মেয়েটি যে বছর ৪০ হাজার ছেলের সাথে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে নাই। সেই একই বছর ৫০টি আদিবাসী ছেলেমেয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কোটার ভিত্তিতে ৫০ জনই ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। আমার মেয়ে বাঙালি হয়ে কী দোষ করেছে যে ও ইউনির্ভাসিটিতে পড়তে পারেনি।

একটি সরকারি চাকরির জন্য দুইটি পোস্টের বিপরীতে ২০০০ জন বাঙালি চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যেখানে আমার ভাই চাকরি পাই নাই সেখানে একটিমাত্র আদিবাসী ছেলে সে চাকরিতে আবেদন করেই চাকরি পেয়ে গেছে।

এখন বলুন তো বাঙালিদের জন্য কেন এই বৈষম্য, কেন? উত্তর করুন। উত্তর করুন।'

আমার দিদিকে আপনারা ফিরিয়ে দিন। ফিরিয়ে দিন।

লেফটেন্যান্ট, প্লিজ, ওর দিকে তাকিয়ে অন্তত কল্পনাকে ফিরিয়ে দিন।

সরি, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি, আমার প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজে পেলে আমি নিশ্চিত আপনারা কল্পনার সন্ধান পেয়ে যাবেন। আমার প্রশ্নগুলির উত্তর ছাড়া কোনো কল্পনাকে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এই আমার শেষ-কথা, বাই।

প্লিজ, আমার দিদিকে ফিরিয়ে দিয়ে যান, ফিরিয়ে দিন।

লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস তার কথার মধ্যে ক্যাম্পের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়। আর তখনও আনুচিং চাকমা মাটির উপর নতজানু হয়ে কাঁদতে থাকে–'আমার দিদিকে ফিরিয়ে দিয়ে যান, দিদিকে ফিরিয়ে দিন।' অনিকেত ও দিশা তাকে তুলে ধরতে ধরতে বলে–'চলো আনুচিং, ওঠো, চলো।'

আমার দিদিকে পাবো না?

এই ভাবে কাঁদলে কীভাবে পাবে আনুচিং? এখন চলো।

আনুচিং চাকমাকে দুজনে দুদিক দিয়ে ধরে তারা এগিয়ে নিয়ে যায় কল্পনাদের উঠানে। তাদের এ রকম আগমনে উঠানের অনুসন্ধিৎসু চোখগুলো যেন-বা জানতে চায়–'কল্পনাকে ওরা কখন ফিরিয়ে দেবে? কখন?'

কিন্তু তাদের এই জিজ্ঞাসাময় চাহনির ভেতর তারা যখন নিরবিকার থাকে তখন যেন-বা ওই অনুসন্ধিৎসার চোখগুলো হতাশ হয়ে জানায়–'বুঝে গেছি... তোমরাও কল্পনার কোনো খোঁজ আনতে পারলে না।' তারপর তাদের বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘ একটা শ্বাস বেরিয়ে আসে। তারা বারান্দায় নিথর হয়ে বসে পড়ে। আর অনিকেত ও

দিশা পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে নির্বিকারে সে বাড়ির উঠান থেকে বেরিয়ে আসে। তখন রাত্রি পেরিয়ে ভোর এসেছে।

সেই মর্মবোধ জাগানো পাহাড়ি শীতল ভোরে তারা নদীতীরে গিয়ে দাঁড়ায়–'একই ভূখণ্ডে জন্ম নিয়ে বসবাস করেও আমরা পরস্পর এক হতে পারি নি।'

অনিকেত এই কথার মধ্যে দিশার চোখের দিকে তাকায়। দিশাও তাকায় অনিকেতের চোখের দিকে এবং সে আবেগের সঙ্গে বলতে থাকে–'হ্যাঁ অনিকেত, আমরা পরস্পর এক দেশের হতে পারি নি। যদিও ভাসা চোখে একটাই দেশ দেখি আমরা, কিন্তু মনে মনে যেন ধরে রেখেছি–আদিবাসীরা আমাদের দেশের কেউ নয়, আর আদিবাসীরাও মনে মনে ধরে রেখেছে আমরা তাদের কেউ নই।'

'এখন তাহলে কেমন করে আমি আমার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবো দিশা? আমি যে বাঙালি ও আদিবাসীদেরকে যৌথ ভালোবাসায় এক বুকে ধারণ করতে চাই। এখন উপায় কী করি?'

'উপায় আছে অনিকেত, আমরা যদি পরস্পর মধ্যে পারস্পারিক মেলবন্ধন রচনা করতে পারি তাহলে সব সম্ভব–উভয়ে উভয়ের দুঃখ-আনন্দে এক হওয়া সম্ভব। আর তুমিও তোমার এক বুকে বাঙালি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে যৌথ ভালোবাসায় মেলাতে পারবে।'

'সেইদিন কত দূরে দিশা?'

'যেইদিন আমাদের এই ভাবনার সঙ্গে সারাদেশের মানুষ এবং তারও অধিক আমাদের এই রাষ্ট্র একাত্ম অনুভব করবে। আমি বিশ্বাস করি সেইদিন খুব বেশি দূরে নয়। কেননা, আমরা তো দুজন একটি প্রয়োজনের কথা অনুভব করেছি। এরপর একে একে সবাই হয়তো একদিন আমাদের মতো এই প্রয়োজনটা অনুভব করে সকলে মিলে এক হয়ে উঠবে আর রাষ্ট্র তা বাস্তবায়নের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে আসবে।'

'ধন্যবাদ দিশা, তোমার কথাগুলোর ভেতর আমি সত্যিকার অর্থে একটা দিশা খুঁজে পাচ্ছি।'

ইতি–যুগান্তরো রপালো নাচি নাম দৃশ্যকাব্য।
সাইমন জাকারিয়া, পৌষ ১৪১৩

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, প্রফেসর পিয়ের বেইসেইন, অনুবাদ-সুফিয়া খাতুন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
জীবন আমাদের নয় : বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ও মানবাধিকার (মে ১৯৯১ সালের মূল রিপোর্ট), পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, ২০০১
আরণ্য সংস্কৃতি, আবদুস সাত্তার, জানুয়ারি ১৯৭৭

আদিবাসী জনপদের পথে প্রান্তরে, সম্পাদনা-জয়ন্ত আচার্য, জুন ২০০৫
কল্পনা চাকমার ডায়েরি, সম্পাদনা-হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ১২ জুন ২০০১
বিপন্ন ভূমিজ (অস্তিত্বেও সংকটে আদিবাসী সমাজ : বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের প্রতিচিত্র), গ্রন্থনা-শিত্তুল মুনা, মফিজুর রহমান, এপ্রিল ২০০৩
থিয়েটার স্টাডিজ, সম্পাদক-সেলিম আল দীন, জুন ১৯৯৪
পাহাড়ের রুদ্ধকণ্ঠ (পাহাড়ি নারীদের নিপীড়ন ও প্রতিরোধ), প্রকাশক-হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ডিসেম্বর ১৯৯৯
মৃত্তিকা (জাতিতাত্ত্বিক লোকায়ত জ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক কাগজ), সম্পাদক-জুয়েল বিন জহির, পরাগ রিছিল, দুপুর মিত্র, ৯ আগস্ট ২০০৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আবু বকর, রিসার্স সেল এ পত্রিকা আর্কাইভস্, প্রথম আলো, ঢাকা
সজীব, পত্রিকা আর্কাইভস্, যায়যায়দিন, ঢাকা
পার্থ শঙ্কর সাহা, সেড, ঢাকা
জাহিদ, পাক্ষিক অন্যন্যা, ঢাকা
অশোক বিশ্বাস, আদিবাসী ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গবেষক, ঢাকা
ফিলিপ গায়েন, সেড, ঢাকা
পাভেল পার্থ, বারসিক, ঢাকা

তথ্যনির্দেশ

১ সাঁওতালী গান
২ মালো গান
৩ গাছের ডালকে রাজশাহী অঞ্চলের ওরাওঁরা 'ঝুড়ফুঁ' বলে থাকে ।
৪ বাড়ির বাইরের উঠানকে ওঁরাও সম্প্রদায় 'খৈরান' বলে ।
৫ ওরাওঁদের ভাষায় পুরোহিতকে 'গুরুর-বা-নার' বলা হয় ।
৬ নওগাঁতে প্রচলিত ওরাওঁ গান
৭ নওগাঁয় প্রচলিত ওরাওঁদের গান
৮ বন বিভাগের ফরেস্ট কনজারভেশন এ্যান্ড ইকো ট্যুরিজম প্রজেক্ট
৯ গারো গান
১০ একটি গারো গানের অনুকরণের লেখকের নিজের লেখা
১১ গারো গান
১২ চাকমা গান
১৩ চাকমা গান

রচনাকাল : ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ

এ নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট

কথামুখ

'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর কাহিনীকার হিসেবে উইলিয়াম শেক্সপিয়র-এর নামটি জানা থাকলেও আমাদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, এর কাহিনীটি অতি প্রাচীন এবং শেক্সপিয়র এ কাহিনীটি ধার করেছিলেন তাঁর থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে লেখা ইংরেজ লেখক আর্থার ব্রুকস্-এর 'দি ট্র্যাজিক্যাল হিস্ট্রি অব রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নামের একটি মহাকাব্যিক রচনা থেকে।

কাহিনী হিসেবে রোমিও-জুলিয়েটের ইতিহাস শুধু এটুকুই নয়, বরং তা সুদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত। গবেষণায় জানা যায়, রোমিও-জুলিয়েটের এই সকরুণ প্রেমকাহিনী সংঘটিত হয়েছিল ইতালিতে। সেখানে এই প্রেমময় জীবন-গাঁথা উপাখ্যান হিসেবে আনুমানিক ১৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পেলেও মূলকাহিনীটি সম্ভবত ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দের। আর মূলকাহিনীতে দেখা যায়, প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেয়ে আত্মহত্যাকেই শ্রেয় বলে মেনে নেয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতালির এমন ঘটনার একশত বছর আগে প্রায় একই রকম আরেকটি কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় স্পেনের তেরুয়েলে। অবশ্য স্প্যানিস আখ্যানে এ কাহিনীর একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। রোমিও সেখানে আত্মগোপন করে রয়েছেন, আর জুলিয়েট সেই সময়ে অন্য এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে বসেন এবং নতুন বিয়ে করা স্বামীর সাথে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার পর তার (জুলিয়েটের আগের) স্বামী এসে তাদেরকে একসঙ্গেই সমাহিত করেন।

গবেষক মনে করেন, স্পেনে সংঘটিত ওই প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের গল্পটা একসময় ইতালিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় লোকজনের মুখে মুখে তা কিংবদন্তির আকার লাভ করে। সে কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে ইতালির লেখক বান্ডেলো একটি উপন্যাস রচনা করেন। ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে বান্ডেলোর সে উপন্যাস থেকেই কাহিনী ধার করে ইংল্যান্ডের লেখক আর্থার ব্রুকস্ তার মহাকাব্যিক রচনা 'দি ট্র্যাজিক্যাল হিস্ট্রি অব রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' প্রকাশ করেন। তারও ত্রিশ বছর পরে আনুমানিক ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে আর্থার ব্রুকস্-এর কাহিনী ধার করে শেক্সপিয়র বিখ্যাত ট্র্যাজেডি 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' রচনা করেন।

সত্যি কথা বলতে কি, বর্তমান নাটকটি লেখার আগ পর্যন্ত এ সব তথ্য আমার নিজেরও জানা ছিল না। কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে শেক্সপিয়রের আখ্যান নির্ভর এই নাট্য রচনার পর আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জন্ম নিল, তার মধ্যে প্রধান প্রশ্নটি হলো–

শেক্সপিয়রের অন্যান্য নাট্যাখ্যানের মতো এ আখ্যানটিকে নিয়েও বহুভাবে, বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিশ্চয় সারা পৃথিবীতে ব্যাপক নাট্যকর্ম সৃজিত হয়েছে, এক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞতায়, অজ্ঞানে পৃথিবীর অন্য কোনো নাট্যকারের নাট্যচিন্তা ও নাট্যকর্মের পুনর্বয়ান বা পুনর্নির্মাণ করলাম না তো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বাংলাদেশের তরুণতর বিশ্বসাহিত্যের পাঠক থেকে শুরু করে বিশ্বসাহিত্য বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশ্বনাট্য দর্শনে অভিজ্ঞ নাট্যনির্দেশক ও কাছের বন্ধুদেরকে নাটকটি পাঠ করতে দেই, সর্বোপরি ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান করি।

প্রায় সব ধরনের অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসা তথ্যগুলো বর্তমান নাট্যকর্মের পক্ষে জোরালো কিছু যুক্তি এনে দেয়। কেননা, প্রাগৈতিহাসিক কালের রোমিও-জুলিয়েটের আসল কাহিনীকে ট্র্যাজেডি-নাট্যে রূপ দিতে মহাত্মা উইলিয়াম শেক্সপিয়র যা করেছিলেন তা সুচতুর একটি খেলা ছাড়া কিছু নয়, বর্তমান নাটকটি সে-কথাই প্রমাণ করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষ কৌশলে দেশ-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডীকে অতি□ম করে শিল্পের সর্বজনীন ভূখ , সময় এবং চরিত্র সৃজন করেছি মাত্র। যা নাট্যচিন্তা প্রকাশের তীব্রতাকে বাড়িয়েছে বলে আমার ধারণা।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের স্বাধীনতা নেবার প্রয়োজনে বর্তমান নাটক রচনায় ইউরোপীয় নাট্য রচনার গঠন-কৌশলকে সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন না করা হলেও – এই নাট্যে ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের মুখ্য বৈশিষ্ট্য ঘটনা অনুসন্ধানের সঙ্গে প্রাচ্যের নাট্যাদর্শ মানুষের প্রেমময় জীবন সংকটের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় মানব চরিত্রের মহৎ বৈশিষ্ট্য হিসেবে লেখকের সূক্ষ্ম তৎপরতার কথা এবং সামাজিকভাবে নিজের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে সেই একই লেখক কীভাবে গোপনে সংঘটিত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে সম্ভব ও সমর্থন করেন তা তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চাকারীর মিথ্যাচার ও সুবিধাবাদী আচরণকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

এ নাটকের ভাষারীতি ও চরিত্রাবলি সৃজনে, সর্বোপরি গঠন-কৌশলে প্রাচ্যের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে। অ্যারিস্টোটল বর্ণিত ইউরোপীয় ধ্রুপদী নাট্য সংগঠনের দৃশ্য-অঙ্কের বিভাজনরীতি এবং মূলসূত্র– নাট্য সংগঠনের ত্রি-ঐক্য – ইউনিটি অব টাইম, ইউনিটি অব স্পেস অ্যান্ড ইউনিটি অব অ্যাকশন-এর পরিবর্তে তথা এই নাটকে ইউরোপীয় নাটকের মতো দৃশ্য-অঙ্ক বিভাজন ও ত্রি-ঐক্যের সংগঠনমূলক নাট্য রচনার পরিবর্তে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্য সংগঠনের উন্মুক্ত ধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার দিকে গভীর অভিনিবেশ নিয়ে তাকালে দেখা যায়, বাংলা নাট্যধারায় স্থান-কাল ও □িয়ার ঐক্য রচনার তেমন কোনো প্রচেষ্টা বা আদর্শ তেমন কোথাও নেই। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যাখ্যানসমূহ মূলত বিস্তার লাভ করে সময়, স্থান ও □িয়ার ঐক্য অতি□ম করে। বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশের তাগিদে এ

যাবতকালে প্রাপ্ত বাংলাভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্যনির্দশন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর উদাহরণ দেওয়া যায়। গবেষকগণ, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রচনাকাল ১৩৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় বলে নির্দেশ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যপালার কাহিনীতে আছে, পৌরাণিক কালের প্রথমপর্ব তথা সত্যযুগের দেবতা বিষ্ণু পৌরাণিক কালের তৃতীয়পর্বে তথা দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে বসুদেবের পুত্র হিসেবে জন্ম লাভ করেন এবং বৃন্দাবনে তিনি নন্দের গৃহে স্থানান্তরিত হন। অন্যদিকে পৌরাণিক কালের প্রথম পর্ব তথা সত্যযুগের লক্ষ্মীদেবী দ্বাপরে সাগর গোয়ালার ঘরে পদুমার গর্ভে জন্মলাভ করেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী অনুযায়ী পূর্বজন্মের আভিজাত্যের অধিকারী দেব-দেবী জন্ম নিয়েছেন সাধারণ মানুষের ঘরে। শুধু তাই নয়, সত্যযুগের বিষ্ণু ও লক্ষ্মী পূর্বজন্মের আভিজাত্যের বদলে দ্বাপরযুগে জন্মলাভ করে মানবিক প্রেমলীলায় অংশ নেন। কখনো তাদের এই মানবিক প্রেমলীলার মিলন, সম্ভোগ, বিরহ, বিচ্ছেদ ঘটে ঘরে, পথে, অরণ্যে, নদীতে, নৌকায় ইত্যাদি স্থানে। তার সময়কালও স্থানের মতো বহুবিধ, এমনকি চরিত্রসমূহের □িয়াও বিচিত্রতায় ভরা। আসলে, এই নাট্যের কোথাও স্থান-কাল ও □িয়ার কোনো ঐক্য প্রত্যক্ষ করা যায় না।

অপরদিকে উক্ত আখ্যান ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম প্রচার-প্রসার পরবর্তীতে আরও নাটকীয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত উপর্যুক্ত পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে ঐতিহাসিক মানুষ্য চরিত্রের পূর্বজন্ম স্মৃতি যুক্ত হয়। অর্থাৎ, চৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের বাস্তবিক ও ঐতিহাসিক মানুষ্য চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর নাট্য পরিবেশনার আসরে তিনি দেবতা বা অবতার হিসেবেই স্বীকৃতি অর্জন করেন। তিনি কল্পিত হন শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসেবে, এমনকি একই অঙ্গে তিনি রাধা-কৃষ্ণের যুগল রূপ হিসেবেও পূজিত হয়ে ভিন্নতর গুরুত্ব নিয়ে ভক্ত দর্শক-শ্রোতাদের সমীহ আদায় করে নেন। এ ধরনের নাট্য পরিবেশনায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারটি সনাতন শাস্ত্রীয় কাল যেমন একাকার হয়ে দর্শক-শ্রোতাদের কাছে ধরা দেয় তেমনি উক্ত সময় বা কালসমূহের স্থান, □িয়া ও চরিত্রসমূহ একবিন্দু এসে মিলে মিশে যায়। এ ধরনের নাট্য সংগঠনের প্রধান কারণ হচ্ছে সমগ্র বাংলাতে তো বটেই পুরো ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকে জন্মান্তরবাদ একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। যার উদাহরণ বাল্মীকি রচিত রামায়ণ-এর বহু স্থানেই রয়েছে। আর এ কথা কে না জানে না, রামায়ণ মূলত জনসাধারণের সামনে পরিবেশিত কাব্য, যে অর্থে রামায়ণকে আধুনিক কালের নাট্যশাস্ত্রের আলোকেও নাট্যগ্রন্থ বলেও দাবি করা চলে। কেননা, রামায়ণ ভারতবর্ষে কোনোদিনই শুধু ঘরে বসে একা একা পড়বার বস্তুতে পরিণত হয়নি, বরং রামায়ণ কাহিনীর জনপ্রিয়তা ঘটেছে পরিবেশনামূলক শিল্প হিসেবে, আর তা নিশ্চিতভাবে গ্রামের সাধারণদের মধ্যে প্রদর্শিত হতো এবং এখন সে পরিবেশনার ধারা বাংলাদেশের গ্রাম-শহরে সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যধারার প্রাচীন নির্দশন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিচিত্র পরিবেশনা ‘কৃষ্ণলীলা’, ‘কৃষ্ণযাত্রা’, ‘ঢপযাত্রা’, ‘পদাবলী কীর্তন’ বা ‘পালা কীর্তন’-এর আসরে প্রধান যে কয়েকটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তা হলো– এ সকল নাট্যরীতির পরিবেশনার শুরুতে বন্দনাংশের পর পরই থাকে গৌরাচন্দ্রিকা বা চৈতন্যলীলার অভিনয়, যে অভিনয়ে কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদ বা ভক্তদের সঙ্গে বিচিত্র লীলা করেন আর সেই লীলার ভেতর দিয়ে তিনি যেন একসময় নিজের পূর্বজন্ম তথা দ্বাপর যুগের রাধালীলার কথা স্মরণ করতে সক্ষম হন। রাধালীলার পথ ধরে এক পর্যায়ে তিনি কৃষ্ণ জন্মের পূর্বজন্ম ত্রেতাযুগের রামলীলার কথা স্মরণ করেন। অতএব, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিবেশনাসমূহে পাশ্চাত্যরীতি সময়ের ঐক্য রক্ষার প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে সময়ের ঐক্য নির্ধারিত হয় ত্রিকাল তথা ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি কালের সমন্বিত প্রকাশের মাধ্যমে। প্রায় একই ধরনে উদাহরণ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত ও বাংলার জনপ্রিয় নাট্যাখ্যান মনসামঙ্গল, গাজীর গান, মানিক পীরের গান, মাদার পীরের গান, ইমামযাত্রার পরিবেশনায় কম-বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রায় সকল নাট্য পরিবেশনাতেই স্থান, কাল ও ক্রিয়ার অনৈক্য লক্ষ করা যায়। সময়ের ত্রিসঙ্গমের মতো ঐতিহ্যবাহী নাট্যে ক্রিয়া ও তার ঘটনাস্থান ব্যপ্ত হয় স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ ও পাতাল জুড়ে। মূলকথা হলো, সেই প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি সময়, স্থান ও ক্রিয়ার ঐক্যকে ভেঙে দিয়ে ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা নিরন্তর গ্রাম-শহরে পরিবেশিত হয়ে আসছে সেই ধারার নাট্যশক্তিতে সুগভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেই আমি এই নাটকে শেক্সপিয়র, রোমিও, জুলিয়েট, এমনকি আমাকে একসঙ্গে মেলাবার সাহস করেছি। এই সাহসের উপর ভর করে ‘এ নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ হয়ে উঠেছে একটি স্বাধীন ও আনন্দময় সৃজন।

নাটকটির একটি পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার শব্দাবলী থিয়েটারে ল্যাবে সাইদুর রহমান লিপনের নির্দেশনায় ৫০বার প্রদর্শিত হয়েছে। আর বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের মাস্টার্স ফাইল পরীক্ষার প্রযোজনা হিসেবে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের থিয়েটার ল্যাবে নাট্যকলার শিক্ষক জনাব আব্দুল হালিম প্রামানিক সম্রাটের নির্দেশনায় ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩, ৪ ও ৫ মার্চ মঞ্চস্থ হয়।

সম্প্রতি নাটকটি মূল বাংলা ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী অনুবাদক দুরদানা গিয়াস।

জগতের সবার মঙ্গল হোক।

নাটক শুরু

পূর্ণিমা রাতে সাম্প্রতিককালের এক কবি গ্রেভইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছেন। পূর্ণিমা-মায়ায় তিনি এক একটি সমাধির কাছে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে সমাধিস্থ মানুষের সাথে ফিস ফিস করে কথা বলার চেষ্টা করেন– ‘এই যে শুনতে পাচ্ছেন... শুনছেন আপনি... আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি... উঠে আসুন উপরে... আপনার সাথে আমার কথা আছে... অনেক কথা। আর এইভাবে বোবার মতো ঘুমিয়ে থাকবেন না। উঠে আসুন।’ না কেউ তার কথা শোনে না। তাই তিনি সমাধি থেকে গজিয়ে ওঠা লতায় ধরা বিচিত্র সব ফুল স্পর্শ করে গন্ধ নিতে থাকেন এবং এক সময় সমাধিফুলের গন্ধে দশাগ্রস্ত ঘোরলাগা কণ্ঠে এই নাট্যকথার সূচনা করেন–

কবি : গ্রেভইয়ার্ড মানে সমাধিক্ষেত্র। দুটি নামই বড় ব্যঞ্জনাময়। আর এখানকার পূর্ণিমারাত আমার খুব প্রিয়। এখানে নেশা ছাড়াই ফুলের গন্ধে মাতাল হওয়া যায়। আমি জানি, সমাধিতে যে ফুল ফোটে—তার পুষ্পলতার শিকড় সমাধি তলের ঘুমন্ত মানুষটির দেহসার থেকে রসদ নিয়েই উপরের বাতাসে গন্ধ ছড়ায়—এক একটি জীবন্ত মানুষের গায়ের গন্ধ যেমন এক একরকম—এক একটি সমাধি থেকে ভেসে আসা ফুলের গন্ধও তেমনি আলাদা আলাদা। আমি তাই এইরাতে সমাধিক্ষেত্রের মাটির গভীরে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে থাকা মানুষ আর এই পৃথিবী পৃষ্ঠের জাগ্রত মানুষকে একসঙ্গে মিলাতে পারি। আমার প্রেমগান জীবিত ও মৃতের মাঝখানে কোনো বিভেদ রচনা করে না। আমার প্রেমগান জীবিত-মৃত সকলকেই লক্ষ করে—

প্রেম-পাথারে যে সাতারে
তার মরণের ভয় কি আছে
নিষ্ঠা-মনে প্রেম করিয়ে
এক মনে বসে রয়েছে॥
শুদ্ধ-প্রেম রসিকের ধর্ম
মানে না বেদ-বিধির কর্ম
রসরাজ রসিকের ধর্ম
রসিক বই আর কে জেনেছে॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ
পঞ্চতে হয় নিত্যানন্দ
যার অন্তরে সদানন্দ
নিরানন্দ জানে না সে॥

গান গাইতে গাইতে কবি যখন গ্রেভইয়ার্ডের আরও গভীরে ঢুকে যেতে থাকেন ঠিক তখনই সে গ্রেভইয়ার্ডের ভেতর থেকে রোমিও এবং জুলিয়েট জুটি প্রকাশিত হন। তারা কবিকে অনুসরণ করে কণ্ঠে গান তুলে নিতেই তিনি চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকান–

কবি : কে কে?

রোমিও : আমি রোমিও।

কবি : কিন্তু আমি যে রোমিওকে জানি সে তো বহুকাল আগে...

জুলিয়েট : আত্মহত্যা করেছে।

কবি : হ্যাঁ

জুলিয়েট : সত্য কথা । কিন্তু এও তো সত্য আত্মহত্যার ভিতর দিয়ে আমরা প্রেম ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছি। যতদিন মানুষ আর তার হৃদয় থাকবে ততদিন আমাদের প্রেম পরম দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে থাকবে।

কবি : তুমি নিশ্চয় জুলিয়েট?

জুলিয়েট : ঠিকই ধরেছেন।

কবি : কিন্তু... তোমরা... এইভাবে উপরে উঠে এলে কি করে!?

রোমিও : আপনার মিষ্টি মধুর সঙ্গীতে। আর একটু আগেই আপনি যে আমাদের সমাধিক্ষেত্রের ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে মৃত আর জীবিতদেরকে একসঙ্গে মেলালেন। আপনার এমন মিলনে আমরা কিন্তু বেশ খুশি হয়েছি... তাই না জুলিয়েট?

জুলিয়েট : হু... খুব খুশি হয়েছি।

রোমিও : এখন বলেন– আমাদেরকে দেখে আপনি খুশি হননি?

কবি : না। আমি তোমাদের ঘৃণা করি। তোমাদের প্রেমকীর্তিকেও আমি অস্বীকার করি।

রোমিও : কি বলতে চান?

কবি : কী আর বলবো! প্রেমক্ষেত্রে তোমরা উভয়েই ছিলে চঞ্চল ও অস্থির। অস্বীকার করতে পারো রোমিও– এই জুলিয়েটকে দেখার আগে– তুমি যে রোজালিনের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলে?

রোমিও : কেন? একথা তুলছেন কেন?

কবি : কেন তুলবো না! সমাধি থেকে আজ যে শুধু জুলিয়েটের হাত ধরে উঠে এসেছো! এখন বলো– রোজালিনকে তুমি কোনোদিনই বাসোনি ভালো!

রোমিও : না, তা বলতে পারবো না– আমি সত্যিই তাকে অন্তর থেকে কামনা করেছিলাম, কিন্তু সে আমার... আমার জীবনে সে একটা দুঃসহ কষ্ট ছিল...

জুলিয়েট : ছি রোমিও ছি! আমি তোমার মতো একটা মিথ্যুক প্রতারকের জন্যে আত্ম-উৎসর্গ করেছি! ছি!

রোমিও : জুলিয়েট, জুলিয়েট, শান্ত হও।

জুলিয়েট : না, তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না।

রোমিও : কেন জুলিয়েট? আমি কি তোমাকে ভালোবাসি নাই? আমাদের প্রেম কি সত্য নয়?

জুলিয়েট : তবে, কেন তুমি তোমার জীবনের এমন সত্য আমার কাছে গোপন করেছিলে? কেন? এরকম ছলনা তুমি আমার সঙ্গে না করলেও পারতে?

রোমিও : না জুলিয়েট, আমার কোথাও কোনো ছলনা ছিল না। একথা সবাই জানতো—আমার বন্ধু বেনভোলিও জানতো, জানতো মারকুশিও, এমনকি ফাদার ফ্রায়ারও... বিশ্বাস করো জুলিয়েট, সেকথাটা কেবল তোমাকেই বলে উঠতে পারি নাই।

জুলিয়েট : বুঝেছি বুঝেছি আমি সব বুঝেছি—ছি রোমিও, ছি—যে-কথা সবাই জানতো সে-কথা আমাকে জানালে কি এমন ক্ষতি হতো তোমার! বলো—তুমি কি ভেবেছিলে রোজালিনের প্রতি তোমার প্রেমের কথা জানলে আমি তোমাকে বিয়ে করতাম না! ভালোবাসতাম না!

রোমিও : ব্যাপারটা তা নয় জুলিয়েট। আসলে, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর, তোমার সাথে কথা বলার পর বুঝেছি প্রেম কি বস্তু... ! আর এও বুঝেছি রোজালিনের প্রতি আমার যেটা ছিল সেটা আসলে প্রেম নয়– আমার চোখের মুগ্ধতা মাত্র।

কবি : মুগ্ধতা! তুমি কোনটাকে মুগ্ধতা বলছো! মিস্টার রোমিও, এইবার কিন্তু আমাকে কথা বলতে হচ্ছে... ।

এই তুমিই কিন্তু সেদিন বলেছিলে– 'আমার এই দুই চোখের দোহাই, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধ্যান রোজালিন, আমি বিশ্বাস করি ওর থেকে সুন্দর ত্রিভুবনে আর নেই, আমি তাই রোজালিনের প্রতিই নিষ্ঠাবান থাকছি– যদিও সে আমাকে বাসেনি ভালো, তবু বিশ্বাস একসময় সে আমার প্রেমনিষ্ঠার কাছে পরাজিত হবেই... আর সেই জয়ের আনন্দ নিয়ে আমি সংসার পাতবো কেবলমাত্র রোজালিনের সঙ্গেই... ।'

মিস্টার রোমিও, এখন বলো– এই মনকথা এই প্রতিজ্ঞা তোমার ছিল না! হায় কি অপূর্ব তোমার প্রেম নিষ্ঠা! সেদিনের ভোজসভায় রোজালিনের প্রেমনিষ্ঠ রোমিও, তুমি তো সং সেজে রোজালিনকেই দেখতে গিয়েছিলে, নাকি? আর সেখানে গিয়ে তোমার ওই দুই চোখের দোহাই লাফিয়ে পড়ল জুলিয়েটের দেহের উপর... ! বাহ, চমৎকার! এই তোমার প্রেমনিষ্ঠা! ভোজসভায় জুলিয়েটের সাক্ষাত পেয়ে একমুহূর্তেই রোজালিনকে ভুলে গেলে! হায় প্রেম নিষ্ঠা!

রোমিও : আপনার কথা কি শেষ?

কবি : আপাতত। এখন বলো, আমি সব মিথ্যে বলেছি– সব মিথ্যে।

রোমিও : না, আপনি ঠিকই বলেছেন... রোজালিনকে আমি সত্যিকারের প্রেম নিষ্ঠা থেকেই অন্তরে স্থাপন করেছিলাম।

কবি : তবে সমস্যা হলো...

রোমিও : আমাকে বলতে দিন।

কবি : ঠিক আছে, তাই বলো। আমি তো তোমার... না না, তোমাদের কথা শোনার জন্যে সেই কবে থেকে অপেক্ষা করছি। বলো বলো– প্রাণ খুলে বলো। তবে, একটা কথা–

রোমিও : আবার কী কথা?

কবি : মিথ্যা বলবে না। মিথ্যাবাদীকে আমি ঘৃণা করি।

জুলিয়েট : মিথ্যাবাদীকে আমিও...

রোমিও : জুলিয়েট, আমাকে কথা বলতে দাও।

জুলিয়েট : কী বলবে তুমি!

রোমিও : জুলিয়েট!

জুলিয়েট : ঠিক আছে, বলো।

রোমিও : এই যে মিস্টার, আমি জানি না আপনি কে? তবে, শুনুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না...

কবি : বলুন, আমি শুনছি।

রোমিও : আসলে কী জানেন, জুলিয়েটকে দেখার পর আমি নতুনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি... ।

কবি : নতুন সিদ্ধান্ত!

রোমিও : হ্যাঁ নতুন সিদ্ধান্ত, আর সেটা ঘটেছিল জুলিয়েটের অদ্ভুত এক জাদুকরি আকর্ষণে এবং তারই সমর্থনে। আমি সেই প্রথম বুঝি– এক নিষ্ফল প্রেমনিষ্ঠায় মাসের পর মাস অর্থহীনভাবে রোজালিনকে ভালোবেসে গেছি... জুলিয়েটকে দেখামাত্র আমার সেই মোহভঙ্গ ঘটে। তবে, এও সত্য– আমি রোজালিনকে একসময় যথার্থ অর্থেই ভালোবাসতাম, কিন্তু এই আমার প্রকৃত প্রেম সম্ভব হয়েছে কিন্তু এই জুলিয়েটের সঙ্গে, জুলিয়েটের সাথে।

কবি : মিথ্যে, সব মিথ্যে... জুলিয়েট তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলে তুমি সত্য গোপন করছো... আসলে, জুলিয়েটের প্রতি তোমার কোনো প্রকৃত প্রেম ছিল না, যা ছিল রোজালিনের প্রতি।

রোমিও : জুলিয়েট, তুমি তো রোজালিনকে চিনতে... বলো ওর সঙ্গে তুমি কি কোনোদিন আমাকে দেখেছো... জুলিয়েট বলো?

জুলিয়েট : না, কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে, তোমার জীবনে আমিই একমাত্র।

রোমিও : জুলিয়েট! ... তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে!

জুলিয়েট : ভুল কি ঠিক তা আজ আমার বোঝার সাধ্যকে অতি□ম করে গেছে।

রোমিও : তাহলে শোনো– এই দুটি চোখ তখন শুধু একপাক্ষিকভাবে এই আমাকে রোজালিনের প্রতি আসক্ত রেখেছিল। কিন্তু রোজালিন কোনোদিনই আমাকে বাসে নাই ভালো, এমন কি সে এই আমার দিকে ফিরে তাকায়নি... উহ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! যে আমাকে ভালোবাসে না, আমার দিকে একবারের জন্যও ফিরে তাকায় না, তার জন্যে হৃদয় নিয়ে বসে থাকার সে যে কি যন্ত্রণা... তা তুমি বুঝবে না জুলিয়েট! এখন বলো– এটা কি কোনো প্রেম? না জুলিয়েট, তোমার সঙ্গে আমার যা হয়েছে, তারপর ওটাকে কি কখনো প্রেম বলা যায়? বলো জুলিয়েট বলো... কথা বলছো না কেন? বলো...

জুলিয়েট : তোমার কথার চমৎকারিত্বে আমি প্রথম থেকেই মুগ্ধ... এরপর... আর কি শুনতে চাও আমার কাছে?

জুলিয়েলের শ্লেষবাক্যে রোমিও কিছুক্ষণের জন্য বাক্য হারিয়ে ফেলে। তারপর একটুখানি স্বাভাবিক হয়ে ঠাণ্ডা গলায় জুলিয়েটকে প্রবোধ দিতে চান।

রোমিও : জুলিয়েট, একটা কথা শোনো, একটু মন দিয়ে শান্ত হয়ে শোনো– আর একবার শুধু একবার আমাদের জীবনের ঝড়ো ভালোবাসার দিকে তাকাও।

কবি : চমৎকার রোমিও চমৎকার! তোমাদের ভালোবাসাকে চমৎকার বিশেষণে বিশেষায়িত করলে বড়ই চমৎকার! তোমার কথার সূত্রে ভবিষতের মানুষ জানলো নতুন একটি কথা– রোমিও এবং জুলিয়েট 'ঝড়ো ভালোবাসা' করেছিল, 'ঝড়ো ভালোবাসা'য় মরেছিল।

রোমিও : থামুন আপনি, থামুন।

কবি : ঠিক আছে থামছি। রোমিও বলো বলো আরও বলো, আজ তো শুধু তোমাদের কথাই শুনবো।

রোমিও : হ্যাঁ তা-ই শুনবেন। কেবল একটুখানি দয়া করুন, আমার কথাটা বলতে দিন। দয়া করে আমার কথার মাঝে আর কোনো কথা বলবেন না।

কবি : তথাস্তু। দেখি কতটুকু বলতে পারো! আর কতটা মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে পারো ওই সরলা জুলিয়েটকে! দেখি।

তীর্যকভাবে কথা বলতে বলতে কবি সরে দাঁড়ান। রোমিও কবির যে তীর্যক কথায় অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না। বরং তিনি জুলিয়েটের পাশে এসে বলেন–

রোমিও : জুলিয়েট, ওই লোকটা আমাদের শত্রু, দেখছো না– তোমার সামনে আমাকে কেমন ব্যঙ্গ করছে!

কবি : আরও নিবিড় হয়ে জুলিয়েটকে আগলে ধরো। তারপর কথা বলো।

রোমিও : থামুন আপনি।

কবি : পারলে আরও উত্তেজিত হও, আমি জানি মানুষ উত্তেজিত হলে ভেতরের আসল মানুষটা বেরিয়ে আসে। আমি তোমার সেই রূপটা তোমার ওই জুলিয়েটের সামনে প্রকাশ করে দিতে চাই, পৃথিবীর সব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিতে চাই।

রোমিও প্রচণ্ডভাবে রেগে কবির দিকে ছুটে যেতে গিয়ে কেন যেন থেমে যান। তারপর অত্যন্ত অস্থির আবেগে কেঁপে কবির দিকে তীক্ষ্ণ-তীর্যকচোখে তাকিয়ে নিজেকে এক প্রকার সংযত করে নেন। শেষে তিনি জুলিয়েটের দিকে ফিরে তাকান এবং কাছে গিয়ে বলেন–

রোমিও : জুলিয়েট, তুমি কী বুঝতে পারছো– ওই লোকটা একটা বদ্ধ-উন্মাদ... আমাদের শত্রু... কী কথা বলছো না কেন?

জুলিয়েট : আজ আমার সব কথা হারিয়ে গেছে।

রোমিও : শোনো, আমি আমার পূর্বপ্রেমের কথা নিশ্চয় তোমাকে বলতাম হয়তো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, সে সময়টা আমার জীবনে আসেনি। জুলিয়েট, জুলিয়েট, তুমি তো জানো, আমরা আমাদের অতি অল্প সময়ের যুগল প্রেমের মাঝখানে কোনো অবসর পাইনি। অবসর পেলে আমি আমার সব কথা তোমাকে বলতাম– নিশ্চয় হয়তো ।

জুলিয়েট : নিশ্চয়, হয়তো! বাহ বেশ, বেশ রোমিও, আমি জানি, 'নিশ্চয়' আর 'হয়তো' এই শব্দ দুটি পরস্পরবিরোধী কথা বলে... বেশ রোমিও বেশ, আজ তোমার কথার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে– অবসর পেলেও তুমি ওই গোপন-সত্যটা আমাকে বলতে না, কোনোদিন বলতে না। শুধু শুধু মিথ্যা বলে কী লাভ রোমিও!

রোমিও : জুলিয়েট জুলিয়েট জুলিয়েট, তুমি বিশ্বাস করো... ।

জুলিয়েট : সরে যাও তুমি। আমাকে একটুও স্পর্শ করবে না।

রোমিও : জুলিয়েট!

জুলিয়েট : হ্যাঁ, স্পর্শ করবে না।

রোমিও : জুলিয়েট, ভুলে যেয়ো না, একদিন তুমি আমার এই হাতের স্পর্শেই শিহরিত হয়েছিলে– সে কথা ভুলে যেয়ো না।

জুলিয়েট : না, একেবারেই ভুলে যাচ্ছি না যে, ওই হাতের স্পর্শ-ছলনাই সবচেয়ে বেশি ঠকিয়েছে আমাকে!

রোমিও : ভুল জুলিয়েট, সব ভুল। আমার কথার আদ্যপান্ত শুনলে তোমার সব ভুল ভেঙে যাবে। জুলিয়েট, একবার, শুধু একবার মনে করে দেখো,– রাতে তোমার সাথে দেখা। কোন অচেতনে জানি তোমার হাতে লেগে গেল আমার হাত, সেই স্পর্শ শিহরণকে নিয়ে হলো কথা।

জুলিয়েট : আর সে রাতেই তুমি আমার সরল-মুগ্ধতার সুযোগ নিয়ে উঠে এসেছিলে আমার শোবার ঘরের বেলকনিতে...

রোমিও : হ্যাঁ, আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উঠে গিয়েছিলাম তোমার বেলকনিতে ... কেননা, তখন তুমি আমার স্পর্শ-ভালোবাসার কথাই ভাবছিলে... তোমার সেই ভাবনা আমাকে পাগল করে দিয়েছিলো জুলিয়েট... পাগল করে দিয়েছিলো... আজও ধন্য মানি তোমার সেই ভাবনাকে... ।

জুলিয়েট : আমার সেই ভাবনার সঙ্গে একটি কচি মনের পবিত্র-সরলতার যোগ ছিল... ।

রোমিও : সত্যিকারের ভালোবাসা কাকে বলে সেই রাতে আমি টের পেয়েছিলাম জুলিয়েট।

জুলিয়েট : আমি তখন একটুও ভাবতে পারি নাই যে কোনো প্রেমিকের মধ্যে একবিন্দু মিথ্যের আশ্রয় থাকতে পারে... ।

রোমিও : শুধু একটুখানি কথা বলতে– তোমার বেলকনিতে উঠে গিয়েছিলাম আর বুঝেছিলাম সত্যিকারের ভালোবাসার ভেতর কেমন অস্থিরতা মিশে থাকে...

জুলিয়েটের সঙ্গে রোমিও'র এমন কথার মধ্যে কবি আর স্থির থাকতে পারেন না। তিনি রোমিও-র দিকে এগিয়ে বলেন–

কবি : না না, মিথ্যে ভালোবাসার সঙ্গেই অস্থিরতা মিশে থাকে।

রোমিও : মানে?

কবি : কেননা, মিথ্যে ভালোবাসা নগদ-প্রাপ্তির জন্য মরিয়া হয়ে থাকে, যত দ্রুত সম্ভব অর্জন আর ভোগে বিশ্বাস করে। কারণ, মিথ্যে ভালোবাসাতে হারানোর ভয় একটু বেশি থাকে। না-কি বলো রোমিও?

রোমিও : আমি আপনার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না।

কবি : আমি জানি, বুঝলেও তা তোমার স্বীকার করার কথা নয়।

রোমিও : কী বলতে চান আপনি?

কবি : বলছি। আচ্ছা বলো তো তোমার ওই 'ভালোবাসা', 'অস্থিরতা' আবার 'ঝড়ো ভালোবাসা' এ সবের মধ্যে নিশ্চয় কোনো পার্থক্য নেই?

রোমিও : তা থাকবে কেন?

কবি : জানি, প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয় চতুর মানুষেরা।

রোমিও : আপনি আমাকে চতুর বলছেন!

কবি : হ্যাঁ, বলেছি। এবং আবারো বলছি আপনি চতুর। কেননা, আপনি প্রথম থেকেই আমার সব কথাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়ছেন।

রোমিও : না আমি আপনার কোনো কথাকেই পাশ কাটিয়ে যাইনি।

কবি : তাহলে স্বীকার করো– তোমার ওই তথাকথিত 'ভালোবাসা', 'অস্থিরতা' আর 'ঝড়ো ভালোবাসা' এ সবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

রোমিও : আমি জুলিয়েটকে ভালোবেসে অস্থিরভাবে ওকে পেতে চেয়েছিলাম।

কবি : ব্যাস, আমার উত্তর পেয়ে গেছি। এখন– শোনো, শোনো সত্যিকারের ভালোবাসার সঙ্গে কোনো অস্থিরতা মিশে থাকতে পারে না। কেননা, সত্যিকারের ভালোবাসায় হারাবার কোনো ভয় থাকে না, আবার মনের মানুষটাকে নিশ্চিত পাবার বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকে না। তাই সত্যিকারের ভালোবাসার গতি বা চলন হয় অস্থির নয়, ধীর-স্থির। এই মুহূর্তে তুমি আমার গানটির কথা মনে করতে পারো– 'নিষ্ঠা মনে প্রেম করিয়ে/এক মনে বসে রয়েছে।' সত্যিকারের ভালোবাসা এমনই স্থিরতাকে মানে। আরেকটু শোনো ওই গানটা– 'প্রেম-পাথারে যে সাতারে/তার মরণের ভয় কি আছে/নিষ্ঠা-মনে প্রেম করিয়ে/এক মনে বসে রয়েছে॥'

কবি তার এই গান গাইতে গাইতে আবার একটু দূরে সরে যান। আর রোমিও তার আগের কথার ধারাবাহিকতা রেখে জুলিয়েটকে বলেন–

রোমিও : জুলিয়েট, তুমি আমি দুজনেই খুব অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। মনে করে দেখো জুলিয়েট, শুধু আমি নই, তুমিও আমার জন্য কেমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে, আমিও তোমার জন্য। একটুও বিরহ আমাদের সহ্য হয়নি। সকাল হতে না হতেই আমি আমার অস্থির প্রেমের উপায় বাতলে নিতে ছুটে গিয়েছিলাম চার্চে।

জুলিয়েট : আমি সেদিন সরল বিশ্বাসের কাছে পরাজিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কী যে করেছিলাম!

রোমিও : কিছুক্ষণ পর তুমিও ছুটে গিয়েছিলে একই স্থানে– মানে চার্চে। সেখানে সেই সকালে ফাদার ফ্রায়ার আমাদের দুজনার দুটি হাতকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন বিয়ের কারণে, বিয়ের মন্ত্রে। মনে নেই তোমার?

জুলিয়েট : মনে আছে। কিন্তু তারপর?

রোমিও : তারপর তোমার ভালোবাসা আমার এই পোড়াকপালে সইলো না জুলিয়েট, সইলো না...

জুলিয়েট : আর ভান করো না রোমিও! আর না। আমি বলি শোনো– তারপর সেই সকালে তুমি আমাদের পরম-আত্মীয় টাইবল্টকে হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছিলে, এটাই আসল কথা।

রোমিও : না, জুলিয়েট, না। আমি সেইদিনও বলেছি, আজও বলছি– আমি টাইবল্টকে হত্যা করিনি। বরং টাইবল্টের আ□মণ হতে নিজেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।

জুলিয়েট : আর তখনই টাইবল্ট তোমার হাতের তরবারিতে খুন হয়েছিল, সেটা ছিল তোমার অনিচ্ছাকৃত। জানি তো!

রোমিও : বিশ্বাস করো, এটাই সত্য। আমি তাকে হত্যা করিনি, আত্মরক্ষার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে সে আমার হাতের তরবারিতে খুন হয়েছিল।

রোমিও-র কথার মধ্যে কবি চিৎকার করে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসেন–

কবি : বাহ্ বেশ রোমিও! জানি, প্রতারকেরা এরকমই বলে– 'আমি তাকে হত্যা করিনি, সে আমার হাতের তরবারিতে খুন হয়েছিল।'

রোমিও : থামুন আপনি।

কবি : রোমিও!

রোমিও : না, ওই মুখে আর আমার নাম উচ্চারণ করবেন না।

কবি : রোমিও!

রোমিও : বেরিয়ে যান এখান থেকে।

কবি : রোমিও!

রোমিও : আর একটাও কথা নয়, যান এখান থেকে।

কবি : না, আমাকে ধাক্কা দেবে না।

রোমিও : মুখের কথায় না গেলে, ধাক্কা দিয়েই বের করে দেবো।

কবি : আমার সাথে ভদ্রতা করে কথা বলো।

রোমিও : ভদ্রতা! আপনি কে, যে আপনাকে সালাম করে কথা বলতে হবে! যান বলছি, যান এখান থেকে।

কবি : দেখেছো দেখেছো মিসেস রোমিও, তোমার হাজব্যান্ডের কেমন ব্যবহার! আমার সাথে কেমন অসৎ খারাপ ব্যবহার করছে দেখো।

রোমিও : আর কোনো কথা না, যান এখান থেকে।

কবি : মিসেস রোমিও, দেখো দেখো, কেমন ব্যবহার তোমার স্বামীর!

রোমিও : মুখ বন্ধ করুন।

কবি : কারো মুখে হাত দিয়ে নিজের চরিত্রের দুর্বলতা চেপে রাখা যায় না– মিস্টার রোমিও।

রোমিও : আমার চরিত্র নিয়ে আপনি কথা বলার কে!

কবি : মিস্টার রোমিও, আমি আবার বলছি– আমার সাথে ভদ্রতা করে কথা বলো– আই অ্যাম এ পোয়েট, আই মিন কবি, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করে কথা না বললে– এখানে আজ তোমার সব সহপাঠী বন্ধুদের ডেকে এনে জুলিয়েটকে শুনিয়ে ছাড়বো– জুলিয়েটকে ভালোবাসার আগে তুমি রোজালিনকে কতটা ভালোবাসতে।

জুলিয়েট : তার আর প্রয়োজন হবে না, আমি আজ আমার প্রেমিক বা স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে সবটুকু বুঝে গেছি।

রোমিও : না জুলিয়েট, তুমি কিচ্ছু বোঝোনি, কিচ্ছু না। আসলে কী জানো, একটি দিনের জন্যেও আমি আমার সব কথাকে তোমার কাছে বলার সুযোগ পাইনি জুলিয়েট।

জুলিয়েট : কেবল সুযোগ পেয়েছিলে মেকি আর মিথ্যে প্রেমের কথাগুলো বানিয়ে বানিয়ে বলে শোনাতে।

রোমিও : আমাকে এইভাবে আর আহত করো না জুলিয়েট।

জুলিয়েট : তুমি একজন মিথ্যেবাদী, আমার সত্য কথাতে তুমি আজ আহত হলে আমার কিচ্ছু করার নেই।

রোমিও : আহ্ জুলিয়েট, এরকম কথা বলার চেয়ে আমাকে হত্যা করো।

জুলিয়েট : আমি তোমার মতো নিষ্ঠুর নই।

রোমিও : নিষ্ঠুর! কে নিষ্ঠুর? আমি না তুমি? দিনের বেলায় টাইবল্ট খুন হবার পর রাতের বেলায় আমি যখন তোমার কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম তখন তুমি বলেছিলে, আমার স্পষ্ট মনে আছে, তুমি বলেছিলে– 'যথার্থ প্রেমিক যদি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো মারাত্মক অপরাধও করে ফেলে তবে তার প্রেমিকার উচিত তাকে ভুল না-বোঝা।' আজ কোথায় তোমার সেই কথা! কোথায়, জুলিয়েট!

জুলিয়েট : কথাটা ঠিকই আছে, কিন্তু আজ আমি জেনে গেছি– তুমি যথার্থ প্রেমিক নও।

রোমিও : জুলিয়েট!

জুলিয়েট : বলো? কী বলতে চাও?

রোমিও : আমি যথার্থ প্রেমিক ছিলাম না!

জুলিয়েট : না।

রোমিও : না! তাহলে শোনো, তুমিই আমাকে তোমার কাছে যথার্থ প্রেমিক হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ দাওনি, এখনও দিচ্ছো না।

জুলিয়েট : ভুল, রোমিও ভুল।

রোমিও : না এটাই সত্য।

জুলিয়েট : গলার জোরে সত্য ঘোষণা করলেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না।

রোমিও : জুলিয়েট, আমি ভুলে যাইনি যে, সেদিন আমাদের দুজনার মধ্যে কথা ছিল, আমরা আমাদের প্রেম-দুঃখের অবসান ঘটাবো এক মধুর মিলনে। আর তাই আমরা এক অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার নিয়তিকে মেনে নিয়েছিলাম সামান্য বিরহকে স্বীকার করে নিয়ে। তুমি আমার স্বেচ্ছানির্বাসনের অন্তরায়ের ভেতর আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছিলে– আমরা এক মধুর মিলনের অপেক্ষায় থাকবো। কিন্তু তুমি তোমার কথা রাখোনি, জুলিয়েট কথা রাখোনি।

জুলিয়েট : আমি কথা রাখিনি!

রোমিও : হ্যাঁ, তুমি কথা রাখোনি। তুমি আমাদের মধুর মিলনের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারোনি, একটুখানি কষ্ট স্বীকার করতে পারোনি।

জুলিয়েট : কী যা তা বলছো! আমি জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছি তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য।

রোমিও : মিথ্যে কথা। কিচ্ছু করো নি তুমি। কিচ্ছু না। বরং আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজে আত্মহত্যা করে আমাকেও আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিলে...

জুলিয়েট : আর মিথ্যে বকো না, আমি তোমাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করিনি, বরং তুমিই আমাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছো। আর মিথ্যে বলো না।

রোমিও : কোনটা মিথ্যে, জুলিয়েট? আমি মাঞ্চুয়ায় নির্বাসনে যাবার পর তুমি আত্মহত্যা করোনি?

জুলিয়েট : না, আমি তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলাম মাত্র।

রোমিও : মিথ্যে কথা।

জুলিয়েট : না মিথ্যে নয়, আমি মিথ্যে বলছি না।

রোমিও : তাহলে নিশ্চয়– আমি মিথ্যে বলছি– মাঞ্চুয়ায় নির্বাসনে যাবার পর আমি বন্ধু বালথাসারের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলাম যে– তুমি নাই। তোমার মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্রেভইয়ার্ডে। এটা মিথ্যে? বলো– আমি যে চোখের নিমিষে সুদূর মাঞ্চুয়া থেকে এই গ্রেভইয়ার্ডে ছুটে এসে তোমার কবর খুঁড়ে– তোমার যে মৃতদেহকে বের করে এনেছিলাম– সেটা মিথ্যে? নাকি বলো– তোমাকে মৃত দেখে আমি যে আত্মহত্যা করেছিলাম– সেটা মিথ্যে? বলো বলো– আমার জন্য অপেক্ষা না করে কেন তুমি আত্মহত্যা করেছিলে? কেন?

জুলিয়েট : বিশ্বাস করো, আমি তখনও আত্মহত্যা করিনি! আমি তোমার আগে আত্মহত্যা করিনি– তোমার আগে মরিনি। তুমি ভুল বলছো রোমিও। ভুল।

রোমিও : না জুলিয়েট, আমি ঠিকই বলছি। কেননা, কবর খুঁড়ে তোমাকে আমি মৃত পেয়েছিলাম। আমার এই হাতের স্পর্শ আর চোখের দৃষ্টি শক্তি সেদিন একটুও ভুল করে নাই জুলিয়েট, একটুও না।

জুলিয়েট : ভুল, রোমিও, ভুল, সব ভুল, তুমি ভুল করে আত্মহত্যা করেছিলে।

রোমিও : না, আমার আত্মহত্যার ভেতর কোনো ভুল ছিল না।

জুলিয়েট : ছিল, রোমিও ছিল। কেননা, তোমার আত্মহত্যার পর আমার চেতনা ফিরে এসেছিল।

রোমিও : এ আমি বিশ্বাস করি না।

জুলিয়েট : বিশ্বাস করো রোমিও, আমার চেতনা ফিরে এলে– এই আমার দেহের উপর তোমাকে নিষ্প্রাণ পড়ে দেখে নিজের জীবনকে নিরর্থক মনে হয়েছিল।

রোমিও : বাহ্ জুলিয়েট, বাহ্! তোমাকে ধন্য মানি, আমার আত্মহত্যার কথা শুনে তুমি তাৎক্ষণিকভাবে যে মিথ্যে আর বানোয়াট গল্প বানাতে শুরু করছো– তাতে আমি মুগ্ধ!

জুলিয়েট : মিথ্যে নয় রোমিও– তোমাকে মৃত দেখে তোমারই কোমর থেকে ভোতা একটা ছুরি খুলে নিয়ে এই বুকে বিদ্ধ করে আমি যে আত্মহত্যা করেছিলাম, এটা মিথ্যে নয়।

রোমিও : তোমার এই প্রতিভার কথা আগে আমি জানতাম না! মিথ্যে আর কাল্পনিক গল্প বানাতে তুমি যে এত ওস্তাদ– তা আজ এতোদিন পর জেনে আমি তোমার প্রতি নতুন করে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি!

জুলিয়েট : বিশ্বাস করো, আমি তোমায় কোনো মিথ্যে-কাল্পনিক গল্প বানিয়ে বলিনি। বলেছি আমাদের নাটকীয় জীবনের সত্যকাহিনী।

কবি এবার চিৎকার করতে করতে জুলিয়েটের সামনে এসে দাঁড়ান এবং বলেন–

কবি : জুলিয়েট, জুলিয়েট, হ্যাঁ জুলিয়েট– আমিও তোমাদের নাটকীয় জীবনের সত্য কাহিনীটাকে একটু ভাঁজ খুলে খুলে শুনতে চাই, শোনাতে চাই তোমার রোমিওকে। কী জুলিয়েট, বলবে না?

জুলিয়েট : কী বলতে চাইছেন?

কবি : না, তেমন কিছু না, আজ শুধু বলে যাও তোমার প্রথম গান–প্রথম আখ্যান, যার অন্তরাটুকু রচিত হয়েছিল তোমার প্রথম মৃত্যুর আগে।

জুলিয়েট : মানে?

কবি : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে– আজ নয়, ওতে রোমিও আর তোমার মাঝের গভীর ফাঁককে বোঝা সম্ভব নয়। আজ বলো, তোমার প্রথম মৃত্যুর আগের কথাগুলো।

জুলিয়েট : কেন?

কবি : উত্তরটা একটু পরে দিই? তার আগে বলো, তোমার প্রথম মৃত্যুর আগে কী ঘটেছিল?

জুলিয়েট : কী সব বলছেন আপনি! প্রথম মৃত্যু, দ্বিতীয় মৃত্যু... আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

কবি : পারবে পারবে, সব বুঝতে পারবে... আগে বলো, রোমিও নির্বাসনে চলে গেলে তোমার জীবনে কী এমন ঘটেছিল যে তুমি প্রথম মৃত্যুর স্বাদ নিয়েছিলে? প্রথম নয়, ওটাই ছিল তোমার আসল মৃত্যু... না-কি বলো?

জুলিয়েট : কী বলছেন আপনি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

কবি : বোকা মেয়ে, এইটুকু বুঝতে পারছো না!

জুলিয়েট : না।

কবি : তাহলে শোনো, রোমিও কিন্তু তোমাকে মৃত-ই জেনেছিল এবং গ্রেভইয়ার্ডে মাটি খুঁড়ে মৃত-ই পেয়েছিল তোমাকে।

জুলিয়েট : না না, এ হতে পারে না, ফাদার ফ্রায়ারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কখনো মিথ্যে হতে পারে না।

কবি : ফাদার ফ্রায়ারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি! হে হে... সে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল... হে হে... । শুনে রাখো, সে ছিল একটা মিথ্যুক, প্রতারক... ।

রোমিও : থামুন। আমি আর কিছুই শুনতে চাই না।

কবি : কেন রোমিও? তোমার আবার কী হলো?

রোমিও : একটা সৎ ও ভালো মানুষ সম্পর্কে আপনি মুখ সামলে কথা বলুন।

কবি : আমার বিবেচনায় তিনি সৎ নন, ভালো মানুষও নন, তিনি একটা খারাপ এবং নিকৃষ্ট মানুষ।

রোমিও : না, তিনি সৎ এবং আদর্শবান মানুষ।

জুলিয়েট : তাঁর মতো ভালো মানুষ এখনও এ পৃথিবীতে নাই।

রোমিও : আপনি জানেন না– তিনি আমাদের জন্য কী করেছেন!

কবি : কী করেছেন?

রোমিও : আমাদের দুই পরিবারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অহেতুক দ্বন্দ্ব-বিরোধকে উপেক্ষা করে তিনি গোপনে জুলিয়েট আর আমাকে বিবাহ দিয়েছিলেন।

জুলিয়েট : শুধু তাই নয়, তিনি আমাদের এই বিবাহের মধ্য দিয়ে দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান ঘটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই না, রোমিও?

রোমিও : একেবারে ঠিক কথা। একজন সৎ ও ভালো মানুষ না-হলে তিনি এই রকমটি করতে পারতেন না।

জুলিয়েট : এই যে মিস্টার পোয়েট, আপনি ভাবতে পারবেন না– তিনি কতটা ভালো মানুষ ছিলেন!

কবি : কতটা?

জুলিয়েট : শুনুন, বলছি।

কবি : বলো।

জুলিয়েট : রোমিও নির্বাসনে যাবার পর যখন প্যারিসের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে যায়– তখন আমি খুব অস্থির হয়ে উঠেছিলাম– কী করবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এরই মাঝে আমার ফাদার ফ্রায়ারের কথা মনে হয়– ছুটে গিয়েছিলাম সেন্ট পিটার্স গির্জায় ফাদার ফ্রায়ারের কাছে। তিনি আগে থেকেই জানতেন– ব্যাপারটা– যে প্যারিস আমাকে বিবাহ করতে আসছে।

কবি : তারপর?

জুলিয়েট : আমি ফাদার ফ্রায়ারের কাছে গিয়ে একটা ছুরি হাতে নিয়ে ভীষণ আবেগিক হয়ে বলেছিলাম– 'ফাদার, জানি আমি– ঈশ্বর আমাদের দুটি হৃদয়কে এক করেছেন আর আপনি এক করেছেন আমাদের দুটি হাত। রোমিওর সাথে আবদ্ধ এই হাত যদি অন্য কারো সাথে আবদ্ধ হয়। তাহলে তার আগেই আমার এই হাত আর এই হৃদয়– দুটিকেই আমি হত্যা করবো। এখন আমি কী করবো? বলুন ফাদার। আর যদি তা না বলেন, তাহলে দেখুন, আমি এই ছুরির আঘাতে সব সমাধান করবো। আপনি আর দেরি করবেন না, ফাদার। আমি মরতে চাই। তার আগে অন্য কোনো উপায় যদি কিছু থাকে বলুন– যাতে আমি এবং আমার প্রেম রক্ষা পেতে পারে। না হলে মৃত্যুই হোক আমার পরিণতি।' আমি আমার বুকের উপর ছুরির আঘাত বসাতে গেলে ফাদার ফ্রায়ার আমাকে নিরস্ত্র করেন।

কবি : না হলে যে চার্চ-প্রাঙ্গণ রক্তাক্ত হয়ে যেতো।

রোমিও : আহ্ আপনি থামুন, আমাকে শুনতে দিন। তারপর কী হলো, জুলিয়েট?

জুলিয়েট : তারপর ফাদার ফ্রায়ার বললেন– 'ঈশ্বরের দোহাই জুলিয়েট, একটা না একটা উপায় নিশ্চয় আছে। তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো। আমি আসছি।'

কবি : বিপদের মুহূর্তে আসছি বলে অনেকে কিন্তু পালিয়ে যায়।

জুলিয়েট : কিন্তু ফাদার ফ্রায়ার পালিয়ে যাননি। তিনি কিছুক্ষণ পরই তিনি ফিরে এসেছিলেন।

কবি : এই কিছুক্ষণ তিনি কোথায় গিয়েছিলেন?

জুলিয়েট : সঠিক বলতে পারবো না। তবে, সম্ভবত তাঁর প্রিয় পুষ্প-উদ্যানে গিয়েছিলেন আর গিয়েছিলেন প্রার্থনা ঘরে। একজন ফাদার কোনো প্রশ্নের উত্তর কিংবা কোনো সমাধানের গূঢ় ইশারা তো ওই প্রার্থনা ঘর থেকেই নিয়ে আসেন।

কবি : অবশ্যই।

রোমিও : ফাদার তোমার জন্য কী সমাধান এনেছিলেন– জুলিয়েট?

জুলিয়েট : এক টুকরো মদিরা।

রোমিও : মদিরা!

জুলিয়েট : হ্যাঁ রোমিও, মদিরা। মদিরা ছোট্ট একটা শিশি হাতে করে এনে ফাদার বলেছিলেন– 'ভুলে যেয়ো না জুলিয়েট, আমি একদিন গোপনে তোমাদের বিবাহ দিয়েছিলাম।'

রোমিও : তার জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

জুলিয়েট : আমি সে-কথা বলতেই তিনি বললেন– 'তবে শোনো, আমি যা বলছি– তুমি সেই মতো কাজ করবে।' আমি বললাম– 'অবশ্যই ফাদার।' তিনি বললেন– 'এবার বাড়িতে গিয়ে প্যারিসের সঙ্গে বিয়েতে তোমার সম্মতি জানাবে।'

রোমিও : কী বলছো, জুলিয়েট! তিনি এই কথা বলতে পারলেন!

জুলিয়েট : আমিও তখন তোমার মতো বিস্মিত হয়েছিলাম।

রোমিও : শুধু বিস্মিত হবার ব্যাপার নয়, আমি ভাবছি– যিনি তোমাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন তিনি কেমন করে অমনটা বলতে পারলেন!

কবি : মিস্টার রোমিও, একটু শান্ত হও, জুলিয়েটকে বলতে দাও।

রোমিও : এরপর আর কী বলবে! বলবে যে– ফাদারের ওই কথা শুনে সে আত্মহত্যা করেছিল– এই তো!

জুলিয়েট : না রোমিও, তা নয়। ফাদার আসলে তোমার আমার মিলনের জন্য একটা কৌশলের আশ্রয় নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন– প্যারিসের সঙ্গে বিবাহতে সম্মতি জানিয়ে রাতে একটা নির্জন ঘরে থাকতে। তারপর সে ঘরের নির্জনতায় খুব গোপনে তাঁর দেওয়া ওই মদিরা পান করতে।

রোমিও : কেন, মদিরা পান করতে কেন?

কবি : বলো জুলিয়েট, বলো।

জুলিয়েট : ফাদার বলেছিলেন– ওই মদিরা পানের কিছুক্ষণের মধ্যে আমার চেতনা লুপ্ত হবে। কিন্তু বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পর আবার আমার চৈতন্য ফিরে আসবে।

কবি : মিথ্যে কথা।

জুলিয়েট : আমাকে বলতে দিন।

কবি : মিথ্যে কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

জুলিয়েট : আমি যা বলছি সত্য বলছি। শুনুন, ফাদার আরও বলেছিলেন– সকালে ঘরের দুয়ার খুলে সকলে চেতনাহীন আমাকে দেখে ভেবে নেবে আমি মৃত... ভেবে নেবে আমি আত্মহত্যা করেছি একা ঘরে রাতের অন্ধকারে।

কবি : আসলে তো আত্মহত্যা করেছিলে। আর তা ওই ফাদারের দেওয়া বিষ পানে।

জুলিয়েট : বিষ পানে নয়, ফাদারের দেওয়া মদিরা পানে আমার চেতনা লুপ্ত হয়েছিল মাত্র। আর ফাদারের দেওয়া কথামতো চেতনাহীন আমাকে তো সবাই মাটির সমাধিতলেই রেখে এসেছিল।

কবি : কারণ, তুমি মৃত ছিলে।

জুলিয়েট : না। আমার চেতনা ফিরে এসেছিল। ফাদারের দেওয়া কথামতো রোমিও এসে কবর খুঁড়ে আমাকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, তখনও আমি ছিলাম চেতনাহীন। আর রোমিও, তুমিও সেই চেতনাহীন আমাকে দেখে অন্যদের মতোই আমাকে মৃত ভেবেছিলে।

কবি : রোমিও ঠিকই ভেবেছিল– তুমি মৃত ছিলে।

জুলিয়েট : রোমিও, কেন তুমি সাময়িক চেতনাহীন আমাকে মৃত ভেবে আত্মহত্যা করেছিলে? কেন? ফাদার ফ্রায়ার বলেছিলেন– তুমি এসে কবর খুঁড়ে আমাকে নিয়ে যাবে মাঞ্চুয়ায়। কথা ছিল সেখানেই সম্ভব হবে আমাদের যৌথ প্রেমজীবন, যা আমাদের নিজের শহর ভেরেনায় সম্ভব হয় নাই। তোমার সামান্য ভুলের জন্য আমার সব প্রত্যাশা সব স্বপ্ন এক মুহূর্তেও মধ্যে শেষ হয়ে গেল। সব সব। আমি কতো ভেবে ছিলাম– আমরা দুটি প্রাণ মাঞ্চুয়ায় পাখির সংসার পাতবো– এক হীনমন্য আর দ্বন্দ্ব সর্বস্ব পারিবারিক কলহের বাইরে। দূরে।... শুধু তোমার একটুকু ভুলে আমার সব শেষ হয়ে গেল। সব সব।

কবি : দেখছো রোমিও, কেমন কথার ছলনায় জুলিয়েট আজ সব দোষ তোমার কাঁধে তুলে দিতে চাইছে! তোমাকে ধন্য মানি জুলিয়েট– ফাদার ফ্রায়ারকে মহান প্রমাণ করতে নিজের স্বামীকে ছোট করছো বলে!

জুলিয়েট : তিনি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মহান-আদর্শের প্রমাণ রেখে গেছেন।

কবি : কেমন কেমন?

জুলিয়েট : রোমিও আত্মহত্যার পর যখন আমার চেতনা ফিরে আসে তখনও ফাদার ফ্রায়ার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে মা বলে ডেকে দিতে চেয়েছিলেন নানের পবিত্রতম পদ। কিন্তু আমি রোমিওকে ছাড়া বাঁচতে চাইনি। বাঁচিনি। আজ ভেবে দেখুন যে মানুষটি আমার জীবনের সব সঙ্কটের উপায় বাতলে দিয়েছিলেন, এমনকি আমার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে দিতে চেয়েছিলেন নানের পবিত্রতম পদ, সে মানুষটি মহান নয়তো কী? আমি জানি ফাদার ফ্রায়ার এখন কোথায় আছেন? কিন্তু এখনও আমি বিশ্বাস করি ফাদার ফ্রায়ারকে যদি আমি মন থেকে ডাকি, তবে নিশ্চয় তিনি ছুটে আসবেন।

কবি : তোমার সেই বিশ্বাসকে আমি সম্মান করতে চাই। এখন একবার তাকে ডাকো তো দেখি– তিনি আসেন কি-না?

রোমিও : হ্যাঁ, জুলিয়েট, তুমি ফাদারকে ডাকো– আজ তাঁর সম্পর্কে আমার সব বিশ্বাস, ভালোবাসা, সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ডাকো জুলিয়েট, ফাদারকে ডাকো।

কবি : হ্যাঁ, জুলিয়েট, ডাকো।

জুলিয়েট : ফাদার, ফাদার, আমি জানি না আপনি কোথায়? কিন্তু আজ আমি আপনাকে ডাকছি– আজ আপনাকে আমার ডাকে আসতেই হবে। ফাদার, ফাদার।

জুলিয়েটের এই ডাকের মধ্যে নৈপথ্য থেকে ফাদার উত্তর করেন–

ফাদার : কে? কে আমাকে ডাকে? কে?

জুলিয়েট : ফাদার, আমি জুলিয়েট। আপনি আসুন একবার।

ফাদার : কেন ডাকছো আমায়?

কবি : বলো জুলিয়েট, বলো– খুব জরুরি দরকার আছে।

জুলিয়েট : খুবই জরুরি একটা দরকার পড়েছে ফাদার। আপনি আসুন।

ফাদার : হ্যাঁ জুলিয়েট, তুমি যখন ডেকেছো– আমি অবশ্যই আসবো। কিন্তু...

জুলিয়েট : কিন্তু কেন ফাদার? আপনি আসুন।

ফাদার : আমাকে তোমার ডাকে যেতে হলে– উইলিয়াম শেক্সপিয়রের অনুমতি লাগবে।

কবি : জুলিয়েট, বলো বলো, বলো তুমি– শেক্সপিয়রকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলো।

জুলিয়েট : ফাদার, তাহলে আপনি শেক্সপিয়রকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসুন।

ফাদার : আচ্ছা, দেখছি তাকে সঙ্গে নিয়ে আসা যায় কি-না।

কবি : বলো জুলিয়েট, অবশ্যই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলো।

জুলিয়েট : ফাদার, আপনি তাকে অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে আসুন।

ফাদার : ঠিক আছে, আমি আসছি। মহাত্মা শেক্সপিয়রকে সঙ্গে করেই আনছি।

জুলিয়েট : আসুন।

ফাদার এবার শেক্সপিয়রের সাথে কথা বলেন–

ফাদার : মহাত্মা শেক্সপিয়র, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শেক্সপিয়র : কোথায়?

ফাদার : আপনার জুলিয়েট, আপনাকে এবং আমাকে আজ একসঙ্গে ডাকছে। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আমি জুলিয়েটকে কথা দিয়েছি।

শেক্সপিয়র : জুলিয়েট! এতদিন পরে! আবার নতুন কোনো কিছু ঘটেনি তো? চলো চলো, জলদি চলো।

ফাদার : হ্যাঁ স্যার চলুন।

ফাদার ও শেক্সপিয়র একসঙ্গে রোমিও, জুলিয়েট এবং কবির দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। আর কবি তাদের আগমনের ভেতর স্বাগত জানিয়ে বলেন–

কবি : আসুন আসুন, মহাত্মা শেক্সপিয়র, আসুন। আপনি তো জানেন না– আপনার সাক্ষাত প্রতীক্ষায় আমি দীর্ঘদিন ধরে এইমর্তের ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, সমাধিক্ষেত্রের মাটিতে জন্ম নেওয়া লতায় ধরা ফুলের গন্ধ নিয়েছি। আসুন... হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন...

শেক্সপিয়র : এই ছোড়া, তুমি কে?

কবি : আমাকে আপনি চিনবেন না।

শেক্সপিয়র : মানে!

কবি : এর মানে কিছু নেই... কেবল এইটুকু বলে রাখি– আপনি আমাকে চিনবেন না।

শেক্সপিয়র : কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে– কে তুমি?

কবি : আমি আমার পরিচয় বলবো না।

ফাদার : তোমার সাহস তো কম না! তুমি মহাত্মা শেক্সপিয়রের অবাধ্য হচ্ছো! তোমার সাহস দেখে আমি সত্যি হতবম্ভ হয়ে যাচ্ছি...

কবি : না ফাদার, আপনার হতবম্ভ হবার কিচ্ছু হয়নি... একটু পরে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে... তখন আপনারাও পেয়ে যাবেন আমার পরিচয় আর আমরাও পেয়ে যাবো আপনার আসল পরিচয়।

ফাদার : মহাত্মা শেক্সপিয়র, আমি আর এখানে থাকতে চাইনে। আমি গেলাম।

শেক্সপিয়র : তুমি, চলে যাবে মানে! তুমিই না আমাকে এখানে ডেকে আনলে– জুলিয়েটের কথা বলে! জুলিয়েট কোথায়?

জুলিয়েট : স্যার, এই তো আমি।

শেক্সপিয়র : কেমন আছো জুলিয়েট? তোমার রোমিও কোথায়?

রোমিও : স্যার, আমি এখানে।

শেক্সপিয়র : ওইভাবে অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

কবি : যথেষ্ট কারণ আছে। না-কি বলেন ফাদার?

ফাদার : স্যার, আমি গেলাম।

কবি : না, আপনি যাবেন না।

ফাদার : আমি তোমার কথার বাধ্য নই।

কবি : হা হা হা... *(উচ্চস্বরে হেসে বলে)* একজন হত্যাকারী যে শেষপর্যন্ত অবাধ্য হবেন– তা আমি আগে থেকেই জানতাম ফাদার ফ্রায়ার।

ফাদার : এ কী বলছো তুমি!

কবি : আপনি হত্যাকারী, জুলিয়েটকে প্রথমবার আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছেন আপনি। বলুন চেতনা নাশক মদিরার নামে আপনি কি জুলিয়েটের হাতে মরণ-বিষ তুলে দেননি? দেননি ফাদার?

ফাদার : মহাত্মা শেক্সপিয়র, শুনলেন তো ওই বদ্ধ উন্মাদটি কি বলছে! আপনার উচিত ওর কথার প্রতিবাদ করা।

কবি : হ্যাঁ, প্রতিবাদ করুন। *(একটুখানি হেসে)* জানি তা পারবেন না আপনি। কেননা, সেদিন আপনিই *(শেক্সপিয়রের দিকে ইঙ্গিত করে)* উনাকে সমাজের চোখে সম্মানে আসীন রেখেছিলেন, আজও আপনার সেই সম্মান বহাল রয়ে গেছে... । কি মহাত্মা শেক্সপিয়র, আমি কি ভুল বললাম?

শেক্সপিয়র : কী বলতে চাও তুমি?

কবি : আপনি সবই জানেন এবং বোঝেন। তারপরও আবার অহেতুক প্রশ্ন করছেন কেন?

শেক্সপিয়র : তোমার হেঁয়ালিভরা কথায় আমি সত্যি খুব অবাক হচ্ছি।

কবি : আর আমি এতদিন অবাক হয়েছি আপনাদের খেলার প্রতিভায়। হায় ফাদার! হায় শেক্সপিয়র! আপনারা আপনাদের নিজের নিজের সম্মান আর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় একটার পর একটা মানুষকে হত্যা-আত্মহত্যায় প্রণোদিত করেছেন... ধিক শত ধিক আপনাদের মাহাত্ম্যে...

শেক্সপিয়র : যুক্তি ব্যতীত ধিক্কার দিতে পারে কেবল উন্মাদ আর কাপুরুষেরা।

কবি : ঠিক আছে, তাহলে আমি যুক্তিতেই ফিরে যাচ্ছি। বলুন, প্রেম-জুটি রোমিও-জুলিয়েটকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন কে?

শেক্সপিয়র : কেন? ফাদার ফ্রায়ার।

কবি : ফাদার ফ্রায়ার, কথাটা কি ঠিক? বলুন ঠিক তো?

ফাদার : হ্যাঁ ঠিক।

কবি : এবার বলুন, বিবাহ-টা কি প্রকাশ্যে ঘটিয়েছিলেন, না-কি গোপনে?

ফাদার : গোপনে।

কবি : এই গোপন কথাটি আপনি কি কখনো কোথাও প্রকাশ্য করেছিলেন?

ফাদার : এই সব পুরনো প্রসঙ্গ নতুন করে সামনে আনার কারণ?

কবি : নিশ্চয় কারণ আছে। ফাদার, ওদের গোপন বিবাহের কথা দুই পরিবারের কাউকে কখনো জানিয়েছিলেন? বলো জুলিয়েট, বলো রোমিও, তোমাদের পরিবারের কাউকে কখনো তোমাদের বিবাহের ব্যাপারটা উনি জানাতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন? বলো?

ফাদার : আবার পুরনো প্রসঙ্গ! মহাত্মা কবি শেক্সপিয়র, আপনি ওকে নিবৃত্ত করুন।

কবি : আমার এতদিনের জমানো কথাগুলো বলতে দিন।

শেক্সপিয়র : বুঝেছি– তুমি তোমার কথা বলার জন্য জুলিয়েটের নাম করে আমাদেরকে এখানে ডেকে এনেছো।

কবি : ব্যাপারটা, উভয়পাক্ষিক।

শেক্সপিয়র : মানে?

কবি : আমার যেমন দরকার তেমনই দরকার রোমিও-জুলিয়েটের।

শেক্সপিয়র : কিন্তু ওরা তো কোনো কথা বলছে না। যা শুনছি... সবই তো তুমি বলছো।

কবি : আমার বলার ভেতর দিয়ে ওরা ওদের জীবনের সত্যটা জানতে পারবে।

শেক্সপিয়র : ঠিক আছে বলো তাহলে।

কবি : ধন্যবাদ। ফাদার ফ্রায়ার, আপনার প্রতি আমার কথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

ফাদার : ভণিতা না করে যা বলবে বলো।

কবি : ফাদার, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে, – রোমিও নির্বাসনে যাবার পর যখন জুলিয়েটের সাথে প্যারিসের বিবাহ স্থির হয় এবং সে বিবাহ পড়িয়ে দেবার দায়িত্ব বর্তায় আপনারই হাতে– তখনও কি আপনি রোমিও-জুলিয়েটের গোপন বিবাহের কথা প্রকাশ করে দিতে পারতেন না?

ফাদার : তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

কবি : এমন কথা আপনার মুখে আগেও শুনেছি। কিন্তু এখন যে আপনাকে বলতেই হবে। ওই যে আপনার জুলিয়েট, রোমিও আপনার উত্তর শোনার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ফাদার : না আমি বলবো না।

কবি : তাহলে মহাত্মা শেক্সপিয়র! আপনি বলুন?

শেক্সপিয়র : তোমার আজকের উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

কবি : তাহলে আমি... আপনাদের বুঝিয়ে দেবার সাহস করতে পারি? নাকি বলেন?

ফাদার : স্যার, আপনি ওকে কিছু বলুন স্যার।

শেক্সপিয়র : তাতে কোনো লাভ হবে না।

কবি : ফাদার ফ্রায়ার, আপনি সামাজিকভাবে ক্ষমতাবান দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের মাঝে একটি গোপন মধুর বিবাহ ঘটিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সামাজিকভাবে তাকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করবার সাহস পান নি। কারণ, গোপনে একটি বিবাহ সংঘটনে অপরাধে আপনাকে সামাজিক মানুষগুলো আদর্শচ্যুত বলে শনাক্ত করত আর সেই সে অপরাধে আপনাকে ফাদারের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হতো... বলুন, আমার কথা কি মিথ্যা? বলুন শেক্সপিয়র?

শেক্সপিয়র : সরি। আমি তোমার যুক্তির সবটুকু মানতে পারছি না।

কবি : তাহলে আরও ভেঙে বলি। আর, এইবার কিন্তু আপনিও পার পাবেন না।

শেক্সপিয়র : মানে? কী বলতে চাও?

কবি : আমি জানি– আপনি মহৎ লেখক। আর মহৎ লেখক-কবিরা যে সামাজিকভাবে সম্মানিত পদের সমালোচনায় একটা আবরণ-আবহ তৈরি করেন– সে কথাও জানি। জানি, মহৎ লেখক-কবিরা আবরণ-আবহ তৈরি করা সমালোচনার ভিতর দিয়ে আপাতত দৃষ্টিতে সম্মানিত ব্যক্তিটির তেমন কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে না, কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখলে আসল ব্যাপারটি বেরিয়ে পড়ে। আপনি ফাদার ফ্রায়ারের ক্ষেত্রে তা-ই করেছেন। তাই না?

শেক্সপিয়র : কেমন?

কবি : যেমন– আপনিই ফাদার ফ্রায়ারের হাত দিয়ে এক দুঃসাধ্য প্রেমের পরিণয় ঘটিয়েছিলেন– খুব গোপনে। তখন ফাদারকে এবং আপনাকে কি মহৎ-ই না মনে হয়েছিল! কেননা, আপনারা তখন প্রতি মুহূর্তে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত দুইটি পরিবারের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ঠিক না?

শেক্সপিয়র : হ্যাঁ ঠিক।

কবি : কিন্তু, তারপর?

শেক্সপিয়র : তারপর যা ঘটেছে ট্র্যাজেডির নিয়মমাফিক ঘটেছে, তা নিয়ে তুমি প্রশ্ন করতে পারো না।

কবি : আমার প্রশ্নে এত ভয় কেন? শুনেছি– সত্য প্রকাশে মহাত্মারা কখনো ভীত হন না।

শেক্সপিয়র : সব কথাকে এমন বাঁকাভাবে নিস কেন? সোজাভাবে নিতে পারিস না?

কবি : বাঁকা পথটা কিন্তু আপনার– সোজা পথটা আমার।

ফাদার : স্যার, ওকে আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

কবি : ফাদার, আমি জানি, যে-জন অপরাধীর অপরাধগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে পারে সৎ সাহসে তাকে আর যাইহোক অপরাধীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

শেক্সপিয়র : বল, তোমার যা কথা আছে বল।

কবি : ফাদার ফ্রায়ার, আমি আবার বলছি, বলুন– যখন রোমিওর বিবাহ করা স্ত্রী জুলিয়েটের সাথে প্যারিসের বিবাহ সংঘটনের দায়িত্ব পড়ে আপনার হাতে– তখন আপনি জুলিয়েট পরিবারের কারো কাছে, এমনকি প্যারিসের কাছেও কেন রোমিও-জুলিয়েটের গোপন বিবাহের কথা প্রকাশ করলেন না? তার বদলে আপনি খুব গোপনে চেতনা নাশক মদিরা বলে জুলিয়েটের হাতে কেন মরণ-বিষ তুলে দিয়েছিলেন বলবো?

ফাদার : ওটা মরণ-বিষ ছিল না, ওটা মদিরাই ছিল।

কবি : মিথ্যে কথা। ওটা মদিরা ছিল না ওটা মরণ-বিষ-ই ছিল। তা না হলে, কেন আপনি ইঙ্গিতে জুলিয়েটকে মৃত্যুর সঙ্গে মিতালীর করবার কথা বলেছিলেন?

ফাদার : কারণ, ওটা একটা মৃত্যুর মতো ব্যাপার ছিল।

কবি : মৃত্যু মতো নয়, ওটা মৃত্যুই ছিল। আপনি জুলিয়েটকে বলেছিলেন– চার্চ থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবা-মাকে প্যারিসের সাথে বিবাহের ব্যাপারে সম্মতি জানানোর কথা। তারপর রাতে একা ঘরে শুয়ে আপনার দেওয়া মদিরার নামে মরণ-বিষ পান করতে বলেছিলেন। কিন্তু কেন বলেছিলেন?

ফাদার : এই সব খামাখা প্রশ্নের কোনো অর্থ হয় না।

কবি : অর্থ হয় ফাদার, হয়। আমি বলছি হয়। আর এই অর্থ প্রকাশ করতেই তো আপনাদেরকে আজ রোমিও-জুলিয়েটের সামনে ডেকে এনেছি।

ফাদার : তার মানে জুলিয়েট, তুমি আমাকে নিজে থেকে ডাকো নি? এই দুষ্ট লোকটার কথা প্ররোচিত হয়ে এখানে ডেকে এনেছো!

কবি : হ্যাঁ ঠিক তাই। কিন্তু এখন আর আমার সামনে আপনার কিছুই করার নেই।

ফাদার : স্যার, আর কত সহ্য করবেন?

শেক্সপিয়র : থামো তুমি।

কবি : ধন্যবাদ। আজ আমার কথা শুনুন।

শেক্সপিয়র : বলো।

কবি : ফাদার ফ্রায়ার, আপনিও শুনুন।

ফাদার : স্যার!

শেক্সপিয়র : ওকে বলতে দাও।

কবি : রোমিও তুমিও শোনো– কেন ওই ফাদার ফ্রায়ার তোমাদের গোপন বিবাহের কথা প্রকাশ না করে দিয়ে জুলিয়েটকে মরণ-বিষ পানে বাধ্য করেছিলেন? সেই কথাটি শোনো।

আসলে কী জানো রোমিও, তোমার অবর্তমানে জুলিয়েটকে মেরে ফেলাটা ফাদারের জন্যে খুব জরুরি ছিল।

কারণ, উনার সন্দেহ হয়েছিল– জুলিয়েট বেঁচে থাকলে এক সময় প্যারিসের সাথে বিবাহের বিরোধ করে সে তোমাদের বিবাহের কথা প্রকাশ করে দিতে পারে। আর তাই তাই যদি ঘটত তাহলে তো উনাকে তোমাদের বিবাহের মতো গোপন কর্ম সম্পাদনের অপরাধে ফাদারের পোশাক খুলে গির্জা থেকে ফকিরের মতো বেরিয়ে যেতে হতো। হতো না ফাদার? হতো– অবশ্যই হতো।

আর মহাত্মা শেক্সপিয়র, আপনি ওই ফাদারের সম্মানরক্ষার্থে অদ্ভুত এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন– ফাদারের দেওয়া মদিরার নামে মরণ-বিষ পানে মৃত জুলিয়েটকে

বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পর কবর থেকে পুনরায় বাঁচিয়ে তুলেছিলেন এবং দেখালেন অদ্ভুত এক খেলার প্রতিভা। কেননা, এর আগেই জুলিয়েটের কবরের উপর রোমিওকে এনে– আপনি, মহাত্মা শেক্সপিয়র, সেই রোমিওকে মৃত জুলিয়েট দর্শনে বিষপানে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছিলেন। হায় কি অদ্ভুত আপনার খেলার প্রতিভা! না হলে– কেন রোমিও আত্মহত্যা করতেই জুলিয়েট কবর থেকে জেগে ওঠে– আর জেগে ওঠা জুলিয়েট মৃত রোমিওকে দেখে রোমিওর সঙ্গে আনা ভোতা ছুরিকা হাতে তুলে নিয়ে আপনার বক্ষে বিঁধে আত্মহত্যা করে। বলুন– এই সব হত্যার সবই কী আত্মহত্যা!... চুপ করে আছেন কেন? বলুন?

রোমিও, জুলিয়েট, তোমাদের নাটকীয় জীবনের সবটুকু সত্য জানলে তো?

জুলিয়েট : জেনেছি, আমি সব জেনেছি।

রোমিও : আমিও জেনেছি।

কবি : এখন বলো, এদের প্রতি তোমাদের ঘৃণা হয় না?

জুলিয়েট : আমার আজ খুব কষ্ট হচ্ছে। আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি– কেবল সরল বিশ্বাসে কারণে কোনো রকম বিবেচনা না-করেই আমি ফাদার ফ্রায়ারের সব কথা মেনে নিয়ে নিজের জীবনের ওপর কী অবিচারই না করেছি।

রোমিও : ভাবতে পারছি না– যে ফাদার তোমাদের দুটি হাতকে এক করেছিলেন সে ফাদারই আমাদের মিলনকে চিরদিনের জন্য অসম্ভব করে দিলেন কীভাবে!

কবি : আমার কথা শেষ... আমি যাচ্ছি।

জুলিয়েট : না যাবেন না। দাঁড়ান একটু।

কবি : কেন জুলিয়েট?

জুলিয়েট : আমাদেরকে কি আপনার সঙ্গে নেবেন?

কবি : কেন!

জুলিয়েট : আপনি আমাদের জীবনকে নতুনভাবে চিনিয়েছেন– আমরা এখন থেকে শেক্সপিয়রের ভুবন থেকে অন্তর্হিত হয়ে থাকতে চাই। আমরা আজ থেকে আপনার কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা চাই। বলুন, আপনি রাখবেন আমাদের আপনার সত্যনিষ্ঠ উদার ভুবনে?

কবি : কেন নয়, জুলিয়েট? অবশ্যই। তোমাদের জীবনের নতুন অর্থ যখন আমার কাছ থেকে পেয়েছো তখন তো তোমাদের আমার ভুবনেই থাকার কথা।

জুলিয়েট : আমরা থাকছি।

কবি : রোমিও তোমার কী মত?

রোমিও : আমি জুলিয়েটের সঙ্গে এক মত– আমরা আপনার সঙ্গেই থাকছি।

কবি : ঠিক আছে থাকো আমার সঙ্গে। তার আগে আরেকটা প্রশ্ন। এই যে মহাত্মা শেক্সপিয়র, আপনার কাছে আমার সর্বশেষ প্রশ্ন... ।

শেক্সপিয়র : বলো।

কবি : আপনি কী স্বীকার করেন, ট্র্যাজেডির নামে আপনি শুধু শুধু মহৎ প্রেমের হত্যা-আত্মহত্যার প্রহসন রচনা করেছেন? বলুন, এ কথা কী আপনি স্বীকার করেন? বলুন? কথা বলছেন না কেন? তার মানে আমার কথাটা স্বীকার করে নিলেন? ধন্যবাদ। আমি এখনই চলে যাচ্ছি... আপনাদেরকে বিরক্ত করতে আর কোনোদিন ডেকে আনবো না। আপনাদের মঙ্গল হোক।

জুলিয়েট ও রোমিওকে সঙ্গে নিয়ে নতুনকালের কবি গ্রেভইয়ার্ডের বাইরে চলে যান। শেক্সপিয়র ও ফাদার ফ্রায়ার কিছুক্ষণ থম ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর এক চিলতে নীরবতা ভেঙে ফাদার ফ্রায়ার এক সময় বলেন–

ফাদার : মহাত্মা শেক্সপিয়র, আপনি কি খুব বেশি আহত হয়েছেন?

শেক্সপিয়র : না। আমি অন্যকথা ভাবছি–

ফাদার : কি ভাবছেন?

শেক্সপিয়র : সারা পৃথিবীব্যাপী প্রায় চার শ বছর ধরে 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' পাঠ এবং মঞ্চায়নের পরও যে-সত্য কেউ আবিষ্কার করতে পারল না। তা এক্ষণে প্রকাশ পেয়ে গেল! কিন্তু, এই সত্যটা শেষপর্যন্ত যে এইভাবে প্রকাশ পাবে– তা আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি!

ফাদার : এ কী বলছেন!

শেক্সপিয়র : সত্যি বলছি ফাদার, আমার রোমিও-জুলিয়েটের জন্যে এই দুই চোখ বেয়ে জল নেমে আসছে। আজ অনুভব করছি– ওদের প্রেমে আমি অবিচার করেছি।

ফাদার : মহাত্মা শেক্সপিয়র!

শেক্সপিয়র : আজ আমার নিজেকেই এক ট্র্যাজেডির নায়ক বলে মনে হচ্ছে। আমার শ্রেষ্ঠতম ট্র্যাজেডি 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটে'র গূঢ়সত্য প্রকাশমাত্র ওই ট্র্যাজেডির সব উপাদান ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে– ফাদার। আজ আমি যেন বসে আছি– আমার ট্র্যাজেডি ভূখণ্ডের বিধ্বস্ত এক ধ্বংসস্তূপের মাঝে।...

শেক্সপিয়রের কথার মধ্যে আকস্মিকভাবে নতুনকালের কবি চলে আসেন এবং উচ্ছ্বাসের সাথে বলেন–

কবি : আমাদের প্রিয় কবি, আপনি সত্যি মহৎ... মহৎ না হলে কী আপনি আপনার কৃতকৌশলকে কোনোদিনই স্বীকার করতেন না। আজ এই নববিধান রচনার কালে আপনি আপনার সৃজনকৌশলকে স্বীকার করেছেন বলে– সত্যিকার অর্থেই চিরদিন এই জগৎ-সংসারের মানুষের নতুন নতুন মানুষের কাছে মহান এবং মহাত্মা হয়ে রইবেন।

এপর্যায়ে নতুনকালের কবি পেছন ফিরে কথা বলতে থাকলে শেক্সপিয়রকে একা রেখে ফাদার ফায়ার লরেঞ্জ তার অগোচরে অদৃশ্য হয়ে যান। কবি এসে শেক্সপিয়রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন–

ধন্যবাদ আপনাকে। আজকের এই নতুন আত্মবোধনের তরে আসুন আপনার পা ছুঁয়ে প্রাচ্যের আদর্শে একটা প্রণাম করি।

প্রণাম করে মুখ তুলে শেক্সপিয়রকে একবার চোখ মেলে দেখতে চান। কিন্তু না নতুনকালের কবি তার চোখে আর শেক্সপিয়রকে ভাস্বর দেখতে পান না। তিনি শেক্সপিয়রকে না দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে বলেন–

আরে কোথায় গেলেন আপনি। আমাকে একবার আপনি ভালো করে চোখে দেখার সুযোগ দেবেন না। ... না, এটা হতে পারে না... নিশ্চয় আপনি গ্রেভইয়ার্ডের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছেন।

নতুনকালের কবি আকস্মিকভাবে যেন চেতনা ফিরে পেয়ে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়েন এবং এক নাগাড়ে বলতে থাকেন–

হা হা হা... কোথায় আর লুকাবেন?... হা হা হা... নিশ্চয় আপনি আবার এই গ্রেভইয়ার্ডের ঘাস-লতা-পাতায় কিংবা এই মাটিতে মিশে গিয়েছেন। হা হা হা হা হা হা... ।

তবু ভালো, আজ আমি আমার চেতনার রঙে মেলাতে পেরেছি আপনার প্রিয় ট্র্যাজেডির গূঢ়সত্য... হা হা হা... আজ আমিও নিশ্চিন্তে এই গ্রেভইয়ার্ডের ঘাস-লতা-পাতায় কিংবা মাটিতে মিশে গিয়েও আনন্দ পাবো। হা হা হা।

রচনাকাল : ২০০৫-০৭ খ্রিষ্টাব্দ

ফ্রানৎস কাফ্‌কা'র *মেটামরফোসিস* গল্পের ভাবসার থেকে উৎসারিত নাটক

বিদগ্ধ ডানার প্রজাপতি

প্রসঙ্গকথা

সন্দেহ নেই যে, ফ্রানৎস কাফ্‌কা'র সাহিত্যকীর্তি মধ্যে মধ্যে *মেটামরফোসিস* সর্বাধিক পঠিত আখ্যান। এই আখ্যানের বর্ণিত হয়েছে জীবনসংগ্রামে পরাজিত এক তরুণ গ্রেগর সামসা'র তেলাপোকা হয়ে যাবার কাহিনী। কাফ্‌কার বর্ণনাভঙ্গির গুণে তা এতটাই বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে যে পাঠকের মনে হয়, তরুণ গ্রেগর সামসা সত্যি সত্যি ঘৃণ্য প্রাণী সামান্য একটি তেলাপোকাতে পরিণত হয়েছে। এমনই একটি সত্যির কাছে মাথানত করে পাঠকেরাও যেন ভুলে যান মহৎ শিল্পের অন্তত দুটি অর্থ থাকে– একটি তার কাঠামোগত অর্থ, আরেকটি ভাবার্থ। এই দুটি অর্থের মধ্যে কাঠামোগত অর্থ বোঝা সহজ হলেও ভাবার্থ অনুভব করা অনেকক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়াশসাধ্যও হয়ে পড়ে বৈকি। কিন্তু শিল্পকীর্তির আসল অর্থ লুকানো থাকে তার ভাবার্থে। যেমন, লালন সাঁইজির একটি গান আছে– 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।' এই গানের কথাটির কাঠামোগত অর্থ হিসেবে একটি খাঁচা এবং পাখির কথা খুব সহজে মনে আসা স্বাভাবিক, কিন্তু কথাটির ভাবার্থ অনুধাবনের জন্যে বেশ গভীরে ডুব দিতে হয়। ফ্রানৎস কাফ্‌কার *মেটামরফোসিস* পাঠ করে আমরা প্রায় ক্ষেত্রেই লালনের ওই গানটির মতো কাঠামোগত অর্থ করে থাকি, কিন্তু ওই আখ্যানের অন্তর্গত অর্থ তো ভিন্ন কথা বলে, আর সেই অন্তর্গত অর্থকেই প্রকাশ করার তাগিদে রচিত হয়েছে *বিদগ্ধ ডানার প্রজাপতি।* এর মূলমন্ত্র স্বপ্ন থাকলে মানুষ প্রজাপতির মতো বর্ণিল ডানা অনুভব করে তার পিঠের উপর, আর স্বপ্ন হারিয়ে গেলে সে ডানার রঙগুলো সব বিবর্ণ হয়ে যায়, হয়ে যায় বিবর্ণ তেলাপোকার ডানা।

বিদগ্ধ ডানার প্রজাপতি নাটকটি 'মেটামরফোসিস' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার নির্দেশনা পরীক্ষার প্রযোজনা হিসেবে মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম-এর নির্দেশনায় ১৮ আগস্ট ২০০৮ তারিখে নাটমণ্ডলে মঞ্চস্থ হয়েছে।

নাটক সূচনার ভাবসঙ্গীত

সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্ম হয়নি আমার
আমি তাই স্বপ্ন দেখেছি
একটি জীবনের
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের...
আমার স্বপ্ন ছিল
আমার বোন হবে সঙ্গীতের সুর
গানে গানে করবে সে ভুবন মধুর॥
আমার স্বপ্ন ছিল
ঋণগ্রস্ত পিতা-মাতার সব দেনা-দায়
পরিশোধ করবো আমি সবই নিশ্চয়॥
আহা আহা! সেইদিন আনন্দে ভেসে যাবে
আমার পৃথিবী। আহা আহা!

নাটক শুরু

আমিই গ্রেগর সামসা। আমি কোনো রূপকথার চরিত্র নই। চলমান বাস্তব জীবনের একজন অতি সাধারণ চরিত্র। প্রায় এক শ বছর আগে মহাত্মা ফ্রানৎস কাফ্‌কা এই আমার আত্মচরিত লিখেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় তামাম পৃথিবীর সুশিক্ষিত গল্পরসিক মানুষ আমাকে একটি রূপান্তিত তেলাপোকা ভেবে নিয়েছিলেন। মহাত্মা কাফ্‌কা'র বিশ্বস্ত বর্ণনায় সকলে এতো বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, বাস্তবতায় পোড় খাওয়া আমার জীবনচরিতের চেয়ে মহাত্মা কাফ্‌কা'কেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। কাফ্‌কা'র সেই শ্রেষ্ঠত্বের মহিমার নিচে আমার জীবন-যন্ত্রণার আসল কাহিনী এখনও অনেকের অগোচরে থেকে গেছে, থেকে যায়। তাই আজ আমার এই সশরীরে আবির্ভাব।

আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমার বোন হবে সঙ্গীতের সুর... আহা কত সুমধুর কণ্ঠেই না আমার বোনটি গান গাইতো আর আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম... কখনো কখনো ওর গানের সঙ্গে আমি একটি রঙে রঙিন প্রজাপতির মতো নেচে উঠতাম... বোনটি গাইতো...

প্রজাপতি! প্রজাপতি!
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা
টুকটুকে লাল্-নীল্ ঝিলি-মিলি আঁকা বাঁকা॥
তুমি টুলটুলে বন-ফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও
ওই পাখা দাও সোনালি-রূপালি পরাগ মাখা॥
: ওই স্বপ্নের পাখা আমি তোকে দেবোই দেবো।

: দেবে তো?
: দেবো। দেবো।
: তাহলে আরেকটু শোনো...

মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি! তুমি নিয়ে যাও সাথী ক'রে
তোমার সাথে।
তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও
আর তোমার মতো মোরে আনন্দ দাও
এই জামা ভালো লাগে না
দাও জামা ছবি-আঁকা॥

ছোট্ট বোনটির এমনই গানের মধ্যে একসময় সত্যি সত্যি একটি প্রজাপতি হয়ে উঠতাম। আর ওর চোখে আমার প্রজাপতি রঙিন পাখার মতো স্বপ্ন ধরিয়ে দিতাম।

ওর গানে মনটা আমার স্বপ্ন-আনন্দে নেচে উঠতো। আমি তাই ঘুরে ফিরে ওকে উৎসাহ দিতে থাকতাম–'গা গ্রেটা গা, আরেকটু গা... আরেকটা গান গা।' আমার উৎসাহ-ধ্বনির মধ্যে গ্রেটা আরও বেশ খানিকটা গান গেয়ে উঠতো। গান শেষ হলে আমি ওর মনচোখে স্বপ্নের বীজ বুনে দিয়ে বলতাম–

: গ্রেটা, আজ তুই খুব সুন্দর গেয়েছিস।
: ভাইয়া!
: তোর গানের ভেতর দিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি...
: স্বপ্ন!
: হ্যাঁ স্বপ্ন। সে এক মস্ত বড় স্বপ্ন। তোকে আমি অনেক বড় শিল্পী করে তুলবো।
: ভাইয়া!
: দেশের সব থেকে বড় সংগীত নিকেতন কনসার্ভেটোরিয়ামে তোকে সংগীত শিখতে পাঠাবো।
: কনসার্ভেটোরিয়ামে!
: কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?
: ওখানে কেমন করে যাবো ভাইয়া! ওখানে ভর্তি হতে তো অনেক টাকা লাগে!
: টাকার কথা তোকে ভাবতে হবে না। টাকা আমি জোগাড় করবো। তুই শুধু তোর গানের কথা ভাব।
: ভাইয়া!
: কি রে গ্রেটা, পারবি না তুই অনেক বড় শিল্পী হ'তে?

: তোমার মতো ভাই আমার পাশে থাকলে– আমি সব পারবো ।

: গ্রেটা!

: হ্যাঁ, ভাইয়া হ্যাঁ!

: গ্রেটা রে, তোকে একটা অনুরোধ করি?

: অনুরোধ নয়, আদেশ করো ।

: আমার এই মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে... ওই গানটা আরেকটুখানি গেয়ে শোনা– ‘প্রজাপতি প্রজাপতি...

: কোথায় পেলে ভাই এমনও রঙিন পাখা ।

আমাদের দুই ভাই-বোনের এই আনন্দমুখর গানের মধ্যে গ্রেটার বাজানো বেহালা হাতে বাবা এগিয়ে আসেন । তার এই আগমনে আমি ভাবি, গ্রেটার গানটিই তাকে ওই ঘর থেকে এই ঘরে টেনে এনেছে । আমার মতো গ্রেটাও সম্ভবত একই কথা ভাবে । তাই সে নতুন করে বাবাকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে গানটি গাইতে শুরু করে– ‘প্রজাপতি প্রজাপতি... ।’

: আহ্ । না ।

বাবার এই আকস্মিক চিৎকারে গ্রেটার গান থেমে যায় । সে বাবার মুখের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করে–

: কী হলো বাবা!

গ্রেটার এই প্রশ্নের মধ্যে বাবা সঙ্গে আনা বেহালাটা দেখিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় অস্পষ্টভাবে বলেন–

: এই বেহালাটা নিয়ে...

: বেহালা নিয়ে... কী বাবা?

: বাবা বাবা, গ্রেটাকে তুমি কী বেহালাটা বাজাতে বলছো?

: তাই না-কি বাবা?

: গ্রেটা, নে না... বাবাকে একটু বেহালা বাজিয়ে শোনা...

: দাও বাবা দাও, বেহালাটা আমার হাতে দাও...

গ্রেটা বেহালাটা নিতে গেলে বাবা এক ধাক্কায় তাকে দূরে ফেলে দেন এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলেন–

: না, এই বেহালা তোকে আর বাজাতে হবে না ।

: বাবা!

: কেন বাবা? কেন?

: গ্রেগর, গতকাল ওরা আবার এসেছিল...

: বুঝেছি, ওরা আবার তোমার ওপর চাপ দিয়ে গেছে ।

: গ্রেগর!

: বাবা ।

: এখন আমার কোনো ব্যবসা নেই... তবু পুরনো ব্যবসার ঋণের ভার প্রতিদিন আমাকে ছোট করে দিচ্ছে...

: বাবা!

: আমি চাই...

: বাবা ।

: এই বেহালাটা বিক্রি করে কিছুটা ঋণ শোধ দিয়ে আয়...

: বাবা!

: না বাবা, এ হতে পারে না... আমি এ হতে দিবো না... এই বেহালা বাজিয়ে গ্রেটা সুরে দীক্ষা লাভ করেছে... আমি স্বপ্ন দেখি এই বেহালা বাজিয়ে গ্রেটা আমাদের অনেক বড় শিল্পী হবে... অনেক বড় ।

: গ্রেগর!

: হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ আমি ওকে সেভাবেই দেখতে চাই ।

: কিন্তু তোকে আমি স্পষ্টভাবে বলছি... শোন, ঋণের ভার নিয়ে আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারছি না, এমন একদিন আসবে সেদিন তোরাও শান্তিতে থাকতে পারবি না, পারবি না... সংগীতের স্বপ্ন, শিল্পী হবার স্বপ্ন সে তো আরও বহু দূর ।

: বাবা!

: গ্রেগর!

: বাবা, আমি যদি তোমার ঋণ শোধ দিতে ওদের ওই কোম্পানিতে চাকরি নিই... তাহলে কেমন হয়!

: গ্রেগর!

: হ্যাঁ বাবা, আমি চাকরি নেবো... তবু আমি ওকে সংগীত শিল্পী করবো ।

: কিন্তু এতো কম শিক্ষায় ওই কোম্পানিতে কী চাকরি করবি তুই! বড়জোর একটা ছোট্ট কেরানি হতে পারবি । তাতে তো সারা জীবনেও তুই আমার ঋণের ভার পরিশোধ করতে পারবি না!

: না বাবা, কেরানি নয় । আমি হবো কোম্পানির বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ ।

: বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ! সে তো অনেক খাটুনির কাজ রে ।

: এছাড়া আর উপায় কি বাবা! কেরানি হবার চেয়ে বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়া অনেক লাভজনক । আর একমাত্র এই চাকরি করা ছাড়া আমি কিছুতেই তোমার দেনা-দায় শোধ করতে পারবো না ।

: গ্রেগর! এ কী বলছিস তুই ।

: আমি ঠিকই বলছি বাবা... একথা আমি তোমার ওই কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি ।

: গ্রেগর!

: বাবা।

: তুই তাহলে চাকরির জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিস!

: কেন নয় বাবা, আমি তো সুন্দর স্বপ্ন দেখতে জানি। আর আমি তোমাদের কাউকে দুঃস্বপ্নের ভেতর রাখতে চাই না।

: গ্রেগর!

: হ্যাঁ বাবা, এই মুহূর্তে আমার একমাত্র বাসনা– তোমার ব্যবসায়িক বিপর্যয়ের কথা ভুলিয়ে দেওয়া, সকল ঋণের ভেতর থেকে তোমাকে মুক্ত করে আনা।

: গ্রেগর!

: বাবা, তাই তো আমি ওই কোম্পানির বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে প্রস্তুত।

: কিন্তু এতো পরিশ্রমের কাজ তুই কেমন করে করবি!

: আমি পারবো বাবা, পারবো, তোমাদের জন্যে আমি সব কিছু করতে পারবো।

: গ্রেগর!

: বাবা, গ্রেটাকে তুমি কখনো গান গাইতে বাধা দিও না। আমি চাই আমার এই ছোট্ট বোনটির মিষ্টি সুর আমার সব কাজের প্রেরণা হয়ে থাক। ওর বেহালার সুমধুর তান আমাদের ঘরে ডেকে আনুক অনাবিল সুখ।

: গ্রেটা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বেহালাটা আমার হাত থেকে তোর হাতে তুলে নে...

: দাও বাবা, দাও, আজ ভাইয়ের স্বপ্নঘোরের কথার আবহে আমার ভেতর যে সুর জেগে আসছে সে সুর ছড়াবো আমি সংসারে, ঘরে ঘরে... মা মা, কোথায় তুমি, তোমার ছেলের কথা শোনো... সে প্রজাপতির পাখার মতো স্বপ্নচারী হয়ে উঠেছে। তবে, তা নিছক স্বপ্ন নয়, বাস্তবতার রং মেশানো বাস্তব হয়ে উঠবার এক দুর্নিবার স্বপ্ন। আমার ভাই আজ বলেছে সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য চাকরি করবে। মা মা, শোনো তোমার ছেলের কথা–'প্রজাপতি, প্রজাপতি... ।'

বোন গ্রেটার মায়া ছড়ানো গানের সুরের পিছে পিছে আমার বাবাও সম্ভবত মায়ের খোঁজে আরেকটি ঘরে ঢুকে পড়ে। আর আমি তখন স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রকল্পে নেমে পড়ি। ছুটে যাই বাবার দায়বদ্ধ কোম্পানিতে। নিয়ম অনুসারে সব বাধা পেরিয়ে একসময় কোম্পানির বড়কর্তার মুখোমুখি হই। তিনি যেন কাজে নিমগ্ন এক যন্ত্র-মানব। আমার দিকে তাকানোর সময় হয় না তার। আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বহু চেষ্টায় সামনে গিয়ে বলি–

: স্যার, গুড মর্নিং।

তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন–

: আমার সময় নেই।

: স্যার, আমি আপনাকে সালাম দিয়েছি।

: বললাম তো আমার সময় নেই।

: স্যার, আমি গ্রেগর।

: খুব দরকার থাকলে, জোরে বলো... আমি শুনতে পাচ্ছি না... আমার কাজের অনেক ব্যস্ততা।

: স্যার, আমি গ্রেগর।

: আরে বললাম তো জোরে বলো, জোরে। সাত-সকালে বাড়ি থেকে কি না খেয়ে এসেছো– যে গলায় একটুও জোর নেই।

: স্যার, আমি গ্রেগর।

: যা বলবে জোরে বলবে। না হলে আর শুনবো না... আমার কাজের ক্ষতি আমি মেনে নেবো না... জোরে বলো... না হলে ওই দেখো আমার লোকজন বসে রয়েছে... আমাকে বিরক্ত করলে ওরা তোমাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।

: প্লিজ স্যার, আমার কথাটা শুনুন, আমি তো জোরেই বলছি, কিন্তু আপনি শুনতে পাচ্ছেন না কেন!

: চেহারা তো মাশাল্লা! গলায় জোর নেই কেন! তোমার পরিচয় কি হে বাপু?

: স্যার, আমি গ্রেগর।

: জোরে বলবে।

: আমার বাবার নাম মিস্টার সামসা, আমি এসেছি... ।

: মিস্টার সামসা! এই দাঁড়াও দাঁড়াও কোথায় যেন গোণ্ডগোল আছে ওই লোকটাকে নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে... এই মিস্টার সামসা তোমার কে হয়?

: আমার বাবা।

: জোরে বলো– কে?

: বাবা।

: তুমি মিস্টার সামসার ছেলে?

: জ্বি, হ্যাঁ।

: তোমার বাপ আস্ত একটা কুলঙ্গার... ব্যবসা করতে পারলো না... একটা রানিং বিজনেসকে তোমার বাপ লাটে তুলে আজ দিব্যি ঘরে বসে আছে। শুধু কি তাই, তোমার বাবার মতো যারা আমাদের বিজনেসকেও লাটে তুলতে চায় আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। এতগুলো টাকা সেই কবে থেকে সে পরিশোধ না করে ঘরের মধ্যে ঠ্যাঙ তুলে বসে আছে। আজ নিশ্চয় টাকাগুলো তোমার হাতে দিয়ে পাঠিয়েছে। কই দাও, টাকাগুলো দাও।

: নগদ টাকা আমি আনতে পারি নাই।

: জোরে বলো।

: স্যার, নগদ টাকা তো আনতে পারি নাই।

: তাহলে কেন এসেছো, কেন?

: স্যার, আমি আমার শ্রমের বিনিময়ে বাবার দেনার টাকাগুলো পরিশোধ করতে চাই। দয়া করে আমাকে একটা চাকরি দিন। আমি আমার বাবার সব দেনা শোধ করে দেবো।

: জোরে বলো।

: দয়া করে আমাকে একটা চাকরি দিন। আমি আমার বেতনের টাকা থেকে আমার বাবার সব দেনা পরিশোধ করে দেবো। প্লিজ, আমাকে একটা চাকরি দিন।

: এই বয়সে তুমি আমাদের ফার্মে চাকরি করবে! শোনো বাছা, আমরা কোনো বাচ্চা ছেলেকে চাকরি দিই না।

: স্যার, আমাকে একটা সুযোগ দিন... আমি শরীর দিয়ে আপনাদের ফার্মের জন্য খেটে আমার বাবার সব দেনা পরিশোধ করবো। প্লিজ স্যার, আমাকে একটা চাকরি দিন।

: লেখাপড়া কতদূর? জোরে বলবে।

: বেশি দূর না স্যার, বিকম পাস স্যার।

: তা হলে কি চাকরি করবে?

: স্যার, আমাকে বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি দিন।

: কি চাকরি?

: বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ।

: পারবে? তুমি তো তেমন জোরে কথা বলতেই পারো না, সারা শহরের বাড়ি বাড়ি আর দোকানে দোকানে ছুটে চলার শক্তি কোথায় পাবে?

: স্যার, আমি পারবো।

: পারবে?

: পারবো স্যার।

: এইবার বুঝেছি, তুমি পারবে। কিন্তু ওহে, কাজটা মোটেই সহজ নয়, আমাদের ফার্মের ঘড়ির কাটার প্রতিটা মুহূর্ত কাজের সঙ্গে বাঁধা থাকে। এখানে আলসেমী, অসুস্থতা, ছুটির কোনো সুযোগই নেই। এখন বলো পারবে?

: পারবো স্যার।

: কি পারবে?

: আপনি যা বলবেন তার সবই পারবো।

: জোরে বলো।

: আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই কাজ করবো আমি। স্যার, আমাকে শুধু একবার কাজটা দিয়ে দেখুন... আমি নিশ্চয় পারবো।

: তোমার বিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। তারও অধিক মুগ্ধ করেছে– তোমার দায়িত্ববোধের বিষয়টি। যে ঋণ তোমার বাবা কখনো পরিশোধ করার কথা ভাবে না সেই ঋণ তুমি নিজে থেকে শোধ দিতে চায়ছো দেখে আমি সত্যি সত্যি বিস্মিত হচ্ছি। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা রইলো। এইখানে তোমার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যাও, আগামীকাল থেকে কাজে লেগে যাবে।

: ধন্যবাদ স্যার। *বড়কর্তা এগিয়ে দেওয়া কাগজে আমি নাম-ঠিকানা লিখতে যাই। সহসা বড়কর্তা বলে ওঠেন–*

: মনে রাখবে...

: স্যার!

: প্রতিদিন সাতটা থেকে অফিস, তোমার বাড়ি থেকে ভোর পাঁচটার ট্রেনে ফার্মে আসতে হবে।

: স্যার! *এমন কথা শুনে কাগজে নাম-ঠিকানা লেখা থামিয়ে আমি বিস্ময়ে বড়কর্তার চোখের দিকে তাকাই।*

: কি পারবে না?

: অবশ্যই স্যার, আমি পারবো, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আজ যাই স্যার।

: ওকে, বাই।

আমাকে বিদায় জানিয়ে বড়কর্তা আবার তার কাজে মগ্ন হয়ে যান। আর তার দৃষ্টিসীমার বাইরে এসে চাকরি পাবার আনন্দে আমার এই স্বপ্নরঙিন প্রজাপতিমন আরও বেশি রঙিন হয়ে ওঠে, আরও বেশি প্রজাপতি হয়ে ওঠে।

আমার মন পাগেলা রে
ও তুই রঙিন হইলি কার কারণে॥
চাকরি পেয়ে মনটা আমার কেমন জানি করে
কোথায় যাবো নতুন দিনে তা জানি না ওরে॥
স্বপ্ন চোখে থাকবে কি আর স্বপ্ন জোড়া ভোর
রঙিন মনে থাকবে কি আর আগের স্বপ্ন ঘোর॥
ডাকছে জীবন বাস্তবতায় স্বপ্ন ভেঙে ওরে
জীবন এখন কোনদিকে যায় তা জানি নারে॥

শুরু হলো আমার নতুন জীবন, পুরনো স্বপ্নকে বুকে নিয়ে বাস্তবতার পথ চলা। রাতের সুগভীর শান্তির ঘুম ভেঙে যেতে থাকে ভোর চারটায়।

প্রতিটি দিন ভোর চারটায় একই সঙ্গে কান-ফাটানো ধ্বনিতে চিৎকার দিয়ে ওঠে ঘড়ির অ্যালার্ম এবং মায়ের কণ্ঠস্বর– 'িং িং'; 'গ্রেগর ওঠ... গ্রেগর... ট্রেন ধরতে হবে না?... ওঠ... গ্রেগর কি হলো উঠছিস না কেন? ওঠ গ্রেগর, ওঠ... গ্রেগর।' আমার ঘুম ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনার আগপর্যন্ত মা এক ভাবে চিৎকার করে দরজায় ধাক্কা দিতে

দিতে ডাকতে থাকেন– 'গ্রেগর, কি হলো তোর... এমন মরণ ঘুম কেউ ঘুমায়! ওঠ... গ্রেগর।'

: উঠছি মা।

আমার ঘুম ভাঙার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে মা একসময় থেমে যান, আর ঠিক তার পর পরই ছোট বোন গ্রেটা এসে দরজার ওপাশে দাঁড়ায়। সে আমার গায়ে শিরশির লাগা ধ্বনি তুলে ফিসফিস করে বলতে থাকে– 'ভাইয়া দরজা খোলো... তোমার নাস্তা তৈরি হয়ে গেছে... নাস্তার টেবিলে এসো ভাইয়া... আর দেরি করো না... দরজা খোলো... আরেকটু দেরি হলে কিন্তু ট্রেন ফেল করবে... ভাইয়া ওঠো, ওঠো না।' এত সব ডাক-ধ্বনিতে আমার সকালটা খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমি আর বিছানায় স্থির থাকতে পারি না। উঠে পড়ি। দরজা খুলে ফ্রেস হয়ে নাস্তার টেবিলের সামনে বসি। কিন্তু হায়, বসতে না বসতেই স্টেশন থেকে ট্রেন আসার ঘণ্টাধ্বনি কানে ভেসে আসে। আর মাত্র কয়েক মিনিট পর ট্রেন স্টেশনে চলে আসবে। এখনই ছুটে যেতে হবে। না হলে নির্ঘাত ট্রেন ফেল করতে হবে। চাকরিটা তা হলে হারাতে হবে। না, তা হতে দেওয়া যায় না। তাই আমার নাস্তা খাওয়া হয় না, তার বদলে ছুটে যেতে হয় স্টেশনের দিকে–

: মা আমি গেলাম।

: নাস্তা করলি না!

: ভাইয়া, একটুখানি মুখে দিয়ে যাও।

: সময় কোথায়!

: ভাইয়া!

: তোর কানটা কি কালা হয়ে গেছে... শুনতে পাচ্ছিস না ট্রেন আসার ঘণ্টাধ্বনি বাজছে... আমি গেলাম।

: গ্রেগর!

: আর পিছু ডেকো না মা... আমাকে দুই মিনিটের মধ্যে স্টেশনে পৌছুতে হবে।

: গ্রেগর, খেয়ে গেলি না বাবা!

মায়ের মমতামাখা কণ্ঠ কানে নেবার সময় থাকে না আমার। আমি পড়ি-মরি করে ছুটে চলি সকাল পাঁচটার ট্রেন ধরার জন্য। ঠিক পাঁচটার ট্রেন। ঠিক পাঁচটার ট্রেন।

ঠিক পাঁচটার ট্রেন।
ঠিক পাঁচটার ট্রেন।
ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক...
ঠিক পাঁচটার ট্রেন॥
সময় মেনে ট্রেন আসে
আর দ্রুত গতিতে

স্টেশনকে অতি□ম করে যায়
ঠিক পাঁচটার ট্রেন
ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক...
ঠিক পাঁচটার ট্রেন॥
এই ট্রেন আমাকে নিয়ে যাবে
ঠিক সাতটার আগে
আমার অফিসে
যেখানে ঘড়ির কাটা
কাজের সাথে বাঁধা আছে।
সেখান থেকে কাজের বোঝা নিয়ে
আমাকে ছুটে চলতে হবে
ঘড়ির কাটার মতো।
কেননা, আজ থেকে আমি তাদের
নিজস্ব বাণিজ্যিক প্রতিনিধি।
ঠিক পাঁচটার ট্রেন
ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক...
ঠিক পাঁচটার ট্রেন॥
সকাল পাঁচটার ট্রেনে
এত যাত্রী হতে পারে
আমার ধারণা ছিল না।
এই ট্রেনে আমি আমার
দুই ঘণ্টার যাত্রাপথের
একঘেয়েমি দূর করতে
অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে
আন্তরিক হতে চেষ্টা করি।
ঠিক পাঁচটার ট্রেন
ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক...
ঠিক পাঁচটার ট্রেন॥

আমি আমার পাশে দাঁড়ানো/বসা যাত্রীর সাথে একসময় কথা বলে উঠি–

: এক্সকিউজ মি, আপনার নাম?

: কেন? নাম শুনে কাম কি?

: না মানে আপনার সাথে একটু পরিচিত হতাম আর কি।

: আমার ইচ্ছে নেই।

: কেন ভাই! আমার অপরাধ!

: দেখুন ভাই, আমাকে একটু চুপচাপ থাকতে দিন... রাতে ভালো ঘুম হয় নি... আমি একটু ঝিমুবো।

: সরি ভাই, সরি।

প্রথম যাত্রীটার এই ব্যবহার আমাকে তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। এ সময় ট্রেনের কামরায় হঠাৎ একটি বিষণ্ন তরুণীকে দেখতে পাই। আমার মন বলে– সে যেই হোক, সে তো সুন্দরী বটে, তবে সে কেন বিষণ্ন থাকবে। মনে মনে আরও বলি– সুন্দরীদের জন্য বিষণ্নতা নয়, সুন্দরীরা সব সময় থাকবে উচ্ছল। এই ভাবনার ভেতর মনে অনেক সাহস এনে তরুণীটির কাছে গিয়ে বসি। তারপর অতি সতর্কতায়, সে যেন কোনোভাবেই বিরক্ত না হয় এরকম ভঙ্গিতে তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করি–

: ম্যাডাম, আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?

: জ্বি, কোনো সমস্যা?

: না ম্যাডাম, আমার কোনো সমস্যা নয়। আপনাকে দেখে মনে হলো...

: কি মনে হলো... বলুন।

: কিভাবে যে বলি...

: এত ভণিতা করছেন কেন! ভণিতা আমার ভালো লাগে না।

: তাহলে বলেই ফেলি।

: বলুন।

: আপনার মনটা একটু খারাপ ম্যাডাম?

: কই না তো। এ কথা বলছেন কেন?

: না মানে, আপনাকে দেখে কেমন জানি বিষণ্ন লাগছিল তো... তাই।

: না ব্রাদার, আমি মোটেও বিষণ্ন নই, আসলে কি জানেন– আমার একটা অভ্যাস আছে... প্রতিদিন ট্রেনে উঠে আমি মনে মনে সারাদিনের কর্মপরিকল্পনা মিলিয়ে দেখি। কিছুক্ষণ আগে সেই কাজটিই করছিলাম। কিন্তু তা দেখে আপনি আমাকে বিষণ্ন ভাবলেন কেন... সে কথাটি আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।

: আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

: প্লিজ।

: আপনি তো জানেনই আপনি সুন্দরী। আর সুন্দরীদের গোমড়া মুখ আমি একদম সহ্য করতে পারি না। সুন্দরীরা থাকবে উচ্ছল... তাদের জন্য বিষণ্নতা নয়... তারা শুধু হাসবে, আনন্দে থাকবে...

: ট্রেনটি আমার স্টেশন এসে গেছে... ওকে বাই

: বাই।

ঠিক পাঁচটার ট্রেন

ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক...

ঠিক পাঁচটার ট্রেন॥

একসময় আমিও আমার গন্তব্য স্টেশনে নেমে পড়ি এবং স্টেশন থেকে হেঁটে সাত মিনিটের পথ অতিক্রমে করে ফার্মে পৌঁছাই। সেখানে ঢুকে প্রথমেই বড়কর্তা কাছ থেকে সারাদিনের কাজ বুঝে নিই।

: তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে... আমাদের এই ব্র্যান্ডগুলো এ শহরের এবং দেশের অন্যান্য শহরের দোকানে দোকানে ও বাড়িতে গিয়ে দেখাবে। বুঝিয়ে বলবে আমাদের ব্র্যান্ডের পণ্যের গুণাগুণ এবং আমরা দিচ্ছি প্রতিটি পণ্য ক্রয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি কমিশন। আর যে সব ক্রেতা যত বেশি পণ্যের অর্ডার দেবে এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করবে যে সব ক্রেতা-বিক্রেতা তত বেশি কমিশন পাবেন। বুঝেছো তো?

: জ্বি, স্যার।

: কি বললে? জোরে বলো।

: বুঝেছি, স্যার।

: ওকে, এইভাবে জোরে বলবে।

: ঠিক আছে স্যার।

: এইবার তোমার কথাটা শোনো। তুমিও যত বেশি অর্ডার আনতে পারবে তত বেশি পারসেন্টেস পাবে। তবে, সাবধান সময়জ্ঞানের কোনো হেরফের হলে তোমার চাকরি শেষ এবং অর্ডার কম আনতে পারলেও তোমার চাকরি শেষ। বুঝেছো বাছা? বুঝেছো? বলো বুঝেছো?

: বুঝেছি স্যার।

: গাড়ি না পাওয়া, ট্রেন ফেল করার কোনো অজুহাত চলবে না। এমনকি খেতে গিয়ে সময় নষ্ট করা চলবে না। এই ফার্মে কাজ মানে কাজ, তাই ওয়ার্কিং আওয়ারে কাজ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো বিষয়ের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারবে না। বুঝেছো? বলো বুঝেছো?

: বুঝেছি স্যার।

: সেই কখন থেকে একই কথা বলছো... 'বুঝেছি স্যার'... 'বুঝেছি স্যার'। এখন যাও, কাজে যাও। সময় নষ্ট করো না... ওইখান থেকে মালগুলো বুঝে নিয়ে কাজে যাও।

: ওকে স্যার।

ফার্ম সুপারভাইজারের আমাকে সব মালামাল ও কাগজপত্রগুলো বুঝে দিয়ে বলেন–

: মিস্টার গ্রেগর, আপনি ইয়াং এনার্জিটিক, আপনার সাফল্য কামনা করি।

: থ্যাঙ্কস।

: আপনাকে আজ প্রথমে যেতে হবে দক্ষিণ শহরে। তারপর ওখানকার অর্ডারগুলো নিয়ে শহরের মধ্যভাগে এবং সর্বশেষে শহরতলীর কিছু রিমোট অঞ্চলে।

: কিন্তু ওই সব এলাকার রাস্তাঘাট যে আমার অচেনা।

: কাজে নেমে পড়ুন সব চিনে যাবেন। সবার চেয়ে বেশি চিনে যাবেন।

: প্লিজ, আজকের মতো আপনি আমাকে কিছু সাজেশন দিন– আগে বলুন– কেমন করে দক্ষিণ শহরে যাবো?

: এখন বাজে সাতটা পনেরো, একটা ট্রেন আসার সম্ভাবনা আছে, আপনি দ্রুত স্টেশনে চলে যান।

: আর যদি ট্রেন না পায়?

: তাহলে তার পাঁচ মিনিট পর ট্রেন স্টেশনের উল্টা দিক থেকে একটা থ্রী-হুইলার ছেড়ে যাবে। আপনার জন্য ভালো হবে ট্রেনটা পেলে। আপনি জলদি যান, ট্রেনটা দক্ষিণ শহরে গিয়ে থামবে।

ফার্ম সুপারভাইজারের শেষকথাটা কোরাসের ধ্বনিতে আমার মন-কানে বারবার ঘুরেফিরে উচ্চারিত হতে থাকে–

আপনি জলদি যান
ট্রেনটা দক্ষিণ শহরে গিয়ে থামবে॥
আপনাকে যেতে হবে দ্রুত
অর্ডার আনতে হবে বেশি
তা হলে চাকরি উঠবে লাটে॥
আপনি জলদি যান
ট্রেনটা দক্ষিণ শহরে গিয়ে থামবে॥

ফার্মের হাত-ব্যাগটা হাতে নিয়ে যখন স্টেশনে পৌঁছাই তখনও ট্রেন আশার ঘণ্টাধ্বনি বাজে নি। আমি তাই স্টেশন মাস্টারের কক্ষে যাই এবং তাকে জিজ্ঞেস করি– দক্ষিণ শহরগামী ট্রেনটা এখনই আসবে কি-না? তিনি আমার কথায় অকারণে রেগে বলেন– 'জানলে তো সেই কখন ঘণ্টা বাজিয়ে দিতাম। সাতটা বিশের গাড়ি। এখন বাজে উনিশ। কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে না... সেই কখন থেকে ফোনে চেষ্টা করে যাচ্ছি।' তিনি ফোনসেট নিয়ে জোরে শব্দ করে করে নাম্বার টিপতে থাকেন এবং চিৎকার করে 'হ্যালো হ্যালো' বলতে থাকেন।

এদিকে হঠাৎ আমার পেটের ক্ষুধাটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আমি স্টেশন মাস্টারের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসি। স্টেশনের উপর একটি খোলা খাবার দোকান দেখতে পাই। ক্ষুধাটা আর সহ্য হয় না। ট্রেন আসার আগে নিশ্চয় কিছু একটা খেয়ে নেওয়া যায়। সহসা খাবার দোকানিকে টাকা দিয়ে একটি রুটি আর চা নিয়ে খেতে বসে যাই। কিন্তু

হায়, রুটিতে একটা কামড় বসাতে না বসাতেই 'কু ঝিক ঝিক' করে দক্ষিণ শহরগামী ট্রেন এসে হাজির হয়। আমি খাবার ফেলে ট্রেনে উঠে গিয়ে বসি।

দক্ষিণ শহরের দিকে ট্রেন ছুটে চলছে
চলছে চলছে॥
আজ থেকে আমি এক দূরন্ত পথিক
এই ট্রেন আমাকে দ্রুততই নিয়ে যাচ্ছে সামনে
আর যত গাছ-পাখি আজ আমার বিপরীত দিকে
ছুটে চলছে।
দক্ষিণ শহরের দিকে ট্রেন ছুটে চলছে
চলছে চলছে॥
হঠাৎ পাশের যাত্রী আমার সাথে বললে কথা
কি যে ভালো লাগে!

: এই যে ভাইয়া, আপনি করেন কি?

: আমাকে বলছেন?

: হ্যাঁ, আপনাকে।

: আমি ইনফিনিটি ফার্মের বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ।

: বলেন কি! আচ্ছা, ভাইয়া, এত বড় ফার্মে আপনি ঢুকলেন কি করে?

: আমার বাবা ওই ফার্মের একজন দায়বদ্ধ মানুষ।

: আপনার বাবা নিশ্চয় দেনা পরিশোধ করতে অক্ষম?

: ঠিকই ধরেছেন।

: তাই বলেন, আমি যতটুকু জানি ওই ফার্ম আপনার মতো কাঁচা বয়সের কাউকে চাকরি দেয় না। পাকা-ঝুনা লোক ছাড়া ওরা কাউকে নিয়োগ দেয় না।

: আপনি জানলেন কি করে?

: আমি চার চার বার অ্যাপলাই করেছিলাম... কিন্তু ওরা শেষবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে আমি নাকি যথার্থ ঝুনা লোক নই। অথচ কি আশ্চর্য দেখুন, আমার বয়স কিন্তু আপনার দ্বিগুণ হতে বাধ্য। তবু, আপনি সেই ফার্মেই চাকরি করছেন!

: আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগছে। আমি কি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারি?

: বন্ধুত্ব! ট্রেনে! ধূর মিয়া! আপনার মাথা খারাপ হইছে না-কি! আরে ট্রেন হচ্ছে অন্তরঙ্গতাহীন দূরন্ত যান... এখানে কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না, বন্ধুত্ব করা যায় না।

দক্ষিণ শহরের দিকে ট্রেন ছুটে চলছে
চলছে চলছে॥

লোকটার কথা আমার চেতনায় বিস্ময় এবং অন্তরে বেদনা এনে দেয়। হায় ট্রেন! তুমি কেমন মায়াহীন অন্তরঙ্গতাহীন দূরন্ত যান! এত মানুষকে পেটে নিয়ে ছুটে চলো... কিন্তু কারো প্রতি কারো অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করার সুযোগ ও মনোবৃত্তি দাও না।

এক শ বিশ কিলোমিটার গতিতে মাত্র দশ মিনিটে বিশ কিলোকিটার পথ পাড়ি দিয়ে ট্রেনটি আমাকে দক্ষিণ শহরে পৌঁছে দেয়। এইবার একজন বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমার মূল কাজ শুরু হয়।

: এই দেশে একমাত্র আমাদের ফার্মই দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য। আর তা আপনি সবচেয়ে বেশি কমিশনে এবং সবচেয়ে কম দামে আপনি কিনতে পারছেন। শুধু তা নয়, ক্রেতাদের কাছেও আপনি আমাদের পণ্য কম দানে বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছেন।

: এত কথা বলার চেয়ে আগে মালগুলো দেখান।

: ও সরি, মালগুলো এখনও দেখাইনি... এই যে দেখুন।

: প্যাকিং তো বেশ কালারফুল হয়েছে, কিন্তু ভেতরে মালের কোয়ালিটি ঠিক না থাকলে তার কি হবে?

: বিষয়টি আমরা ভেবে দেখবো।

: ভেবে দেখবো মানে! অন্যান্য ফার্ম তো কোয়ালিটি ঠিক না থাকলে অর্ডার ফেরতে নিতে বাধ্য থাকে। আপনাদের ফার্মের নিয়মটা কি?

: আমি আপনাকে পরে জানাতে পারবো।

: পরে জানাতে পারলে অর্ডারটাও পরে নিয়ে যাবেন।

: আপনাদের দোকানের একটা কার্ড দিন, আমরা ফোনে যোগাযোগ করবো।

: এই নিন।

: আচ্ছা, মালগুলো তো সব দেখলেন... এর মধ্যে কোনগুলোর ব্যাপারে আপনারা ইন্টারেস্টেড... এই তালিকার ভেতর থেকে একটু টিক চিহ্ন দিয়ে দিতে পারবেন?

: তা কেন পারবো না, দিন।

: সরি, স্যার আমি নতুন জয়েন করেছি, এখনও রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজটা ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারি নি বলে... আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি... নেক্সট টাইমে এমনটা আর হবে না।

: কিন্তু আপনাদের ফার্মটা তো পুরনো... আমরা পুরনো ফার্মের ব্র্যান্ড কিনতে আগ্রহী।

: থ্যাঙ্কস। আমি নিশ্চয় আপনাদের সে আগ্রহ মেটাতে সক্ষম হবো। ওকে, খুব শিগ্গি আবার আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। বাই।

: দাঁড়ান দাঁড়ান।

: কিছু বলবেন?

: হ্যাঁ, আমাদের অর্ডারগুলো আপনি ফাইনাল করতে পারেন। তবে...

: তবে!

: কমিশনটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে।

: আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। নিন তাহলে এই ফর্মটা পূরণ করে... এইখানে একটা স্বাক্ষর-সিল দিন।

একজন ক্রেতার কাছ থেকে স্বাক্ষর-সিল নিয়ে আমি ছুটে চলি আরেক ক্রেতার কাছে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে আমি একজন ভালো বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে দক্ষতা অর্জন করে ফেলি। ক্রেতার সামনে ফার্মের মালগুলো মেলে ধরে খুব সহজে আকৃষ্ট করার কৌশল আমার আয়ত্তে এসে যায়। আমার মুখ হয়ে ওঠে ফার্মের বিশ্বস্ত মেশিন–

: এই যে দেখুন আমাদের পণ্য... এই দেশে একমাত্র আমাদের ফার্মই দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুণগত মান সম্পন্ন এই পণ্যগুলো। আর এই পণ্যগুলো আপনি পাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি কমিশনে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে কম দামে আপনি যেমন আমাদের ফার্মের এই পণ্যগুলো কিনতে পারবেন তেমনি আপনিও আপনার ক্রেতাদের কাছে এগুলো কম দামে বিক্রি করতে পারবেন। এতে আমরা নিশ্চিত আপনার ক্রেতা সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকবে।

এবার স্যার, আপনাদের জন্য কতগুলো অর্ডার লিখবো... বলুন স্যার, বলুন।

এইভাবে অনবরত কথার খই তুলে অবিশ্রান্তভাবে এক একটি শহরের অলি-গলিতে ঘুরে অর্ডার সংগ্রহ করি। যোগাযোগ ব্যবস্থা যাই থাকুক, আমাকে একটি শহরের অর্ডার গ্রহণ শেষে ছুটে যেতে হয় আরেক শহরের দিকে। কেননা, দিবসের শুরুতেই ফার্মের সুপারভাইজার আমার জন্য সারাদিনের যে কর্মবন্টন করে দেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। না হলে আমার বিকল্প বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ দেওয়া হবে, আর আমাকে বরখাস্ত করা হবে। আমি বান্ধা গোলামের মতো ছুটে চলি–

: স্যার, এই যে দেখুন আমাদের পণ্য... এই দেশের মধ্যে এটাই সেরা গুণগত মানসম্পন্ন... স্যার, একটু দেখুন... তারপর না হয় অর্ডার দিবেন।

: কমিশন কেমন?

: সবচেয়ে বেশি।

: দাম কেমন?

: সবচেয়ে কম।

: অ্যাডভান্স করতে পারবো না।

: ওকে স্যার, আপনি রাজি হয়েছেন এতেই চলবে, অ্যাডভান্স করতে হবে না... বিক্রির পর বিল পরিশোধ করলেই চলবে।

: তা হলে অর্ডার ফর্ম দিন... লিখে দেই ।

: ওকে, এই যে নিন... এখানে স্বাক্ষর-সিল করতে করতে বলুন তো শহরতলীর পশ্চিমাঞ্চলের আবাসিক এলাকাতে যাবার উপায় কি আছে ।

: আপনি এখন যাবেন পাশ্চিমাঞ্চলে!

: হ্যাঁ আমাকে যেতেই হবে ।

: কিন্তু এখন আপনি শহরতলীর পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেন কানেকশন পাবেন বলে মনে হয় না ।

: ট্রেন ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নাই ।

: তাহলে তো আপনাকে হেঁটে যেতে হবে... পনেরো কিলোমিটার পথ ।

: পনেরো কিলোমিটার!

: জ্বি... এখন বেলা প্রায় শেষ... আমার মনে হয় না এই বেলায় আপনি হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবেন ।

: আমাকে পারতেই হবে । না হলে আমার চাকরি থাকবে না ।

: তা হলে আগে স্টেশনে যান... স্টেশনে গিয়ে আগে খোঁজ নিয়ে দেখুন ট্রেনের কানেকশন পাওয়া যায় কি-না ।

: থ্যাঙ্কস ।

: আজব চাকরি! মানুষ কেন যে এই চাকরি করে! বুঝি না ।

যে দুশ্চিন্তার ভার মাথায় নিয়ে আমি স্টেশনে যাই । আমার জন্য তা কোনো শুভ সংবাদ হয়ে ওঠে না । স্টেশন মাস্টার আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন– আজকের মতো আর কোনো ট্রেন কানেকশন নেই । অগত্যা আমাকে ফার্মের ব্যাগ ও কাগজ পত্র হাতে দুই পায়ে ছুটে চলতে হয় । সেখানে আসা-যাওয়ার সময় হেঁটে চলার দ্রুততায় আমি একসময় স্পষ্ট বুঝতে পারি– আমার শরীরের সবটুকু রক্ত পানি হয়ে যাচ্ছে, আর তা ঘামের বিন্দুস্রোতে দেহের পোশাক ভিজিয়ে দিচ্ছে ।

কিন্তু কি আশ্চর্য দেখো! যখন আমি ফার্মে এসে আমার কাজের প্রসংশাধ্বনি শুনতে পাই এবং তার বিনিময়ে নগদ টাকা হাতে পাই তখন সব কষ্ট কেমন করে জানি হাওয়া মিলে যায়!

মাস শেষে বড়কর্তা আমার কাজের হিসাব করে বলেন–

: কাজ তো বেশ ভালোই করছো বাছা! কিন্তু...

: স্যার!

: আরও ভালো করতে হবে ।

: স্যার!

: এই ছোড়া, মিস্টার সামসার বকেয়া খাতাটা নিয়ে আয় তো । *কথার মাঝে হঠাৎ একজন পিয়নকে নির্দেশ করেন ।*

: আনছি স্যার ।

: সব মিলিয়ে তোমার যা সম্মানী দাঁড়াচ্ছে... তা হচ্ছে কমিশন দেড় হাজার টাকা, যাতায়াত এক হাজার টাকা, আর মাসিক বেতন তেরোশত টাকা, আই মিন আনলাকি থার্টিন ।

: এই নিন স্যার, মিস্টার সামসার বকেয়া খাতা ।

: তোমার হোল সেলারি তিন হাজার আটশত টাকা । এরমধ্যে তোমার বাবার বকেয়া বাবদ আমরা কেটে রাখছি দুই হাজার আটশত টাকা । কারণ, তোমার বাবার বকেয়াটা সুদে আসলে পনেরো লাখ তিন হাজার দুইশত টাকা । অতএব, তুমি পাচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকা । নাও এইখানে একটা এবং এইখানে একটা সিগনেসার করো... এই নাও এক হাজার টাকা ।

: আপনাকে অনেক কৃতজ্ঞতা স্যার, অনেক কৃতজ্ঞতা ।

শ্রমে উপার্জিত অর্থ কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে ঘরে ফিরি আসি । আর বাবা-মা ও ছোট বোন গ্রেটাকে বিস্ময়-আনন্দে হাসিয়ে দিয়ে বলি–

: এই দেখো মা, এই দেখো বাবা, তোমার ছেলে পারে । এই নাও, তোমার ছেলের উপার্জিত টাকা । এখন থেকে আমাদের পরিবারের সব খরচপাতি আমিই বহন করতে পারবো ।

: তোর কথা শুনে বহুদিন পর আনন্দ অনুভব করছি ।

: তোমাদেরকে আমি চিরদিন আনন্দে রাখতে চাই ।

: গ্রেগর, এই নে, কিছু টাকা তোর হাত খরচের জন্য রেখে দে ।

: বাবা!

: নে ধর ।

: থ্যাঙ্কস ।

: এখন ঘরে গিয়ে একটু রেস্ট নে... কাল সকালে তো আবার তোকে ছুটতে হবে ।

: ঠিক বলেছো কাল আবার ছুটতে হবে... শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত... সে সময় আমাকে অন্য এক যন্ত্র-মানুষ হয়ে উঠতে হবে... তার আগ পর্যন্ত আমি তোমাদের গ্রেগর থাকতে চাই... গ্রেটা, তুই কোনো কথা বলছিস না যে...

: বলার কোনো সুযোগ দিলে তো বলবো ভাইয়া!

: ও বুঝেছি, আমার কথার মাঝে এতক্ষণ কথা বলতে পারিস নি বলে অভিমান করেছিস, এইবার বল... এইবার শুধু তোর সাথে কথা বলবো, বল... বলছিস না কেন?

: কি বলবো ভাইয়া?

: কিছু একটা বল... এই যে আমি উপার্জন করছি... এই নিয়ে তোর কোনো কথা নেই...

: ভাইয়া, তুমি কিন্তু অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়ছো ।

: গ্রেটা, টাকা উপার্জন করতে গেলে একটু তো ব্যস্ত হতেই হয়... আর এই টাকা উপার্জন ছাড়া আমি কেমন করে বাবার ঋণ শোধ করবো বল, কেমন করে দেশের সবচেয়ে বড় সংগীত নিকেতন কনসার্ভেটোরিয়ামে পাঠাবো বল ।

: ভাইয়া!

: আমি তোর সংগীতের অনুপ্রেরণা হতে সব করতে পারি গ্রেটা ।

: ভাইয়া!

: সামনের বছরে তোকে কনসার্ভেটোরিয়ামে পাঠাতে চাই ।

: এতো কম সময়ে এতো টাকা তুমি কোথায় পাবে?

: তুই তো জানিস না সেই কবে থেকে আমি আমার হাত খরচের টাকা জমিয়ে রাখি তোর জন্য ।

: ভাইয়া!

: বিশ্বাস হচ্ছে না! তা হলে শোন, এটা আমি অকারণে করি না, আমি বিশ্বাস করি– তুই কনসার্ভেটোরিয়ামের সংগীত শিক্ষা পেলে এদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পী হতে পারবি । সেদিন তোর গানে আমাদের দেশ মেতে উঠবে... তোর গানের অ্যালবাম চড়া দামে বি□ হবে... তখন তোর উপার্জনে আমি ঘরে বসে বসে খাবো... কি আমাকে বেকার বসিয়ে খাওয়াবি না?

: ভাইয়া, কি যে বলো তুমি!

: কেন খাওয়াবি না! আমি যে তোর স্বপ্ন রঙিন ভাই... নিত্য তোকে স্বপ্ন দেখাই...

: তোমার স্বপ্ন আমার ভালো লাগে ।

: আমার স্বপ্ন ভালো লাগে! আমাকে ভালো লাগে না?

: তোমাকেও লাগে । আসলে কি জানো ভাই...

: কি?

: তুমি আমাকে এমনভাবে স্বপ্ন দেখাও যে, তোমাকে সত্যি সত্যি ওই গানের প্রজাপতি মনে হয়– 'প্রজাপতি, প্রজাপতি, কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা ।' তুমি কেমন করে এত স্বপ্ন দেখো ভাইয়া! বলো না ভাইয়া, তুমি কেমন করে এতো স্বপ্ন দেখো?

: স্বপ্ন! আরে স্বপ্ন ছাড়া কি মানুষ থাকা যায়!

: মানে?

: মানে, আমার এই বুকে-চোখে স্বপ্ন আছে বলেই তো আমি মানুষের দলে আছি । যেদিন আমার এই বুকে কোনো স্বপ্ন থাকবে না সেদিন হয়তো আমি আর মানুষ থাকবো না ।

: ভাইয়া!

: হ্যাঁ রে গ্রেটা, এই কথাটি মনে রাখিস, যেদিন আমার এই বুকে-চোখে কোনো স্বপ্ন থাকবে না, আমার মুখ থেকে তুই আর কোনো স্বপ্নের কথা শুনবি না সেদিন নিশ্চিত জানবি আমি মানুষের দল থেকে দলছুট হয়ে গেছি, জানবি এই আমি অসামান্য মানুষ থেকে হয়ে গেছি ঘৃণিত কোনো কীট!

: না ভাইয়া, না ।

: হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি স্বপ্ন ছাড়া কোনো মানুষ হতে পারে না । গ্রেটা রে, এখন আমার খুব ভয় হয় ।

: কেন ভাইয়া, কেন?

: আমি এমন একটি ফার্মে আমি কাজ নিয়েছি... খুব ভয় হয়... তোর এই প্রজাপতি ভাইয়ের স্বপ্ন রঙিন মনপাখাটা না জানি বিবর্ণ হয়ে যায়...

: না না । তোমার স্বপ্ন রঙিন মনপাখাটা কখনই বিবর্ণ হতে পারে না ।

: যদি সত্যি সত্যি আমার সব স্বপ্ন হারিয়ে যায়, স্বপ্ন রঙিন মনপাখাটা বিবর্ণ হয়ে যায় তা হলে কি তুই আমাকে দূরে সরিয়ে দিবি? গ্রেটা, দূরে সরিয়ে দিবি? দূরে?

রাত্রি গভীর হয়েছে বলে অন্যঘর থেকে মা চিৎকার করে বলেন– 'গ্রেগর, এখনও ঘুমাস নি! ভোরে যে তোকে উঠতে হবে । অফিসে যেতে হবে । তাড়াতাড়ি ঘুমা । রাত্রি অনেক হয়ে গেছে ।' গ্রেটার মুখ থেকে আর আমার প্রশ্নের উত্তর জানা হয় না । তার বদলে মায়ের কথার সূত্র ধরে গ্রেটা আমাকে ঘুমাতে বলে–

: ভাইয়া, সত্যি অনেক রাত্রি হয়ে গেছে । তুমি এখন ঘুমাও ।

: ঠিক বলেছিস, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে । একটুখানি না ঘুমালে সারাদিন দৌড়াতে পারবো না ।

: তুমি তা হলে ঘুমাও ভাই, আমি যাই ।

: ঠিক আছে যা... আমাকে ভোরে ডেকে দিস কিন্তু ।

: আচ্ছা দেবো ।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই আমাকে এক কাল ঘুমে পেয়ে বসে । অন্যান্য দিনের ভোরে মতো আমার বিছানার পাশে ঘড়ির কান-ফাটানো অ্যালার্ম বাজে, ঘরের বাইরে মায়ের দরজা ধাক্কাসহ চিৎকার ও ছোট বোন গ্রেটার ফিসফিস কণ্ঠে নাস্তার আহ্বান কোনো কিছুতেই আমার ঘুম ভাঙে না । আর এই কাল ঘুমের ভেতর পাঁচটার ট্রেনের চলে গেছে, এমনকি সাতটায় অফিসে ঢোকার সময়ও পেরিয়ে গেছে ।

অফিসের বড়কর্তা ঠিক সাতটায় আমার অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন । তিনি তড়িৎকর্মা মানুষ । গাড়ি দিয়ে ফার্ম সুপারভাইজারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার

বাড়ির ঠিকানায়। তিনি আমাকে টেনেহেঁচড়ে গাড়িতে উঠিয়ে অফিসে নিয়ে গিয়ে সোজা বড়কর্তার সামনে ছুড়ে দেন–

: এই যে স্যার, গ্রেগর।

: ব্যাপারটা কি!

: স্যার, কুলাঙ্গারটা অলস ঘুম দিচ্ছিল।

: এই থামো... আমি দেখছি... না না, ঘুম নয়, ও স্বপ্ন দেখছিল, আমি ওর চোখের ভেতর স্পষ্ট স্বপ্নের আভাস দেখতে পাচ্ছি... স্বপ্ন! হা হা হা। এই ফার্মে কাজ করতে গেলে কোনো স্বপ্ন দেখা যাবে না... কোনো স্বপ্ন না।

তুমি আর কোনোদিন কোনো স্বপ্ন দেখবে না
স্বপ্ন দেখবে না
স্বপ্ন দেখবে না
স্বপ্ন দেখবে না॥
স্বপ্ন শুধু ভুলিয়ে রাখে মানুষের লাভের কাজ
তাই এখন থেকে স্বপ্ন ভুলে যা
স্বপ্ন দেখা ছাড়
ওরে স্বপ্নবাজ॥
কোনোদিন কোনো স্বপ্ন দেখবে না
স্বপ্ন দেখবে না॥

: আমাদের ফার্মে কাজ করতে গেলে স্বপ্ন দেখা চলবে না... শুধু কাজ চলবে... কাজ কাজ আর কাজ।

: স্যার, আমাকে ক্ষমা করুন।

: জোরে বলো।

: আমাকে ক্ষমা করুন স্যার, ক্ষমা করুন।

: ক্ষমা!

: প্লিজ স্যার, আমাকে ক্ষমা করুন।

: শোনো বাছা, ইনফিনিটি কমার্শিয়াল ফার্মের লোকশানে ক্ষমার কোনো সুযোগ নেই।

: স্যার!

: তোমার কারণে আজ ফার্মের কত ক্ষতি হয়েছে জানো? তোমাকে আগেই বলেছিলাম, আমাদের ফার্মে ঘড়ির কাটায় কাজ বাঁধা থাকে। আজ তুমি কত ঘণ্টার কাজ নষ্ট করেছো জানো?

: স্যার, আমি ওভার টাইম করে সব ক্ষতি পুষিয়ে দেবো।

: জোরে বলো।

: স্যার, ওভার টাইম করে সব ক্ষতি পুষিয়ে দেবো।

: আর অফিসে আসতে তোমার দেরি দেখে তোমার বাড়িতে ফার্ম সুপারভাইজারসহ যে গাড়ি পাঠালাম তার কি কোনো তেল খরচ হয়নি!

: স্যার!

: কমার্শিয়াল ফার্মে সব কিছুর হিসাব রাখতে হয়... তাই তেল খরচের টাকাটা কিন্তু তোমার বেতন থেকে কেটে রাখা হবে। ওকে?

: ওকে, স্যার।

: জোরে বলো।

: ওকে, স্যার।

: এখন যাও, জলদি করে কাজে নেমে পড়ো।

: থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

: ওয়েলকাম।

ফার্ম সুপারভাইজারের কাছে প্রতিদিনের মতো কাজ বুঝে নিতে যাই–

: মিস্টার গ্রেগর, আপনাকে আরেকটু সিরিয়াস হতে হবে... জানেনই তো আপনার প্রতি আমাদের ফার্মের একটা সফ্‌ট কর্নার আছে...

: থ্যাঙ্কস স্যার।

: কিন্তু আপনার প্রতি আমাদের সফ্‌ট থাকার কারণটা কি জানেন?

: স্যার, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না।

: তা আমি আপনার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছি।

: স্যার।

: আসলে, আপনি তো আপনার বাবার বকেয়া পরিশোধ করতে আমাদের ফার্মে চাকরি নিয়েছেন। আর সেটা আপনি যত দ্রুত পরিশোধ করতে পারেন ততই আমরা খুশি... কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আপনার বাবার বকেয়ার টাকাটা একটু বেশি... পনেরো লক্ষ তিন হাজার দুই শত টাকার বকেয়া...

: আমি পরিশোধ করে দেবো।

: কিন্তু এখন আপনি যে হারে বকেয়া পরিশোধ করছেন– তাতে পুরো বকেয়া পরিশোধ করতে আপনার– প্রায় পয়তাল্লিশ বছর সময় লাগবে।

: পয়তাল্লিশ বছর!

: জ্বি, হ্যাঁ। তাই বলছিলাম কি– আরেকটু সিরিয়াস হয়ে কাজ করুন... পরিশোধের হার বাড়ান... তা হলে কম সময়ে বকেয়া পরিশোধ করতে পারবে... এর জন্য প্রয়োজন শুধু কাজের প্রতি আরেকটু সিরিয়াস হওয়া।

: স্যার, আমি আমার সর্বোচ্চ শক্তি ও সাধ্য দিয়ে– সত্যি বলছি স্যার, আমি সিরিয়াসলি কাজ করছি।

: না, করছেন না, এই যেমন আজকে অর্ধেক বেলা ঘুমালেন, এটা সিরিয়াস হয়ে কাজ করার দৃষ্টান্ত নয়।

: স্যার, এমনটা আর হবে না।

: সেটা দিন গেলে দেখা যাবে, এখন যান, কাজে যান, আজ এমনিতেই দেরি করে ফেলেছেন। তাই আগে যাবে শহরের কেন্দ্রীয় বিপণিগুলোতে, তারপর শহরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জলবন্দর এলাকায় এবং সর্বশেষে ট্রেনযোগে পুরনো রাজধানীতে চলে যাবেন। যান সময় কম, ঘুরতে হবে বেশি।

: ওকে স্যার।

এবার হতে আমি
নিজেই নিজের কাছে
হয়ে উঠি এক অচেনা মানুষ।
ছুটে চলা শুধু
ধুধু ধুধু দূর পথে
মিছেই হারাই মানবিক হুঁশ॥

: এই যে দেখুন আমাদের পণ্য... এই দেশে একমাত্র আমাদের ফার্মই দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুণগত মানসম্পন্ন এই পণ্যগুলো। আর এই পণ্যগুলো আপনি পাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি কমিশনে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে কম দামে আপনি যেমন আমাদের ফার্মের এই পণ্যগুলো কিনতে পারবেন তেমনি আপনিও আপনার □তাদের কাছে এগুলো কম দামে বি□ করতে পারবেন। এতে আমরা নিশ্চিত আপনার □তা সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকবে।

এবার স্যার, আপনাদের জন্য কতগুলো অর্ডার লিখবো... বলুন স্যার, বলুন।

এভাবেই আমার সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি আসে। আর আমার শরীরজুড়ে অবসাদ নেমে আসে। কিন্তু আমার মুক্তি নেই। আমাকে ছুটে চলতে হয় প্রচ অবসাদের ভেতরে– ক্লান্তির মুখে ক্ষমা ছুড়ে দিয়ে– ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করে প্রভু।

হেই ভগবান, কী প্রচণ্ড অবসাদ জাগানো কাজই আমি বেছে নিয়েছি! দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ানো! দপ্তরে বসে কাজ করার চাইতে এটা অনেক বেশি বিরক্তিকর, তা ছাড়া এখানে রয়েছে নিরন্তর ভ্রমণের ঝামেলা, ঠিকমতো ট্রেন কনেকশন পাওয়া যাবে কি-না সে-সম্পর্কে দুচিন্তা, থাকা আর অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে দুর্ভাবনা, নিত্যনতুন লোকজনের সঙ্গে ক্ষণিক পরিচিতি, যারা কখনো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

ফার্মের জন্য পণ্যের অর্ডার সংগ্রহ ছাড়া আমার জীবনের আর কোনো কামনা-বাসনা অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি আমি যে স্বপ্ন পূরণের জন্য চাকরি নিয়েছিলাম তাও

একসময় আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। আমি আর স্বপ্ন দেখতে পারি না। প্রিয় বোন গ্রেটাই প্রথম আমার স্বপ্নভঙ্গের ঘটনাটা প্রথম বুঝতে পারে।

: ভাইয়া, তোমার কি হয়েছে?

: কিচ্ছু না, কিচ্ছু হয় নি।

: না ভাইয়া, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, বলো আমাকে, কি হয়েছে তোমার?

: আমার কথা শুনে আর কি হবে গ্রেটা! আমি আর পারলাম... পারবো না।

: ভাইয়া, কি হয়েছে তোমার?

ছোট বোন গ্রেটার চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে বাবা ছুটে আসেন এ ঘরে। তিনি আমাকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে কাছে এসে বলেন–

: গ্রেগর!

: বাবা, আমি আর তোমার সামনে আমার মুখ দেখাতে পারবো না।

: কেন? কি হয়েছে তোর যে একথা বলছিস!

: আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে ঋণের দায় থেকে খুব শীঘ্র উদ্ধার করে আনবো, বলো বলেছিলাম না?

: হ্যাঁ, বলেছিলি এবং তুই তো সে চেষ্টা করে যাচ্ছিসও।

: হ্যাঁ, ভাইয়া, চেষ্টা করে যাচ্ছো। এর মধ্যে তার অনেকটাই পরিশোধও তো করেছো।

: অনেকটা নয়, গ্রেটা খুবই সামান্য।

: আস্তে আস্তে নিশ্চয় তুমি সবটা পরিশোধ করতে পারবে।

: পয়তাল্লিশ বছর লাগবে। পুরো দেনা শোধ করতে পয়তাল্লিশ বছর লাগে।

: গ্রেগর!

: হ্যাঁ, বাবা। পনেরো লক্ষ তিন হাজার দুই শত টাকার বকেয়া আমি প্রতি মাসে দুই হাজার আট শত টাকা করে পরিশোধ করতে থাকলে পয়তাল্লিশ বছর লাগবে।

: ভাইয়া, তুমি ভেঙে পড়ছো কেন! তুমি না স্বপ্ন দেখতে জানো...

: না, আর কোনো স্বপ্ন আমার জন্য অবশিষ্ট নেই।

: ভাইয়া! তুমিই না আমাকে এতদিন স্বপ্ন দেখাতে! আর স্বপ্ন রঙিন তোমাকে আমি আমার গানের প্রজাপতি ভাবতাম... একথা তো মিথ্যে নয় ভাই...

: মিথ্যে।

: ভাইয়া!

: আমি বলছি মিথ্যে। আসলে, কি জানিস, তোর সেই প্রজাপতি ভাইয়ের পাখা দুটো বিবর্ণ হয়ে আজ একটি তেলাপোকার পাখায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে...

: ভাইয়া!

: এই আমি আজ থেকে একটি স্বপ্নহীন তেলাপোকা মাত্র।

জীবন বাস্তবতায় নিজের অসহায়ত্বের মধ্যে আমি নিজেকে স্বপ্নহীন তেলাপোকা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। নিজের এই ব্যর্থতার কথা যখন বাড়ির সবার কাছে স্পষ্ট করে তুলি তখন আমি সবার কাছে একটি অসহায় প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যাই। আমাকে বাদ দিয়েই বাড়ির সবার সব ধরনের চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্ম আবর্তিত হতে থাকে। এর মধ্যে বাবা-মা যুক্তি করে আমাদের বাড়ির একটি ঘর তিন জন ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়ে দেন।

একদিন রাতে তাদের খাবার শেষ হলে আমার ছোট বোন তার প্রিয় বেহালাটা নিয়ে বাজাতে শুরু করে। বেহালার সুর শুনে ভাড়াটিয়ারা তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বাবা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেন–

: বেহালা বাজানোতে আপনাদের কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? তা হলে এক্ষুনি বন্ধ করে দেওয়া যাবে।

: না না বন্ধ করার দরকার নেই।

: বেহালার সুর আমাদের বেশ ভালো লাগছে।

: আচ্ছা, মিস্টার সামসা, আপনার মেয়েটা যদি আমাদের মাঝে বেহালা বাজায় তা হলে কিন্তু আরও ভালো হয়।

: আমরা একটু আরাম করে বেহালা শুনতাম।

: আসুন তা হলে।

: মা, তুমি কি আমার মিউজিক স্ট্যান্ড আর স্বরলিপির খাতাটা এনে দিতে পারবে?

: অবশ্যই, একটুখানি অপেক্ষা কর।

মা কিছুক্ষণের মধ্যে মিউজিক স্ট্যান্ড এনে গ্রেটার সামনে রেখে স্বরলিপির খাতাটা তার উপর গেঁথে দেয়। আর গ্রেটা নব উদ্যমে বেহালা বাজাতে শুরু করে।

আমি বহুদিন পর গ্রেটার বেহালার সুর শুনে স্থির থাকতে পারি না। কিন্তু আমার মতো একটা জঘন্য প্রাণী বোনের সে সুর শ্রবণে সেখানে এগিয়ে যেতেই ভাড়াটিয়ারা ক্ষেপে যান।

: এই প্রাণীটা এখানে কেন?

: যে বেহালার সুর একটা জঘন্য প্রাণীকে এখানে টেনে আনতে পারে আমরা সে বেহালার সুর শুনতে চাই না।

: শুনুন মশাই, স্পষ্ট করে বলে রাখি, যে বাড়িতে ওর মতো একটা জঘন্য প্রাণী বাস করে সে বাড়িতে থাকার জন্য আমরা এক পয়সাও দেবো না।

: হ্যাঁ, কিচ্ছু দেবো না। উল্টো আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা ক্ষতি পূরণের অভিযোগ আনতে পারি এবং তা আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হবো।

: ছি, একটা জঘন্য প্রাণীর আবাসস্থান আমরা ভাড়া নিয়েছি! একথা ভেবে যে আমার নিজের কাছে নিজেরই ঘৃণা হচ্ছে।

এভাবেই ভাড়াটিয়ারা আমাকে দেখামাত্র আমার বাবা-মাকে তিরস্কার করে তাদের ঘরে চলে যান। আর তখন আমার প্রিয় ছোট বোন কেমন জানি অচেনা হয়ে ওঠে। সে বেহালাটা মায়ের কোলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে টেবিলে চাপড় মেরে বলে–

: বাবা, মা, এরকম ভাবে আর চলতে পারে না। আপনারা হয়তো এটা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমি পারছি। এই প্রাণীটার সামনে আমি আমার ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করব না, তাই আমি শুধু এইটুকু বলছি যে এটাকে আমাদের তাড়িয়ে দিতে হবে।

হায়– এই আমার পরিণতি! আমার প্রিয় ছোট বোন আমাকে আজ তাড়িয়ে দিতে চায়ছে। হায়! স্বপ্নহীন একজন ভাই গ্রেগরকে তার আর দরকার নেই। কিন্তু বাস্তবে এই গ্রেগর বাবা-মা ও বোনের জীবনে সাফল্য এনে দেবার স্বপ্নে নিজেকে নিবেদন করেছিল বিশ্রামহীন শ্রমে। সেই গ্রেগর আজ স্বপ্নহীন। অথচ এই গ্রেগর একদিন স্বপ্ন দেখেছিল...

আমার স্বপ্ন ছিল
আমার বোন হবে সঙ্গীতের সুর
গানে গানে করবে সে ভুবন মধুর॥
আমার স্বপ্ন ছিল
ঋণগ্রস্ত পিতা-মাতার সব দেনা-দায়
পরিশোধ করবো সবই একদিন নিশ্চয়॥
সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্ম হয়নি আমার
আমি তাই স্বপ্ন দেখেছি
একটি জীবনের
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের– মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা... ।
আমি নই গোবরে ফোটা পদ্মফুল
আমার স্বপ্ন দেখা তাই হলো ভুল॥

রচনাকাল : ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

প্রসঙ্গকথা

বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় মহাকাব্য। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত বাল্মীকি রামায়ণ যুগে যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু কবির দ্বারা নানা ভাষায় অনুবাদ ও রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনার প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী হলেন পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। এছাড়া ষোড়শ শতকে বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহের কবি চন্দ্রাবতী আরেকটি রামায়ণ রচনা করেন। আসলে, কৃত্তিবাস-চন্দ্রাবতী এঁদের রামায়ণ রচনার পর থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে অসংখ্য গায়ক, বাদক, নৃত্যকার, অভিনয়শিল্পী, পালাকার-দোহারগণ তাঁদের নিজস্ব অভিনয় কুশলতায় গীত, নৃত্য, কথা, বর্ণনা তথা বিচিত্র নাট্যাঙ্গিকে রামায়ণের আখ্যান পরিবেশন করে আসছেন। উল্লেখ্য, মহাভারত, মনসামঙ্গল, গাজীর গান, চণ্ডীমঙ্গল, মাদারপীরের গান, ইমামযাত্রা, জারিগান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যচরিত্রামৃত, যোগীর গান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মমত কেন্দ্রিক আখ্যান পরিবেশনার পাশাপাশি রামায়ণ-এর আখ্যান পরিবেশনার বিষয়টি বাংলাদেশের চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক পরিচয়কে মনে করিয়ে দিতে সক্ষম। অথচ বাংলাদেশে রামায়ণ-এর আখ্যাননির্ভর নাট্যাভিনয় প্রচলনের কথা এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিক বিষয় হলেও শহুরে নাট্যকর্মী এবং বহির্বিশ্বের অনেক মানুষের কাছে আজও অনেকটা অজানা রয়েছে। তাই এদেশীয় ঐতিহ্যের আদলে আদি কবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ-এর অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনাকে আশ্রয় করে আধুনিক যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল দর্শকদের জন্য *সীতার অগ্নিপরীক্ষা* নাটকটি রচনা করা হয়েছে। এই নাট্যপালা পরিবেশনের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক পরিচয় পুনর্ব্যক্ত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। *সীতার অগ্নিপরীক্ষা* নাটকটির রচনায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যাভিনয়রীতি ও সঙ্গীতের ব্যবহার করা হয়েছে।

নাটকটির প্রথম প্রযোজনা সম্পর্কিত তথ্য : একক অভিনয় : আভেরী চৌরে (দিল্লি, ভারত)। সুর ও সঙ্গীত : জাহেদুল কবির লিটন। নির্দেশনা উপদেষ্টা : সারা যাকের। নির্দেশনা : আব্দুল হালিম প্রামানিক সম্রাট (অনির্বাণ সম্রাট)। প্রযোজনা অধিকর্তা : লুবনা মারিয়াম। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান : সাধনা, উপমহাদেশী সংগীত ও নৃত্য প্রসার কেন্দ্র। প্রথম মঞ্চায়ন : ১৬ জুন ২০০৯, এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ। দ্বিতীয় মঞ্চায়ন : ৪ নভেম্বর ২০০৯, স্টেন অডিটোরিয়াম, ইন্ডিয়ান হেভিটাট সেন্টার, দিল্লি, ভারত।

নাটক শুরু

সুধীজন, আজ আমি আপনাদের সামনে ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় মহাকাব্য রামায়ণ-এর এক সাধ্বী নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। আমি সীতা।

মহাকবি বাল্মীকি রচিত আখ্যানে পূর্বজন্মে আমি ছিলাম লক্ষ্মী, বেদবতী, এমনকি এক পদ্মপুষ্প উদ্ভূতা রূপবতী নারী।

বর্তমান জন্মে আমি লাঙ্গলের ফলায় ভূমি হতে উদ্ভূতা, বৈদেহ রাজনন্দিনী, মিথিলার জনক রাজের পালিতা কন্যা, রাজা দশরথের পুত্রবধূ, শ্রীরামচন্দ্রের পতিব্রতা স্ত্রী। আমি সীতা।

এ কথা কে না জানে, পিতৃবাক্য রক্ষায় শ্রীরামচন্দ্র যখন স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসের পথে রউনা দিয়েছিলেন তখন এই আমি আমার পতিব্রতা স্বভাবে তাঁর সহগামিনী হয়েছিলাম।

আমি শ্রীরামচন্দ্রের সহগামিনী হয়ে গিয়েছি চিত্রকূট পর্বতে, আমি অত্রিমুনির আশ্রমে, দণ্ড কারণ্যে এবং সবশেষে পিপ্পলী ও অগস্ত্যের বন হয়ে গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটি বনে। ভেবেছিলাম সেখানেই শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃবাক্য রক্ষার চৌদ্দ বছর পূর্ণ হবে। আর সেই পূর্ণতায় আমরা ফিরে যাবো সুখের সংসারে, দূর অযোদ্ধায়।

কিন্তু হায়! চৌদ্দ বছর পূর্ণ হবার আগেই কেন আমি শ্রীরামচন্দ্রকে সোনার হরিণ ধরে দিতে বলেছিলাম। কেন আমার মন থেকে বেরিয়ে এসেছিল গান– 'আমার সোনার হরিণ চাই॥' আর অমনি তিনি কেন ছুটে গেলেন সেই সোনার হরিণের পিছে পিছে। তিনি কেন বুঝলেন না সে যে মায়ামৃগ–'সে যে চমকে বেড়াই দৃষ্টি এড়ায় লাগায় চোখে ধাঁধা।'

তিনি আমার চোখের আড়াল হতেই বাতাসে ভেসে এলো এক করুণ ধ্বনি–'কোথারে ভাই, লক্ষ্মণ প্রাণ যায়। রক্ষা কর আমায়।' স্বামীর বিপদের শঙ্কায় ভয়ে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠল। আমি দেবর লক্ষ্মণ ডেকে বললাম–'যাও ভাই, যাও, উদ্ধার করে আনো তোমারই প্রিয় ভাইকে। ওই শোনো সে ঘোর বিপদে পড়েছে। রক্ষা করো তারে।'

মুহূর্তের মধ্যে আমাকে একা রেখে দেবর লক্ষ্মণ ছুটে চলল শ্রীরামচন্দ্রের মায়া ধ্বনির দিকে।

সহসা সাধুর ছদ্মবেশে দুয়ারে এসে দাঁড়ান রাবণ। কিন্তু আমি সেই সাধুর ছদ্মবেশী রাবণকে চিনতে পারলাম না কেন! কেন আমি তার কথা বিশ্বাস করে ভিক্ষা দিতে গেলাম! আর তিনি ভিক্ষা গ্রহণের ছলে আমাকে তার সীমার মধ্যে পেয়ে আঁকড়ে ধরলেন শক্ত হাতে। শুধু তাই নয়, মুহূর্তের মধ্যে আমাকে নিয়ে তিনি উড়ন্ত রথে তুলে ছুটে চললেন দিগন্তের খুব কাছাকাছি দিয়ে, আমাকেসহ তার দুরন্ত রথ সমুদ্র অতি□ম করে লঙ্কা নগরে এসে থামলো।

রাবণ আমাকে বন্দিনী করে রাখলেন সুবর্ণ লঙ্কার এই অশোক কাননে। রাবণ এখানে, এই অ-শোক কাননে আমাকে বন্দিনী রেখেছেন এই ভেবে যে কোনো শোক যেন আমাকে স্পর্শ না করে, এমনকি আমার প্রিয়পতি শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ-শোকও আমাকে ব্যাকুল না করে। রাবণ ভেবেছিলেন জীবনের সকল হারার বেদনা-শোক ভুলে এই অশোক কাননের মনোরমে মুগ্ধ হয়ে আমি এক সময় তার অধীনতাকে স্বীকার করে নেবো।

হায় অশোক কানন! তুমি সত্যি মনোরমা! তোমার গাছে গাছে বিচিত্রবর্ণা ফুল আর পাখির কলতান। তুমি যথার্থই নির্মল, আর এক স্বস্তির তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু তোমার নির্মলতায় আমি একদিনের জন্যেও যে স্বস্তি অনুভব করতে পারিনি। কী করে পারি বলো–অপহৃতার জীবনে কী কখনো স্বস্তি আসতে পারে?

হে কবি বাল্মীকি, তুমি আমার জীবনে স্বস্তি দাও, শান্তি দাও, আর শ্রীরামচন্দ্রকে এনে আমার জীবনে মিলায়ে দাও। জগতবাসী জানে, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা উভয়েই তোমার মানসজাত, সেই অর্থে তুমিই আমার মানসগুরু-জীবনগুরু।

তোমাকে বন্দনা করে তরাতে চাই এ আসর। তুমি এসো হে জীবনগুরু।

গুরুর নাম লইয়া দাঁড়াইলাম আসরে
এসো হে ও মোর দয়াল গুরুধন
তোমার নাম লইয়া দাঁড়াইলাম আসরে ॥
প্রথমে বন্দনা করি শিক্ষা গুরুর পাও
আদি গুরুর চরণ বন্দি বাল্মীকির পাও ॥
তারও পরে বন্দনা করি কৃত্তিবাস ওঝাও
আরও বন্দী সে সব কবি যারা রামায়ণ গাও ॥
সবশেষে বন্দনা করি সাইমন জাকারিয়া
যার কৃপায় মঞ্চে আনি সীতার অগ্নিপরীক্ষা ॥
বন্দী আমি নাট্যনির্দেশক, বন্দী সংগঠক
বন্দী বন্দী প্রাণও ভরে আসরের দর্শক ॥
একে একে বন্দী গাইতে লাগবে অনেকক্ষণ
ত্রিভূবনে বন্দী গাইব যত গুরুজন ॥
ছাড়িলাম বন্দনা এবার পালায় দিলাম মন
একমনে শুনেন গো সবাই সীতারও কথন ॥

রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে আমি শ্রীরামচন্দ্রের সাধ্বী স্ত্রী সীতা লঙ্কার এই অশোক কাননে বন্দিনী জীবন যাপন করছি। কিন্তু এখানে কেমন আছি আমি বন্দিনী জীবনে?

কেমন আছি আমি আত্মীয়-পরিজনহীন লঙ্কার অশোক কাননে? কেমন? তাহলে শুনুন।

অশোক কাননে এই আমার বন্দিনী জীবনের শুরু থেকে প্রায় প্রতিদিন রাবণ একবার করে আসেন। কত বিচিত্র তার রূপ– কোনোদিন তিনি এসে মায়ায় ভোলাতে চান এই আমাকে, কোনোদিন ক্রোধে, ভয় দেখিয়ে আমাকে লুটে নিতে চান। তবে বেশির ভাগ দিন তিনি ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে হেসে আমাকে তার অধীনতা স্বীকার করতে বলেন– 'হা হা হা! আমিই মহাবীর রাবণ। হে সীতা, নিজ মনোবাক্যে আমার অধীনতা স্বীকার করে নাও সীতা। নইলে প্রাণ যাবে তবু মুক্তি পাবে না কোনদিন। হা হা হা।'

তাঁর বিকট হাস্যধ্বনি আর উন্মত্ত বাক্যবাণে আমি ভয়ে অশোক কাননের বৃক্ষদের সঙ্গে মিশে যাই।

সহসা রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী এসে বলেন–'ওই লো সুন্দরী। তুই তোর রূপের মাধুরীতে আমার স্বামীর মন হরণ করেছিস। তোর কারণে আগুন লেগেছে লঙ্কায়, আগুন লেগেছে আমার সুখের সংসারে। তুই সুখী হবি না, কোনদিন সুখী হবি না।'

আমি সুখী হবো না। সুখী হবো না! মন্দোদরী অভিশাপ ও ধিক্কারে আমার প্রতিটি মুহূর্ত বিষময় হয়ে ওঠে। মন্দোদরী এসে বলেন–

–শোন সীতা, যে আগুনে লঙ্কা পুড়েছে, আমার সংসার পুড়ছে সে আগুনই তোর একমাত্র নিয়তি।... তোর স্বামী রামচন্দ্র আমারই দেবর বিভীষণকে হাত করে বানর সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়েছে লঙ্কায়... তোকে উদ্ধারিতে চলছে ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ... কিন্তু শুনে রাখ– আমার পুত্র আছে ইন্দ্রজিত মেঘনাদ-বীরবাহু আর আমার স্বামীর পরাক্রমের কাছে কে পারে বিজয় লাভ করতে!

মন্দোদরীর এই দৃঢ়বাক্য আমার মনে কেন যেন একটা শঙ্কা এনে দেয়। কিন্তু এই নির্জন অশোক কাননে বন্দিনী আমি শঙ্কিত মনের শান্ত্বনা কোথায় পাই!

এবার আমি মন্দোদরীর কণ্ঠে তাঁর ব্যথাভরা মনের আর্তনাদ শুনতে পাই। তিনি বলেন–

–হে সীতা, যুদ্ধে আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে। কেননা, শত শত লঙ্কাপুত্রের অপমৃত্যু ঘটছে এই যুদ্ধে। দোহাই তোর। তোর স্বামীকে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে বল। নইলে তুই... সুখী হবি না... হবি না... হবি না... হবি না।

একথার প্রতিধ্বনি অশোক কাননের বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে মন্দোদরী চলে যান অন্তঃপুরে। আর আমি মনে মনে বলি–'হে মন্দোদরী দেবী, আপনি কেন বুঝছেন না, আমি যে বন্দিনী, আমি বন্দিনী অবস্থায় কেমন করে রামচন্দ্রকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলি! তবু আপনি কেন আমাকে অভিশাপ দিয়ে গেলেন– আমি সুখী হবো না? কিন্তু কেন?

অশোক কাননের পাখিদের কণ্ঠেও আমি ওই মন্দোদরীর কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই–'তুই সুখী হবি না। তুই সুখী হবি না।'

আমি ব্যাকুল হয়ে এক অস্থির বিষণ্ণতায় কেঁদে উঠি, আমার জীবনে সুখের দেখা মিলবে না। মিলবে না?

সহসা বিকট ধ্বনিতে হেসে ভূমি কাঁপিয়ে অশোক কাননে প্রবেশ করেন রাবণ। তিনি তার বিকট হাসির ভেতর চিৎকারে বলেন–

–কোথা গো সুন্দরী? কোথায় সীতা? কোথায় ললনে? এইবার আমাকে গ্রহণ করো দেবী।

এমনই কথার মধ্যে তিনি আমার সামনে এসে একটি ছিন্ন মস্তক মেলে ধরে বলেন–'চিনতে পারছো সীতা এ কার মাথা?'

বিস্ময়ে তাকিয়ে বলি– এ যে রামচন্দ্র!

আমি তার ছিন্ন মস্তক দেখে স্থির থাকতে পারি না। হতবিহ্বল হয়ে বিভীষণের ছুড়ে দেয়া মস্তকের কাছে ছুটে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হায় হায় করতে লাগলাম।

আমার সেই অবস্থার মধ্যে রাবণ বললেন–'সীতা, এবার আমাকে গ্রহণ করে নিতে তোমার আর কোনো বাধা নেই। কেননা, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে মহাপরাক্রমে শ্রীরামচন্দ্রকে পরাস্ত করেছি। আর তোমাকে আপন করে পাবার জন্য এই ছিন্ন মস্তক উপহার নিয়ে এসেছি... এবার আমায় গ্রহণ করো সীতা।'

–না না না। এ হতে পারে না। রামচন্দ্র আমায় একা রেখে নিহত হতে পারেন না। না না না।

–কিন্তু হয়েছে তো... তোমার চোখের দেখা তো আর ভুল নয় সীতা।

–তাই তো!

আহা আহা স্বামী আমার, তুমি কেন এসেছিলে আমাকে উদ্ধারিতে এই লঙ্কায়, আর অকালে আমাকে একা করে দিয়ে চলে গেলে পরপারে। তুমি যখন নাই, তবে আর আমার বেঁচে লাভ কী! তার চেয়ে আমারও মরণ ভালো। হায় স্বামী! বনবাসে তোমার সহগামিনী হয়েছিলাম কী এই জন্য যে আমার অগোচরে তুমি মৃত্যু বরণ করবে!

এমনই হাহাকারের মধ্যে সরমা, অশোক কাননের একমাত্র সহায় বিভীষণ পত্নী আমার পাশে এসে বলেন–'আজ এমনভাবে কেন কাঁদছো সীতা?'

–কেন কাঁদছি? এই দেখো!

আমি তাকে শ্রীরামচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক দেখাই। সরমা তা দেখে আমাকে শান্ত্বনা দিয়ে বলেন–'এই দেখে কাঁদছো! কেঁদো না সীতা, কেঁদো না।'

আমি বললাম–'আমার সামনে আমার স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক পড়ে রয়েছে! আর তুমি আমাকে কাঁদতে নিষেধ করছো!'

সরমা হেসে বললেন–'শোনো তাহলে, ওটা আসলে শ্রীরামচন্দ্রের মস্তক নয়। ওটা একটা মায়ামাত্র। তুমি তো জানো না, এই লঙ্কার শিল্পীরা মায়া রচনায় কত সিদ্ধহস্ত। তাই বলছি তোমার আবেগ সংবরণ করো।'

আমি সুরমা চোখের দিকে চেয়ে বুঝে নিতে চাইলাম তিনি মিছে বলে আমাকে প্রবোধ দিতে চাইছেন না তো। কিন্তু না তার চোখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলাম কথাটা সত্য।

এর মধ্যে সুতীব্র চিৎকারে অশোক কাননে ঢুকে পড়েন মন্দোদরী–'পোড়ামুখী, পোড়ামুখী, তোর কারণে লঙ্কা আজ হইলো বীরশূন্য। আমার প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিত মেঘনাদ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছে। হায় পোড়ামুখী!'

তার পিছে পিছে ভীষণ ক্রোধে মত্ত হয়ে আমাকে বধ করতে অস্ত্র হাতে ছুটে আসেন লঙ্কার মহারাজা রাবণ–'আজ তোমার রক্ষা নাই সীতা। তোমার কারণে হারিয়েছি প্রিয়পুত্র মেঘনাদ। তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও সীতা।'

রাবণ অস্ত্র তুলে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। বাধা দেন মন্দোদরী–'ছি ছি মহারাজ বধ করে না হে নারী... । বিশ্রবা পিতা তব সংসারে পূজিত। তোমার এ নারী বধ না হয় উচিত। একে দেখ ম'জেছে কনক-লঙ্কাপুরী। পাপেতে ম'জ না তাহে বধ করে নারী।'

মন্দোদরীর এমন কথায় আমি রাবণের অসির আঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। এরপরও আমি ভয়ে ভয়ে রাবণের দিকে তাকালাম। আমার সেই চাহনি দেখে রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলে উঠে এমন ভঙ্গি করে অশোক কানন পরিত্যাগ করলেন যে, শঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠল।

সহসা অশোক কাননের বন্দিত্বের মধ্যে লঙ্কার চারদিকে যুদ্ধের প্রচ তা অনুভব করতে পারি।

শুনলাম– রাবণ নিজেই এবার যুদ্ধে রওনা দিচ্ছেন।

তার দীপ্ত পদভারে, যুদ্ধের বাদ্যধ্বনিতে স্বর্ণলঙ্কাপুরী যুদ্ধের উন্মত্ত ধ্বনিতে যেন নেচে উঠেছে।

সুরমা এসে বলেন– সীতাদেবী, শুনেছেন আপনি–ওই কীসের ধ্বনি?

আমি বললাম– কীসের?

সুরমা বললেন– মহাবীর রাবণ এবার নিজেই যোদ্ধার বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে রউনা দিয়েছেন।

সুরমার বাক্যে আমার মনেও শঙ্কা এসে দোলা দেয়। না জানি এবার কী হয়! না জানি কোন মায়ায়, কোনো ভয়ঙ্কর শক্তির বলে তিনি শ্রীরামকে পরাস্ত করে ফেলেন।

কিন্তু একটা প্রত্যয়, একটা সাহস শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার সবসময় আছে... আমি তাকে চিনি সেই স্বয়ম্বরা সভা থেকে... হরধনুভঙ্গের সেই শক্তিমান রামের সাথে কে পারে যুঝিতে, তার সারল্য-সততা-নিষ্ঠা, পিতৃমাতৃভক্তি, পত্নী প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহের শক্তির কাছে এসে জগতবাসী যেখানে নতজানু হয়ে পড়ে সেখানে কেউ তাকে যুদ্ধে হারাতে পারে না, পারবে না। মনে মনে আমি সুচিন্তার মোহ নিয়ে সুখস্বপ্ন রচনা করি, এইবার যুদ্ধের সমাপ্তি হবে, কেননা লঙ্কার শেষ যোদ্ধা রাবণ নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এ সময় হঠাৎ যুদ্ধের ডামাডোল থেমে যেতে শুনি। তার বদলে রাবণ পত্নী মন্দোদরীর 'হায় হায়' হাহাকার ধ্বনি অশোক কাননের দিকে এগিয়ে আসে। তিনি আমার একেবারে সম্মুখে বলেন–

–এই লো পোড়ামুখী, তোর কারণে, শুধু তোর কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে লঙ্কার শেষ যোদ্ধা শেষ মহাবীর শেষ মহারাজা আমার স্বামী রাবণ নিহত হয়েছেন। আমার সতীত্বের দোহায়, কী ভেবেছিস তুই! আমি বিধবা হলাম আর তুই স্বামী লয়ে সুখী হবি! হায় স্বামী তুমি কোথায়! আমায় একা রেখে তুমি পালালে কোথায়!

আলুথালু কেশে সকলহারা ঘোরলাগা উন্মাদিনীর মতো কথা বলে মন্দোদরী চলে যান। আর আমি রাবণ নিহত হবার সংবাদে সত্যি সত্যি সুখস্বপ্ন রচনার সাহস খুঁজে পায়। এবার অশোক কাননের বন্দিত্বের দশা ঘুচে যাবে। এক্ষুনি ঘুচে যাবে। কেননা, শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন, রাবণ আজ সবংশে পরাস্ত। শুধু পরাস্ত নয়, তিনি তার মায়ার জীবন হারিয়েছেন, মানে যুদ্ধে নিহত হয়ে প্রবেশ করেছেন যমালয়ে।

হায় রাবণ! তুমি জানতে না– কোন সতী নারীকে হরণ করেছিলে! আজ নিশ্চয় মৃত্যুপুরীতে গিয়ে অন্তরে অনুভব করছো– কী বৃথা পরিশ্রম তুমি করেছো! কী পেলে তুমি! তোমার সব গেল জলাঞ্জলিতে– রাজ্যত্ব, সিংহাসন, সন্তান, সংসার, এমনকি নিজের জীবনটাকেও তুমি রক্ষা করতে পারলে না– এই ভব সংসারে।

হায় রাবণ! তুমি তোমার বীর ও শক্তিমান সকল সন্তানকে একে একে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলে। কিন্তু তাদের কেউই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরে আসতে পারেনি। কী করে পারবে বলো– তারা যে স্বয়ং শ্রীহরি রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। হা হা হা। তারা সবাই আজ মহাপরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পরাস্ত হয়ে দেহ রেখেছেন, অবস্থান নিয়েছেন মৃত্যুপুরীতে। কেবল তোমারই এক অন্যায় জেদের বশবর্তী হয়ে তারা প্রাণ হারিয়েছে, তুমিও হারালে প্রাণ! হায় রাবণ! তোমার ব্যর্থ প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে সারা জগতের মানুষ জানতে পারলো– অসৎ কার্যের পরিণতি কেমন ভয়ঙ্করই না হয়! এখন আমার আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, জগতবাসী তোমার ওই ব্যর্থ-কার্যের ভেতর দিয়েই দেখে নিলো– এই আমার প্রতি আমার পতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমের প্রগাঢ়তা।

এই আমি সীতা– সাধ্বী এক নারী, শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী। ভাবতে খুব ভালো লাগে– আমার জন্যে, শুধু এই আমার জন্য– আমার প্রভু, আমার শ্রীহরি শ্রীরামচন্দ্র দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় এসেছেন, এবং এই আমাকে উদ্ধার করার জন্য মহাবীর রাবণের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে জয় লাভ করেছেন।

এমন দৃষ্টান্ত কী আর পৃথিবীতে আছে– আর কোনো পুরুষ তার অপহৃতা স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছেন দিকবিদিক, এমনকি সে পুরুষ তার প্রিয়তমা স্ত্রী অন্বেষণের পথে পেলেন দুর্লঙ্ঘ্য এক সমুদ্র। তিনি জানতে পারলেন ওই সমুদ্রবেষ্টিত দেশেই অন্তরীণ রয়েছে তার অপহৃতা স্ত্রী। অমনি তিনি সেই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে ছুটে গিয়েছেন তাকে উদ্ধারিতে সমুদ্রঘেরা সেই দেশে। আমার স্বামী শ্রীরামচন্দ্র আমার জন্য তা-ই করেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর অপহৃতা স্ত্রী এই বন্দিনী আমাকে উদ্ধার করে নেবার জন্য যুদ্ধ করেছেন।

এমন দৃষ্টান্ত কি আর আছে? সীতা উদ্ধারের জন্য স্বামী শ্রীরামচন্দ্র যা করেছেন?

এমন কথা আমি এর আগে কোনোদিন শুনিনি তাই বুঝি মনের গভীরে খুব আনন্দ হচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্র যে আমার জন্য অপূর্ব এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

আজ আমার অন্তরে এই আনন্দ এসে কেবলই বলে চলছে– ওগো সীতে, সীতাদেবী, এইবার তোর সঙ্গে তাঁর অশেষ মিলন সম্ভব হবে।

বারবার মনে মনে বলি– তাই যেন হয়। পিতৃবাক্য রক্ষায় শ্রীরামচন্দ্র যখন চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে এসেছিলেন তখন আমি হয়েছিলাম তাঁর সহগামিনী, তারপর কত বন, কত মুনি আশ্রম, কত নদী, কত কত ঘটনায় অতি□ান্ত হলো এতটা বছর... এর মধ্যে রামচন্দ্রের চৌদ্দ বছরের বনবাস জীবন পূর্ণ হয়েছে। তিনি নিশ্চয় আমাকে নিয়ে বিজয়ীর বেশে স্বগৌরবে ফিরে যাবেন অযোদ্ধায়।

এতদিনেও মিলনের অনাবিল আনন্দ আমার জীবনে আসে নাই। স্বয়ম্বরাসভা, বিবাহ, শ্বশুরালয়ে গমন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বনবাস, এ বন সে বন করতে করতে যখন পঞ্চপটি বনে এসে একটুখানি সুখের নীড় রচনার সুযোগ তৈরি হয়েছিল ঠিক তখনই অপহৃতা হলাম, বন্দিনী জীবনে পড়ে রয়েছি এই অশোক কাননে। এখন আপনারাই বলুন, এত কিছুর মাঝে কবে আমি পেয়েছি স্বামী রামচন্দ্রকে একান্তভাবে!

এখন আমার জীবনের সকল বিপত্তির অবসান ঘটেছে। রামচন্দ্র যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। এবার কেবল সেই তাঁর সঙ্গে আমার মধুর মিলনের অপেক্ষা। জানি অনেক অনেক দিনের অপেক্ষার পালা আজই শেষ হবে। একটু পরেই শেষ হবে।

মনে মনে ভাবতে ভালো লাগে, যিনি আমার জন্য সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় এসেছেন, যুদ্ধ করেছেন, বিজয় লাভ করেছেন, তিনি নিশ্চয় ছুটে এসে আমার কাছে বিজয়ের মালা চাইবেন। যদি তা-ই চান তখন কোথায় পাবো আমি তাঁর গলায় পরিয়ে দেবার বিজয়মালা? কোথায়!

ওহে অশোক কানন, তুমি বলে দাও আমার বিজয়ী রাজাধিরাজের জন্য বিজয়মালা কোথায় পাই? আচ্ছা, বিজয়মালার রঙ কি হয়?

মনের ভেতর থেকে উত্তর পাই– নিশ্চয় সূর্য লাল, উদিত সূর্যের রক্তিম আভার মতো লাল। সহসা আমার চোখে পড়ে অশোক কাননের রক্তিম ফুলের দিকে।

ওই তো উজ্জ্বল আলোয় ভাস্বর পারিজাত, ওই তো পলাশের রক্তিম আভা। আজ না হয় ওদের রঙেই মালা গাঁথি আমার বিজয়ী রাজাধিরাজের জন্য।

হে বৃক্ষ পারিজাত, হে বৃক্ষ পলাশ, তোমাদের দেহ থেকে ধার চাইছি অসামান্য কুসুমরাজি, সে কুসুম দিয়ে রামচন্দ্রের বিজয়মালা গাঁথতে বাঞ্ছা করি।

তুলি ফুল নানা জাতি — নিরিবিলি মালা গাঁথি
এ যে তার জয়মালা — সে আসে না যায় বেলা
ফোটা ফোটা নবীন কলি — ভাবছে কখন আসবে অলি

প্রাণবন্ধু এসো চলি — অন্তরে মেলেছি কলি
তার রঙে গাঁথি মালা — এসো এসো রাম চলি
তুলি ফুল নানা জাতি — নিরিবিলি মালা গাঁথি ॥

মালা তো গাঁথা হলো। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এখনও আসছেন না কেন! আর কত দেরি! আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না সামান্যতম অপেক্ষার ক্ষণ।

যিনি একদিন হরধনু ভঙ্গ করে আমাকে জিতে নিয়েছিলেন, আজ তিনিই আবার লঙ্কার যুদ্ধে জয় লাভ করে নতুনভাবে আমাকে জিতে নিয়েছেন, এবার যুদ্ধ ও আমাকে যুগলভাবে জয় করে নেবার আনন্দে তিনি নিশ্চয় অযোদ্ধায় ফিরে সিংহাসনে আরোহন করবেন। আর সিংহাসনের পাশে রাখবেন আমাকে, রাজরানি করে।

কিন্তু তিনি এখনও আসছেন না কেন। তিনি কী জানেন না, তাঁর অপেক্ষায় আমার এই মন বড়ই অধীর-অস্থির আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তুমি এসো হে প্রভু, এসো।

সহসা অশোক কাননের প্রবেশপথে রাজগাম্ভীর্যময় যুগল পায়ের আগমন ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি তাঁকে বিজয়মালা পরিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলাম সেই পদধ্বনির দিকে এবং আবেগে উচ্ছল চোখে বিজয়ী রাজাধিরাজের কণ্ঠে বিজয়মালা পরিয়ে দিতে গেলাম। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে মালা দেবার মুহূর্তে থমকে গেলাম।

না! এতো রামচন্দ্র নয়!

আমার হাতের মালাটি খসে পড়ল মাটিতে।

সামনে তাকিয়ে দেখলাম শ্রীরামচন্দ্র আসেননি। এসেছেন বিভীষণ। তিনি এসেই বললেন–

–হে দেবী সীতা, আমায় নিশ্চয় চিনতে পারছেন– আমি লঙ্কার নতুন রাজা বিভীষণ। আমিই আপনার স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের পরম সুহৃদ।

বিভীষণের মুখে শ্রীরামচন্দ্রের নাম শুনে, তাঁরই আগমন প্রত্যাশী আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ধ্বনি–

–তিনি এলেন না!

বিভীষণ উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন–

–তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

–সুহৃদ বিভীষণ, আমিও পতি বিরহে বড়ই কাতর, চলুন, আর আমার মনে অপেক্ষা সয়ছে না। চলুন।

কিন্তু বিভীষণ বললেন–

–দেবী, আপনাকে অবগাহন স্নানপূর্বক দিব্যাভরণে ভূষিতা হইয়া তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়া বিধেয়।

–না বিভীষণ, না। আমি তাঁর বিরহে এতোই কাতর হয়েছি... আমার পক্ষে স্নান-আভরণে সময় ক্ষেপণ করা সম্ভব নয় বিভীষণ। তাই আমি যেভাবে আছি সেভাবেই তাঁর সান্নিধ্যে যেতে বাঞ্ছা করি। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।

বিভীষণ এবার বেশ দৃঢ়ভাবে বলেন–

–হে দেবী, আপনার স্বামী যেইরূপ বলিয়াছেন আপনাকে সেইরূপ করা উচিত ।

বিভীষণের এ কথাটি শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম । বিষয়টি নিশ্চিত হতে তাই তাকে প্রশ্ন করলাম–

–তবে কী তিনি আমাকে স্নান করে তাঁর সান্নিধ্যে যেতে বলেছেন?

–হ্যাঁ দেবী, এটা তাঁরই নির্দেশ ।

–তাই!

আমি কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলাম । আমার তরঙ্গিত আবেগের মধ্যে কেমন যেন একটা আঘাত এসে লাগল ।

কিন্তু রামচন্দ্রকে দেখার আকাঙ্ক্ষাময় সুতীব্র ঘোরটাকে ওই কথাটা একটুও দোলাতে পারল না, ভেবে নিলাম– এতদিন পর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ জয়ের পর তিনি আমার বন্দিনীর দশা ঘুচিয়েছেন । অতএব তিনি নিশ্চয় আমাকে রাজনন্দিনীরূপে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন । তবে তো একজন পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে আমাকে উত্তম বস্ত্রে এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে যাওয়া উচিত । একথা ভেবে আমি বিভীষণকে তৎক্ষণাৎ বললাম– 'তবে তাই হোক বিভীষণ ।'

এরপর স্নান করে উত্তম বস্ত্রে-অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে আমি উত্তম আচ্ছাদনে আবৃত শিবিকায় আরোহণ করলাম । বিভীষণ সেই শিবিকার সামনে বসে লঙ্কার যুদ্ধ বিধ্বস্ত পথ দিয়ে আমাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন আমার প্রভু রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে ।

রথের সম্মুখে থেকে বিভীষণ
আমাকে নিয়ে যেতে থাকলেন
রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে
এখনই দেখা পাবো প্রাণের সখারে
মনে মনে তাই করি অনুভব
এবার তোমার-আমার বাঁধন
কে ছিঁড়িতে পারে
এইবার অনাবিল আনন্দে
আমরা যাবো অযোদ্ধার রাজত্বে
রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে ॥

যেতে পথে অসংখ্য মানুষের কলরব শুনতে পেলাম–

একজন বললেন– বিদেহরাজনন্দিনী কেমন রূপবতী গো!

অন্যজন বললেন– সেই স্ত্রীরত্ন দেখতে কিরূপ!

আরেকজন বললেন– যাঁর জন্য রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিহত হয়েছেন!

তিনি আরও বললেন– আর ওই লঙ্কার মহাসমুদ্রে যোজন যোজনব্যাপী সেতু নির্মিত হয়েছে!

অপরজন বললেন– রাবণ যে বিবাহিতা নারীকে নিজের করে পাবার জন্য অপহরণ করেছিলেন, তাকে একান্তভাবে পাবার জন্য তাঁর স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিজের সন্তানদের হারিয়ে নিজেও মৃত্যুপুরীতে স্থান নিয়েছেন ।

প্রথমজন বললেন– যাঁর রূপ ও গুণের মোহে শ্রীরাম ছুটে এসেছেন সমুদ্র পেরিয়ে এই লঙ্কায়– সেই নারী কেমন গো! কেমন!

জনগণের এত সব বিস্ময়মাখা প্রশ্নধ্বনির কল্লোল শুনে রামের প্রতি, এমনকি রামচন্দ্র ও আমার প্রেমের প্রতি ভক্তিভাব বড় বেড়ে যেতে থাকল ।

নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবতী মনে হলো– আমি কখনোই শুনিনি পৃথিবীতে আমি ছাড়া অন্য কোনো নারীর জীবনে এমন সৌভাগ্য হয়েছে! হয়েছে কী?

পত্নী হারিয়ে কারো পতি কোনো দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করেছেন কী, দিনের পর দিন যুদ্ধ করে হারানো স্ত্রীকে উদ্ধার করেছেন কী? অন্য কোনো নারীর জন্য অন্য কোনো পুরুষ?

এক সময় শিবিকা এসে রামচন্দ্রের আশ্রয়স্থলের বেশ কাছে এসে থামলো । আমি আড়াল থেকে শুনতে পেলাম বিভীষণ বলছেন–

–মহারাজ সীতা আসিয়াছেন ।

একথার প্রত্যুত্তরে রামচন্দ্রের মুখ থেকে বেশ কিছুক্ষণ কোনো ধ্বনিবাক্য শুনতে পেলাম না । তবে কী রামচন্দ্র আমার আগমন সংবাদ পেয়ে আবেগে বাক্যহারা হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছেন । এই রকম ভাবলাম । সহসা শুনতে পেলাম ।

–বিভীষণ ।

–বলুন প্রভু ।

–সীতা রথ থেকে নেমে আমার কাছে আগমন করুক ।

–তথাস্তু । প্রজাগণ তোমরা দূরে সরিয়া যাও, মহারানি সীতা মহারাজ রামের সমীপে আগমন করিবেন ।

বিভীষণের কথা শেষ হতে না হতেই রাজা-রানির মিলন আশীর্বাদের ঝাঝর বেজে উঠল । সেই ধ্বনিতে চঞ্চল হয়ে উঠল আমার মন । জনগণের কল্লোলও যেন সেই মিলন আশীর্বাদের ঝাঝর ধ্বনির মধ্যে বেড়ে গেল ।

একজন বললেন– আমরা সীতাকে দেখতে চাই ।

অন্যজন বললেন– সীতা আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হোক ।

আরেকজন– সীতাকে দেখতে দাও ।

আমাকে দেখার জন্য জনগণের সেই অধীর আগ্রহ ধ্বনি ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল । বিভীষণ তাই তাদেরকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে দূরে সরিয়ে দিতে তৎপর হলেন । কারণ, প্রজাগণের ভিড় ছাপিয়ে দীর্ঘদিনের বন্দিত্বে দুর্বলা আমার পক্ষে

রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে পৌঁছানো অসম্ভব। তাই তো বিভীষণ চেষ্টা করছিলেন, আমি যেন নির্বিঘ্নে, নির্দ্বিধায় রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হতে পারি। কিন্তু অকস্মাৎ আমার কানে রামচন্দ্রের বজ্রকণ্ঠ ভেসে এলো–

–বিভীষণ, বিভীষণ।

–জী প্রভু।

–কি জন্য আমাকে অবজ্ঞা করে তুমি এদেরকে কষ্ট দিচ্ছো।

–প্রভু!

–আমি বলছি... তুমি এদেরকে কষ্ট দিও না... এদেরকে বেত্রাঘাত করলে তার আঘাত আমার মন-শরীরে এসে লাগে বিভীষণ, কেননা এরা আমারই স্বজন।

এরা আমারই স্বজন! আমার থেকেও বেশি আপন! আমাকে কাছে পেয়েও আমার প্রতি কোনো আগ্রহ না প্রকাশ করে রামচন্দ্র এমন কথা বলতে পারলেন!

আমি রামচন্দ্রের মুখে এমন বাক্য শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। মনের মধ্যে কেন জানি না এবার এক ধরনের অপমানবোধ এসে আঘাত করতে থাকলো– যিনি আমার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করতে পারেন সেই তিনি আজ আমার চেয়ে অধিক স্বজন ভাবছেন জনগণকে!

পরক্ষণেই মনের বেদনা বিদূরিত হলো– লঙ্কা সমুদ্র রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন, আমার জন্যে যুদ্ধ ইত্যাদি কর্মের দিকে তাকিয়ে। আমার অন্তরে আনন্দ জেগে উঠল– তিনিই তো আমাকে আজ জয় করে নিজের কাছে ডেকে এনেছেন! অতএব আমার আর দুঃখ কী!

আমার সে আনন্দ অনুভবের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র উচ্চস্বরে বিভীষণকে বললেন–

–বিভীষণ, তুমি নিশ্চয় জানো, প্রজাগণ রাজার পুত্রসদৃশ।

বিভীষণ বললেন– জানি প্রভু।

রামচন্দ্র বললেন– অতএব কৌতূহল আ□ান্ত এই জনগণের সকলেই তাদের মাতাকে অবলোকন করুক।

রামচন্দ্র এটুকু বলেও থামলেন না, তিনি আরও বললেন–

–বিভীষণ, তুমি আরও জেনে রাখো– গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর, সৎকার্য এবং অন্য সকল রাজকৃত সম্মান স্ত্রীলোকদের আবরণ নয়, কেবল সৎস্বভাবই স্ত্রীলোকের আবরণ।

কেবল সৎস্বভাবই স্ত্রীলোকের আবরণ! তবে রামচন্দ্র আমার সৎস্বভাব নিয়ে সন্দেহ করছেন! রথের ভেতর বসে আমার মনের মধ্যে এ প্রশ্নটি জেগে উঠল। সহসা শুনতে পেলাম বিভীষণ রামচন্দ্রের কথাটাকে উপেক্ষা করে আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি ফেরাতে চাইলেন।

–প্রভু, সীতা দেবী এখনও শিবিকায় বসিয়া রহিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় আপনাকে দেখিবার জন্য অধীর হইয়া রহিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁর অধীরতাকে শান্ত করুন।

কিন্তু রামচন্দ্র বললেন–

–বিভীষণ, এই যে অসংখ্য জনগণ, এরাও কিন্তু সীতাকে দেখার জন্য অধীর হয়ে আছে।

–প্রভু!

রামচন্দ্র এবার সমুদ্র-জলোশ্বাসের মতো তীব্রতায় বলে চললেন–

–বিপদকালে, বিবাহ, কন্যাদর্শন, পরীক্ষা সভা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলাদের দর্শন সর্বলোকসিদ্ধ।

এমন কথায় বিভীষণ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন–

–অদ্য এই মুহূর্তে এই সকল কথা কেন বলিতেছেন প্রভু!

বিভীষণের কথার উত্তরে রামচন্দ্র বললেন– 'কারণ আছে, তুমি জানো না বিভীষণ, যুদ্ধের বিষয়ীভূতা সীতাদেবী এই আমার সমীপে এখন মহাবিপদের মধ্যে অবস্থান করছেন। সুতরাং তাকে দর্শন করতে কারো দোষ নেই। অতএব বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে রথ ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে আমার নিকট আগমন করুক। রাজ্যের সকল প্রজা এবং বানরগণ তাকে অবলোকন করুক। তুমি তাকে রথ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে আমার সামনে আসতে বলো।'

রথের ভেতর বসে আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল– এমন কথা রামচন্দ্র বলতে পারলেন!

আমি যুদ্ধের বিষয়ীভূতা হলেও রাজনন্দিনী, তাঁরই স্ত্রী। আমার তিনি যুদ্ধ জয়ে করে আজ উদ্ধার করেছেন রাবণের বন্দীবৃত্ত থেকে। তিনিই তো আমাকে আগে প্রত্যক্ষ করবেন, সবার আগে, এই তো আমি ভেবেছি এতক্ষণ। অথচ এই আমাকে কি-না তিনি নিজ চোখে দেখার আগেই সবার সম্মুখে প্রকাশিত হতে বলছেন! কিন্তু কেন!

আবরণ-আভরণের আড়ালে থেকে শিবিকা-রথের ভেতর বসে শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে আমি আমি এ রকম উত্তরহীন প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হতে থাকলাম– কেন তিনি এখনও আমার দিকে এগিয়ে আসছেন না, আমাকে উদ্ধার করার জন্য যে তিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছেন, যুদ্ধ করেছেন সেই তিনি কেন আজ আমাকে কাছে পেয়ে দেখবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন না!

আমার এ রকম উত্তাল ভাবনার মধ্যে বিভীষণ শিবিকার পাশে এসে বললেন–

–হে দেবী সীতা, আপনার স্বামী আপনাকে শিবিকা থেকে নেমে আপনাকে তার সাক্ষাতে যেতে বলেছেন।

বিভীষণের একথার উত্তরে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। সুগভীর □ন্দনে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হতে চাইলো।

বিভীষণ তার কথার কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে আবার বললেন–

–সীতা দেবী শুনেছেন– আপনার স্বামী আপনাকে শিবিকা হতে নেমে তার সান্নিধ্যে যেতে আদেশ করেছেন।

আমি কান্না ভরাক্রান্ত রুদ্ধকণ্ঠে বললাম– ‘ঠিক আছে, আমি তাই করছি।’

নিজেকে কিছুটা সংযত করে শিবিকা-রথ থেকে নেমে আমি সবার সামনে দিয়ে প্রিয় পতি রামচন্দ্রের সামনে এগিয়ে যেতে থাকলাম। এই মুহূর্তে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অভিমানবশত শত চেষ্টা করেও আমি আমার দুই চোখের অশ্রুধারাকে সংবরণ করতে পারলাম না। তাই অশ্রুপূর্ণ মুখে বিশাল জনসভামধ্যে লজ্জায় নত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম।

তিনি নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একেবারে কাছে পেয়েও তিনি একবারের জন্যেও আমার দিকে চোখ তুলে ফিরে তাকালেন না। এও কী সম্ভব!

আমি অবাক হলাম– শ্রীরামচন্দ্র, আমার স্বামী এক দুস্তর যুদ্ধ জয়ের জয়ের পর এই প্রথম আমাকে কাছে পেলেন। কিন্তু কাছে পেয়েও তিনি আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন না, কথা বলছেন না!

কিন্তু কেন?

মনের গভীর থেকে এমন প্রশ্ন জেগে উঠতেই আমি তাঁর চোখের দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম তাঁর চোখের গভীরে কিসের যেন একটা ক্ষোভ-ক্রোধ জ্বলজ্বল করছে।

সহসা তিনি তাঁর চোখের জল সংবরণে ব্যস্ত হলেন। তাঁর চোখে জন দেখে আমার মনটা ভরে গেল, আমি খুশি হয়ে আরও গভীরভাবে তাঁর চোখের দিকে তাকাতে চাইলাম। তাঁর মনের গভীরে প্রোথিত সত্যকে পাঠ করতে চাইলাম। কেননা, আমি তো জানি– মানুষের বুকের কথা মনের কথা মুখে আসার আগে চোখে প্রকাশ পায়।

কিন্তু হায়! তাঁর চোখের মণিতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম– এই হতচেতনা অতিশয় দুঃখিতা, অনাথার ন্যায় চিন্তিতা, রাবণ কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃতা, অবরোধে উৎপীড়িতা, অতিকষ্টে জীবনধারণকারিণী, যেন যমালয় হতে আগতা, শূন্য আশ্রম হতে অপহৃতা, শুদ্ধচেতা পাপরহিতা এই সীতার প্রতি তাঁর কোনো মমতায় আজ আর অবশিষ্ট নেই।

তিনি আমার সাথে কোনো কথাই বললেন না। আমি ক্ষোভে দুঃখে জনসভা মধ্যে অশ্রুপূর্ণ চোখে ‘হা আর্যপুত্র, আর্যপুত্র!’ বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অসহায় এক কান্না আমাতে আশ্রয় করল। সে কান্নায় কাঁদল বনের সঙ্গী বানরগণ, এমনকি উপস্থিত সকল শ্রেণীর জনগণ, প্রকৃতি, হয়তো নদীর মিঠাপানির স্রোতধারা আমার কান্নার আবেগ নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে নোনা হয়ে গেল, এরপরও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে আমার জন্য কোনো পরিবর্তন দেখলাম না।

আমি লক্ষ করলাম তাঁর পাশেই দাঁড়ানো দেবর লক্ষ্মণ চোখ মুছলো। কিন্তু রামচন্দ্রের চোখে মুখে আমি কী যেন একটা সন্দেহ-ক্ষোভের আগুন দেখতে পেলাম।

সাহস ভরে আমি লজ্জা ত্যাগ করে অন্তরে ধৈর্য ধারণ করলাম। দুচোখের অশ্রু রোধ করে বিস্ময়, হর্ষ, স্নেহ, ক্রোধ এবং ক্লান্তির মধ্যে নানাভাবে স্বামীর মুখোমণ্ডল দর্শন করতে লাগলাম।

এবার শ্রীরামচন্দ্রের মনের ভেতরের ক্ষোভটা যেনবা দ্বিগুণ জ্বলে উঠল। তিনি ভীষণ ক্রোধের স্বরে বললেন–

–সীতা, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাত হতে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ-বলে একজন পুরুষের যা করতে হয় তা-ই করেছি। এখন আমার ক্রোধের অবসান হয়েছে, শত্রুর সকল পরাভবের প্রতিশোধ আমার নেওয়া হয়েছে; আমি অপমান ও শত্রু দুই-ই যুগপৎ সমূলে উৎপাটন করেছি।

আমি এই কথার মধ্যে মুগ্ধতা প্রকাশ করে বললাম–

–এখন ভুবনে তোমার সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি বললেন– শুধু তাই নয় সীতা, আজ আমার পরাক্রম প্রদর্শিত হয়েছে, পরিশ্রম সফল হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে এবং এখন আমি আমার নিজের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছি।

মনে মনে আমি তাঁকে প্রণাম করি। আর তিনি তাঁর মনোগত কথা বলে চললেন এইভাবে–

–রাবণ কপটরূপ ধারণ করে আমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে অপহরণ করায় আমার উপর যে অপবাদ পতিত হয়েছিল তা আজ দূর করেছি।

–এখন নিশ্চয় তোমার মনের গভীরে খুব আনন্দ জাগছে?

তিনি বললেন– ‘না সীতা, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমাকে নির্বিঘ্নে আমার মনোগত কথা বলতে দাও। এতটা আবেগে চঞ্চল হয়ো না সীতা!

–বলো, এই মন কেন চঞ্চল হবে না! তুমি আমাকে উদ্ধার করে পৃথিবীতে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছো। তাহলে আমি কেন আনন্দে চঞ্চল হবো না!

তিনি বললেন– ‘একটু ধীরে সীতা, একটু ধীরে। একথা ঠিক যে, হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় অগ্নিদহন ইত্যাদি, সকল কিছুই আজ সফল হয়েছে। বানরসৈন্যগণের সাথে আমাদের হিতমন্ত্রণাদাতা ও যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশকারী সুগ্রীবের পরিশ্রম আজ সার্থক হয়েছে। এবং যিনি গুণহীন ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে স্বয়ং আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই বিভীষণের পরিশ্রমও আজ সফল হয়েছে। সেই সঙ্গে এও ঠিক যে...

এই পর্যন্ত বলে তিনি কেন যেন একটুখানি থামলেন। আমি তাঁর কথার মর্ম বোঝার চেষ্টা না করে তাঁর প্রতি ভক্তি অর্পণ করি আবেগে ও কৃতজ্ঞতায় গড়িয়ে পড়া চোখের জলে।

কৃতজ্ঞতায় নতজানু হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করি। কিন্তু আজ তাঁর আশীর্বাদের হাত আমার মাথায় এসে স্পর্শ করে না। বরং তাঁর চোখ ও কণ্ঠ যেন একসঙ্গে দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলে উঠল। তিনি বললেন–

–সীতা! পরাভব দূর করার জন্য মনুষ্যের যা কর্তব্য, তোমাকে উদ্ধার করে আমি সেই সম্মান রক্ষার কার্যই করেছি। তুমি জেনে রাখো, আমি ক্রোধবশত বন্ধুগণের সাথে এই যে সমর-পরিশ্রম স্বীকার করেছি তা তোমার জন্য নয়।

–প্রভু!

আমি বিস্ময়ে তাঁর চোখে ফিরে তাকাই। তিনি আরও দৃঢ়ভাবে বলেন–

–হ্যাঁ, তা তোমার জন্য নয় সীতা। তোমার জন্য নয়। আমি যা করেছি তা আমার নিজের বীর চরিত্র রক্ষার জন্য করেছি, তোমার অপহরণজনিত চারদিকে বিস্তৃত অপবাদ মোচনের জন্য করেছি এবং এও জেনে রেখো, আমি ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুহস্ত হতে তোমাকে উদ্ধার করেছি কেবল নিজের প্রখ্যাত বংশের নিন্দা দূর করার জন্য।

আমি তাঁর ক্রোধ নিবৃত করতে হাত জোড় করে বলি–

–আর নয় প্রভু... আর নয়। আর বলো না এমন কথা...

তিনি যেন আরও জ্বলে উঠলেন–

–কেন বলবো না বলো! তুমি আজ আমার সামনে অবস্থান করে আমার জন্য অতিশয় পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছ।

–আমি তোমার জন্য পীড়াদায়ক হয়েছি! তাহলে এতকিছু করে কেন আপনি আমাকে উদ্ধার করলেন? কেন? কেন?

তিনি বললেন–

–সীতা, তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। তুমি এখন এই দশ দিকের যে দিকে ইচ্ছা গমন কর; তোমাকে আমি বাধা দেবো না। আমি অসংকোচে তোমাকে যেতে দিতে অনুমতি দান করছি।

–এ কী বলছো!

–ঠিকই বলছি! আজ আর তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই।

–এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করছো!

–এটাই তোমার প্রাপ্য।

–না প্রভু, না।

–আচ্ছা, তাহলে তুমিই বলো– উচ্চকুলসম্ভূত কোনো তেজস্বী পুরুষ পরগৃহবাসিনী স্ত্রীকে অবিকৃত চিত্তে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে?

পারে না। তাছাড়া, রাবণ যেহেতু তোমাকে কু-অভিপ্রায়ে স্পর্শ করেছে সেহেতু কেমন করে তোমাকে আমার নিজের উচ্চবংশের পরিচয় দিয়ে পুনরায় গ্রহণ করতে পারি? বলো?

তাঁর এমন প্রশ্নকথায় আমি কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধবাক হয়ে পড়লাম। আমাকে দেখার জন্য আগত জনগণের উচ্ছ্বাস আগ্রহের গুঞ্জন, চিৎকারও যেন থেমে গেল রামচন্দ্রের দ্বিধার কাছে। আমি এক পাথর নীরবতা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রথম ভীষণ আহত অনুভব করলাম, তারপর নিজের ভেতর থেকে সুতীব্র একটি শক্তি এসে কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে দিল। আমি বললাম–

–হে রামচন্দ্র, তুমি কেন মনে করতে পারছো না– তোমার প্রতি আমার সেই মহৎ প্রেমকে, যে প্রেমের অনুসারী হয়ে এই আমি বনবাসে যাবারকালে তোমার সহগামী হয়েছিলাম। কেন হয়েছিলাম? একবার সেই কথা মনে করো দেখো।

না তিনি কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। তাঁকে আমাদের অতীত ইতিহাসের সুমহান দৃষ্টান্ত টেনে বোঝাতে চাইলাম আমাকে পরিত্যাগ করে তিনি অনুচিত কাজ করছেন।

আমি তাঁকে বললাম–

–হে রামচন্দ্র, তোমার চৌদ্দ বছরের বনবাস জীবনের সহগামিনী হয়েছিলাম কেন জানো? তোমার প্রতি আমার চিত্তে ও প্রাণে ছিল সুগভীর এক প্রেম। সেই প্রেমকে তুমি আজ অস্বীকার করতে পারবে হে রামচন্দ্র? কেন আমিও তো উর্মিলা বধূদের মতো রাজগৃহে থেকে তোমাকে ছাড়াই প্রাচুর্যে জীবন কাটাতে পারতাম। কী পারতাম না?

কিন্তু আমি তা থাকতে চাইনি, আমি কেবল চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গসুখ। তাই তো তোমার সঙ্গিনী হয়েছিলাম বনবাসে যাবার কালে।

জানি আমি আমার প্রতিও তোমার প্রেমের কোনোদিন কমতি ছিল না, আমি বিশ্বাস করতে চাই এখনও আমার প্রতি তোমার প্রেমের কোনো কমতি নেই। যে যুদ্ধ করে তুমি লাভ করেছো তা তো আমাকে জিতে নেবার জন্যে... একবার, শুধু একবার এই সত্য প্রকাশ্যে বলে আমাকে তুমি গ্রহণ করে নাও স্বামী, যেইভাবে আমাকে গ্রহণ করেছিলে তুমি স্বয়ম্বরাসভায় সেই মিথিলা নগরে, আজ লঙ্কায় তুমি আবার সেই আমাকে জয়ের আনন্দ নতুন করে উপভোগ করো স্বামী।

কিন্তু না। আমি তাঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হলাম। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বললেন–

–এটা মিথিলা নয় আবার সেই স্বয়ম্বরাসভাও নয়। এটা লঙ্কা সীতা, এটা লঙ্কা। এইখানে যদিও আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি, কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করতে আসিনি।

আমি বললাম– হায় স্বামী! হায় রামচন্দ্র!

আমার হাহাকারের মধ্যে তিনি বললেন–

–আসলে, আমি আমার হারিয়ে যাওয়া যশ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করেছি, সেই যশ আজ আমার উদ্ধার হয়েছে, অতএব তোমার প্রতি আজ আর আমার কোনো আসক্তি অবশিষ্ট নেই, তুমি এখন যেখানে ইচ্ছে গমন করতে পারো।

আমি তাঁর একেবারে সামনে গিয়ে পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বললাম–

–একটুখানি বুদ্ধি স্থির করে কথা বলো স্বামী... বুদ্ধি স্থির করো...

তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথে বললেন–

–আমি অনেক বিবেচনা করে নিশ্চিতভাবেই তোমাকে বলছি, এখন তুমি লক্ষণ বা ভরতের প্রতি বুদ্ধি স্থির কর। লক্ষণ অথবা ভরত এদের মধ্যে যাকে খুশি তাকে তুমি গ্রহণ করতে পারো।

আমার ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল। আমি চিৎকার করে বললাম–

–ধিক প্রভু! ধিক তোমাকে! অতীতেও তুমি একবার এমনটাই বলেছিলে– বনে আসবার কালে যখন আমি তোমার সহগামিনী হতে চেয়েছিলাম তখন।

তুমি বলেছিলে– বনে বড়ো বিপদ সীতা, তুমি অযোধ্যাতেই থাকো।... প্রাণের ভাই ভরত এখন রাজা হয়েছে, তুমি তার সাথী হয়ে অযোধ্যাতেই থাক।

আজ আবার এত বছর পর তুমি সেই পুরানো কথাই বলছো! এই তোমার বিবেচনা!

আমি আজ তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার উচ্চবংশের মান যাবে! আর ভরত-লক্ষণের সঙ্গে থাকলে তোমার উচ্চবংশের মুখ খুব উজ্জ্বল হবে– তাই না প্রভু?

এই তোমার বিবেচনা! ওরাও যে তোমার বংশেই সন্তান, তোমারই আপন ভাই তাও দেখছি তোমার বিবেচনা হতে হারিয়ে গেছে।

শ্রীরামচন্দ্র কিছুটা যেন অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বললেন–

–তাহলে তুমি বানররাজ সুগ্রীব কিংবা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর। তাদের সঙ্গে থাকো।

আমি বললাম–

–হায় রামচন্দ্র! এক রাক্ষসের হাত হতে আমাকে উদ্ধার করে আরেক রাক্ষসের সঙ্গে বসবাসের কথা বলছো! একবার বুকে হাত দিয়ে বলো তো তবে– এতে কি তোমার বীরত্ব, উচ্চবংশের মান অক্ষুণ্ন রইবে? বলো? বলো?

–সীতা...

–বলো?

আমার জিজ্ঞাসায় তিনি এবার নতুন যুক্তি রচনা করে বললেন–

–সীতা, আমি বিশ্বাস করি না– রাবণ স্বগৃহে নিয়ে গিয়ে তোমার মতো অলৌকিক রূপবতী মনোহারিণী তরুণীকে ক্ষমা করেছে। তাই আমি অনেক বিবেচনার পর তোমাকে কথাগুলো বলেছি। এখন তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করে জীবনীপাত করতে পারো।

–হায় আর্যপুত্র!

লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে এলো। আমি নিজের ভেতরে নিজে অস্থির এক যন্ত্রণা বোধ করলাম। দু চোখের অশ্রুতে ভেসে গেল আমার মুখমণ্ডল।

আমার প্রতি রামচন্দ্রের সুতীব্র ঘৃণা, ক্রোধ আর অবজ্ঞা আমাকে সীমাহীন যন্ত্রণায় কাতর করল। আমি শ্রীরামচন্দ্রের অপবাদ আঘাতে নিজের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক শক্তি উত্থিত করে বললাম–

–তুমি কি সত্যি সত্যি আমাকে নটীর মতো অন্যের নিকট দান করতে ইচ্ছা করছো? তুমি ভুবনজয়ী বীর, আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু হে বীর! নীচজাতীয়া রমণীর মতো আমাকে এমন শ্রবণবিদারক এবং অনুচিত রূঢ়বাক্য শোনাচ্ছ কেন? তুমি আমাকে যেরূপ মনে করছো, আমি সেরূপ নই, আমি তোমার কাছে নিজ চরিত্রের জন্যই শপথ করছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।

জানি আমি, স্ত্রীলোকমাত্রেই সন্দেহের পাত্র, তুমিও সন্দেহযোগ্য স্থলেই আশঙ্কা করছো, কিন্তু তুমি যদি আমার স্বরূপ চিনে থাকো, তাহলে সে আশঙ্কা পরিত্যাগ করো।

হে প্রভু, আমি যে তোমার শত্রুর গাত্রের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হয়েছি, তা আমার ইচ্ছাপূর্বক নয়। আমার অধীন যে মন, তা তোমাতেই রয়েছে। অর্থাৎ আমি এই পবিত্র মনে অন্য কাউকেও চিন্তা করিনি। আমার এই মন থেকে কখনই তোমাকে অতিক্রম করিনি।

হে মানদ, আমার অকপট মন এবং সংসর্গের ফলেও যদি তুমি আমাকে চিনতে না পারো, তাহলে আমি চিরদিনের জন্য নিহতা হলাম।

হে বীর, আমি যখন লঙ্কায় অবস্থান করছিলাম, সেই সময়ে তুমি আমার অন্বেষণার্থ হনুমানকে প্রেরণ করেছিলে, তখনই কেন আমাকে পরিত্যাগ করো নাই। আর সেই পরিত্যাগ বার্তা শ্রবণ করে আমি বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের সম্মুখে তোমার পরিত্যক্তা জীবনকে বিসর্জন করতাম, তাহলে আর তোমাকে এতসব জীবনসংশয়কর বৃথা শ্রম করতে হতো না এবং বন্ধুগণেরও এই নিস্ফল কষ্ট করতে হতো না।

হে নরশার্দুল, তুমি ক্রোধান্বিত হয়ে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় (আমার) কেবল স্ত্রীত্ব বিবেচনা করলে। তুমি আমার আচরণ এবং স্বভাব কিছুই সমর্থন করলে না।

তুমি বাল্যকালে আমার বালিকা অবস্থায় পাণিগ্রহণ করেছো, তাও (পরিত্যাগ করবার সময়ে) বিবেচনা করলে না, এবং আমার সচ্চরিত্রতা ও তোমার প্রতি আমার ভক্তিভাব ও প্রেমকে অবহেলা করলে।

আমার এই সুদৃঢ় কথার মধ্যে রামচন্দ্র কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। তার মন একটুও চঞ্চল হলো না আমার কথা শুনে। তিনি নিষ্ঠুর ব্যক্তির মতো ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে নিজের ভেতর নিজে ফুসতে থাকলেন। অগত্যা আমি দেবর লক্ষণকে ডেকে বললাম–

–লক্ষ্মণ, আমার জন্য চিতা রচনা কর, আমি মিথ্যা অপবাদগ্রস্তা হয়ে জীবন ধারণ করতে ইচ্ছা করি না। যে স্বামী আমার গুণে অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি (আজ) যখন জনসভামধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করলেন তখন আর আমার কী রইলো লক্ষ্মণ! তাই তুমি আমার জন্য চিতা প্রস্তুত করো।

শ্রীরামচন্দ্র আমার একথায় বিদ্যুৎগতিতে এমনভাবে ফিরে তাকালেন যেন আমার মুখ থেকে এমন একটি কথা শোনার জন্যেই তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাই আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন–

–লক্ষ্মণ, জ্বালো চিতা।

শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এমন কথা শুনে লক্ষ্মণ চমকে উঠলেন।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বজ্রকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলে চললেন–

–রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার জন্য চিতাই হচ্ছে যথার্থ স্থান। অতএব জ্বালো চিতা। আর সেই চিতাই হোক সীতার শেষ আশ্রয়।

–দাদা, আপনি কী উন্মাদ হয়ে গেছেন!

–লক্ষ্মণ, এটা সীতার অভিপ্রায় । আমি তোমাকে সীতার অভিপ্রায়কেই বাস্তব করে তুলতে নির্দেশ করেছি । আমি জানি তুমি কখনই আমার নির্দেশকে অবহেলা করোনি । আশা করি আজও তা করবে না ।

রামচন্দ্রের নির্দেশে দেবর লক্ষ্মণ আমার জন্য চিতা প্রস্তুত করল । আমি দেখতে পেলাম ধেই ধেই করে আগুন জ্বলে উঠেছে । আর সে আগুনের শীর্ষ ভাগ যেন সুদূর আকাশকেও দহন করার জন্য বিষাক্ত সাপের মতো জিহ্বাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বারংবার লাফাতে থাকলো ।

আমি সে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতকে এক মুহূর্তের তরে দিব্যমান দেখতে পেলাম । তাই তো স্বয়ং অগ্নিদেবকে উদ্দেশ করে বললাম–

আমি প্রকাশ্যে অথবা গোপনেও সর্বদা নিজের কথায়-কাজে-কর্মে, আর এই অবিনশ্বর শরীরে কোনোদিনই শ্রীরামচন্দ্রকে অতিক্রম করিনি, আমার এই মন কখনই রামচন্দ্র হতে বিচলিত হয়নি, শুধু এই জন্য হে অগ্নি এই লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন । তাছাড়া, হে অগ্নি, আপনি সমস্ত প্রাণীর শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান করেন, অতএব আপনিই আমার শরীরের সকল কিছুর সাক্ষী; আপনি আমাকে রক্ষা করুন ।

আমার ভাবান্তর বুঝে উপস্থিত জনতার মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠল ।

কেউ বললেন– শ্রীরামচন্দ্র এখনও নির্বিকার থাকবেন! শ্রীমতী যে সত্যি সত্যি আগুনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন!

অন্যজন বললেন– প্রভু রামচন্দ্র এখনও কেন তার ক্রোধ প্রশমিত করছেন না!

অনন্তর আমি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করত আগুনে প্রবেশে উদ্যত হতেই দেবর লক্ষ্মণ এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন–

–মাতো, তুমি যদিও আমার ভ্রাতৃ বধূ তথাপি তোমাকে কোনদিন ভাবী বা বৌদি বলে সম্বোধন করিনি । তাছাড়া, সেই বনে আগমনকালে যখন তুমি এই শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গী হয়েছিলে তখন আমিও তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম । সে সময় বাড়ি থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে আমার গর্ভধারিণী মা সুমিত্রাদেবী আমাকে কী বলে দিয়েছিলেন তা কি তোমার মনে নেই?

মাতা সুমিত্রা আমায় বলেছিলেন– প্রতি মুহূর্তে আমি যেন তোমাকে মায়ের মতো ভক্তি করি, মায়ের মর্যাদা দিয়ে দেখে রাখি । এখন সেই তুমি যদি আগুনে আত্মাহুতি দাও তাহলে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে মাতা সুমিত্রাকে কি বলবো আমি? বলো?

তাই আমি কিছুতেই তোমাকে চিতায় আত্মাহুতি দেবার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না ।

আমি দেবর লক্ষ্মণের উক্তিতে শান্ত্বনা দিতে আমার পূর্বাপর ইতিহাস বলতে শুরু করি–

–দেবর লক্ষ্মণ, তুমি বৃথায় আমার জন্য চিন্তা করছো । এর আগেও বহুবার আমি জ্বলন্ত অগ্নির চেয়েও আরও জ্বলন্ত ভয়ঙ্কর অগ্নির ভেতর দিয়ে বহু পথ পাড়ি দিয়ে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি ।

লক্ষ্মণ, তুমি আমার জন্মের কথা বিবেচনা করো, জনকরাজের হলকর্ষনে লাঙ্গলের ফলায় ভূমি থেকে আমার জন্ম...

কিন্তু কেমন করে আমি ভূমিতে আশ্রয় করেছিলাম, তা কি জানো লক্ষ্মণ?

জানো না, তাই বলি শোনো, এক জন্মে আমি তপস্যায় ছিলাম বিষ্ণুকে বর হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ।

এই জন্মে তা আমি পেয়েছি– কে না জানে ওই তো আমার স্বামী রামচন্দ্র বিষ্ণুর আকৃতি মাত্র । এই বিষ্ণুর আরাধনায় আমি যখন হিমালয়ে কাছে তপস্যারত ছিলাম তখন একদিন সেখানে উপস্থিত হলেন ভুবন জয়ী বীর রাবণ । তিনি সৌন্দর্য মোহিত হয়ে আমাকে কামনা করে বসলেন এবং জোরপূর্বক ভোগ করতে চায়লেন, অমনি সামনের জন্মে আমি তাকে বধ করার জন্য কন্যা হয়েই জন্ম নেবার অভিশাপ দিয়ে অনলে প্রবেশ করেছিলাম । সেই আমার প্রথম অগ্নিদহন ।

পরে আমি একটি পদ্মফুল থেকে কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করি । আবার আমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে রাবণ আমাকে এই লঙ্কায় নিয়ে আসেন ।

লঙ্কার ভবিষ্যত বক্তা মন্ত্রীগণ আমাকে দেখে রাবণকে বললেন– 'এই কন্যা থাকলে বিপদ হবে । রাবণ, একে ভাসিয়ে দাও জলে ।'

তাই রাবণ আমাকে সাগরজলে ভাসিয়ে দিলেন । আর আমি সাগরজলে ভাসতে ভাসতে একসময় আশ্রয় গ্রহণ করি জনকরাজের যজ্ঞভূমিতে ।

তারপর জনকরাজের লাঙ্গলের ফলায় এই আমার বর্তমান রূপের আবির্ভাব । বয়স বাড়তে না বাড়তেই আমার রূপের কথা রাষ্ট্র হলো চারদিক । বাবা জনকরাজ চিন্তিত হলেন, আমার মতো রূপবতী কন্যাকে কার সঙ্গে বিবাহ দেবেন? অগত্যা তিনি বুদ্ধি স্থির করলেন, যে ব্যক্তি হরধনুতে জ্যা স্থাপন করতে পারবেন তার সঙ্গেই তিনি আমার বিবাহ দিবেন ।

এমন ঘোষণা রাষ্ট্র হলো দিকে দিকে । বহু দেশ থেকে বহু রাজা আসতে থাকলেন মিথিলা নগরে । সবার লক্ষ্য হরধনুতে জ্যা স্থাপন করে আমাকে গ্রহণ করা । শত শত রাজপুরুষের আগমনধ্বনিতে, অহংকারের উচ্চবাক্যে ভয়ে ও শঙ্কায় আমার বুকে সীমাহীন কাঁপন উঠল– না জানি কে আমায় জয় করে নেন, সে জন উত্তম হতে পারেন আবার অধমও হতে পারেন । আমি জানতাম না আমাকে কে জয় করে নেবেন ।

সেদিন স্বয়ম্বরা সভায় দশমাথা রাবণও বিশ হাত তুলে অহঙ্কার করে বলেছিলেন– আমার দশ মাথা বিশটি হাত পৃথিবীতে ওই কন্যাতে কেবল আমার অধিকার, আমার চেয়ে শক্তিমান আর কে আছে ভুবনে, ধনুকে আমিই কেবল জ্যা স্থাপন করতে পারব ।

বলো লক্ষ্মণ, সেদিন যখন শত শত রাজা-উপরাজা আমাকে জয় করে নেবার জন্য আমার পিতা জনকরাজের গৃহে এসে হরধনুতে জ্যা স্থাপনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন সেদিনও কি আমি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইনি?

সেদিন সেই অগ্নিপরীক্ষায় ধনুকে জ্যা স্থাপন করে মুহূর্তের মধ্যে আমার হৃদয় দহনকারী অগ্নিতে জল ঢেলে দিয়ে শীতল করেছিলেন কিন্তু আজকের এই শ্রীরামচন্দ্র।

আজ যিনি আমার বিমুখ। অবশ্য সেদিনও তিনি হরধনুতে জ্যা স্থাপন করার সাফল্য পেয়ে খুব সহজে আমাকে গ্রহণ করেননি। তাই এখনও কিছু আশা জাগে মনে। বড় আশা জাগে মনে।

কেননা, সেদিন হরধনুতে জ্যা স্থাপন করার পর এই রামচন্দ্র বলেছিলেন– 'যদিও আমি হরধনুতে জ্যা স্থাপন করেছি এবং সীতাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার অধিকার রাখি। কিন্তু আমি আমার পিতা রাজা দশরথের সম্মতি ও উপস্থিতি বিনা সীতাকে গ্রহণ করতে পারি না।

রামচন্দ্রের মুখে এমন কথা শুনে বাড়ির সবাই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। আর মধ্যে আমি নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করলাম।

অতঃপর অযৌদ্ধা থেকে রাজা দশরথকে মিথিলায় আনা হলো। তিনি এসেই বললেন– 'রামচন্দ্র ছাড়াও আমার আরও তিনটি পুত্র রয়েছে– ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। আমি চারটি সন্তানকে একই পরিবারে বিবাহতে বাঞ্ছা করি। জনকরাজের কন্যা কয়টি?'

আমার পিতা জনকরাজ বললেন– 'সীতা ছাড়া আমার আর একটি মাত্র কন্যা আছে ঊর্মিলা।'

রাজা দশরথ বললেন– 'তাহলে রামচন্দ্র হরধনুতে জ্যা তুললেও এ বিবাহ হবার নয়। আমি আমার চারটি সন্তানকে একই পরিবারের চারটি কন্যার সাথেই বিবাহ দিবো।'

মুহূর্তের মধ্যে আমার বিবাহের আসর অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত হলো।

–এ কী বলছেন রাজা দশরথ! চারটি সন্তানকে তিনি একই পরিবারে একই সঙ্গে একই দিনে বিবাহ দেবেন।

শ্রীরামচন্দ্র হরধনুতে জ্যা স্থাপনের পরও আমাকে তাহলে গ্রহণ করে নিতে পারবেন না!

রাজা দশরথকে আমার পিতা বোঝাতে চাইলেন– 'আমার তো আরেকটি কন্যা আছে– ঊর্মিলা। তার সাথে না হয় লক্ষ্মণকে বিবাহ দিয়ে অন্য সন্তান দুটিকে আরেকটি পরিবারে বিবাহ দিলেও তো হয়।'

কিন্তু তাতে রাজা দশরথ রাজি হলেন না। তাঁর একটাই দাবি বাকি দুটি সন্তানের বিয়েও তিনি একই পরিবারে দেবেন, আর তা না-হলে এ বিয়ে হবে না।

রামচন্দ্রের মতো বর হরধনু ভঙ্গ করার পরও যখন এই নারীর বিয়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন কী তাকে অগ্নিপরীক্ষাসম অবস্থা বলা যায় না!

অনেক চেষ্টা করে এবার রাজা দশরথকে বোঝানো চেষ্টা করা হলো– আমার কাকা কুশধ্বজের দুটি কন্যা আছে– মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি, তাদের সাথে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলে তো একই পরিবারেই চারটি সন্তানের বিবাহ দেওয়া হয়। এবার রাজা দশরথ সন্তান রামচন্দ্রকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হলেন। আমার জন্য সূচনা হলো আরেক নতুন অগ্নিপরীক্ষার। তোমার মনে আছে রামচন্দ্র, আমি তোমাকে তোমার বা-মা, ভ্রাতা-ভগ্নিকে আপন করার জন্য ফেলে এসেছি আমার বাবা-মা এবং পরিচিত পরিমণ্ডলকে ছেড়ে। এও কী অগ্নিপরীক্ষা নয়? নিজের আপন বাবা-মাকে ত্যাগ করে অন্যের বাবা-মাকে আপনের অধিক আপন করা, নারীরা যা করে থাকে, অন্য এক পুরুষকে আশ্রয় করা, অবলম্বন করার এই যে সাধনা, একে কি অগ্নিপরীক্ষা বলা যায় না, নিজের ভাইয়ের চেয়ে স্বামীর ভাই অর্থাৎ দেবরকে বেশি আপন করতে হয়। আমি তো জানতাম হে প্রভু রামচন্দ্র সংসারের এমনই অগ্নিপরীক্ষায় সিদ্ধ হতে পারলেই নারী জীবনের প্রকৃত সাফল্য আসে, সিদ্ধি আসে। আমি তাই তোমাকে অনুসরণ করে গেছি নারী জীবনের সিদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে। কিন্তু আজ আমাকে আপনি এ কী পুরস্কার দিচ্ছেন ওই ভয়াল অগ্নি জ্বেলে! রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অপহৃত জীবনে প্রতিনিয়ত অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে– প্রতিদিন হাজারো প্রলোভন এবং কামুক পুরুষ রাবণের কামলিপ্সা থেকে নিজের যৌবন ও দেহকে পবিত্র রাখার নাম কি অগ্নিপরীক্ষা নয়? যদি তাই হয় তবে তো জীবনভর আমি বহু রঙের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে এমনই সহনশীল এবং অক্ষয়-অদহিত শক্তি অর্জন করেছি যে, ওই অগ্নি আর আমার কী দহন করবে! তাই ঠাকুর লক্ষ্মণ, তুমি আর আমাকে বাধা দিও না, অনন্ত আমার সতীত্বের পরীক্ষায় আরেকবার আমাকে উত্তীর্ণ হবার সুযোগ দাও লক্ষ্মণ।

আমার সুযোগ দাও হে দেবর লক্ষ্মণ
অগ্নিপথ পার হইবার ॥
জীবনের অগ্নিতে বারে বারে
দুগ্ধ হয়ে পেয়েছি অদাহ্য এমন ॥
ওই আগুনে পুড়বে কি এই দেহ
ভক্তিভাবের যে আগুনে পুড়েছে যে জীবন ॥

সহসা আমি আগুনে প্রবেশ করি। যেভাবে আগুনে প্রবেশ করে সাধকেরা অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান আগুনভাঙার আসরে। আমি তদ্রূপ রক্ষিত হই নিজের জীবনসিদ্ধির ব্যাখ্যায় এবং কার্যের কারণে।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধ বিদূরিত হয় কী? এই প্রশ্ন রেখে সীতার অগ্নিপরীক্ষার সমাপ্তি টানি।

রচনাকাল : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	*লাইন*	*যেভাবে মুদ্রিত হয়েছে*	*শুদ্ধ রূপ*
১৯	২৮	আজও এই ভুখ থেকে	আজও এই ভূখণ্ড থেকে
২৬	৩৩	কুলিকুচি করে...	কুলকুচি করে...
২৭	৫	তার এই কা ও কথায়	তার এই কাণ্ড ও কথায়
৪৩	১৮	শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা চর্যাপদকে বিশে-ষণ করে দেখানো হয়েছে,	শুধু তাই নয়, চর্যাপদকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—
৬২	১৮	কে যায় শ্বেতকেশী দ ধারী লোক।	কে যায় শ্বেতকেশী দণ্ডধারী লোক।
৬৬	১৮	সহসাই প্রচ ক্ষিপ্রতায় উথাল-উচ্ছল ঢেউয়ের	সহসাই প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় উথাল-উচ্ছল ঢেউয়ের
৭৫	১৮	বুদ্ধমন্দির সংলগ্ন নাটম পের	বুদ্ধমন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপের
৮৮	৫	মাথা ঠা া রেখো জেঠা...	মাথা ঠাণ্ডা রেখো জেঠা...
১০০	৬	ঝাউদিয়ার মসজিদের ধূলিস্বাৎ	ঝাউদিয়ার মসজিদের ধূলিস্বাদ
১০২	২৯	বর্ণিল পেখম এবং উড় উড়	বর্ণিল পেখম এবং উড়ু উড়ু
১০৪	১৯	এই দেখো আমার শারীর কেবলই মাটিময়	এই দেখো আমার শরীর কেবলই মাটিময়
১০৫	১৯	ঘুঘুটি উড়ে যেতেই দাঁতে দাঁতে দাঁদ চেপে দেবু আা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—	ঘুঘুটি উড়ে যেতেই দাঁতে দাঁত চেপে দেবু আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—
১৩৪	১২	তিনি স্থির হয়ে দণাড়াতে পারছেন না,	তিনি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না,
১৩৪	১৪	স্কতি নাই	স্বস্তি নাই
১৩৪	১৮-২০	তিনি এবার স্বস্তি ফিরে পেয়ে—যেন-বা প্রচ জলস্রোতের উন্মাদনা থেকে মুক্তি পেয়ে—পায়ের নিচে একখ জমিন পেয়ে হাফাতে থাকেন।	তিনি এবার স্বস্তি ফিরে পেয়ে—যেন-বা প্রচণ্ড জলস্রোতের উন্মাদনা থেকে মুক্তি পেয়ে—পায়ের নিচে একখণ্ড জমিন পেয়ে হাফাতে থাকেন।
১৩৫	১৪	সেই পালায় রাজার ছেলে গাজী-কালু সব চেড়ে-ছুড়ে যে ফাকির হয়ে গেল—	সেই পালায় রাজার ছেলে গাজী-কালু সব চেড়ে-ছুড়ে যে ফকির হয়ে গেল—
১৩৯	৩২	জুলেখা! মোসলেমের প্রতীক্ষায় থেকে হয়ে উঠেছে যেন মোসলেমেরই দমাগ্রস্থ।	জুলেখা! মোসলেমের প্রতীক্ষায় থেকে হয়ে উঠেছে যেন মোসলেমেরই দশাগ্রস্থ।
১৪১	৮	অকস্মাৎ তার মন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে-সেও অরণ্য-নির্জনতার চলে যাবে।	অকস্মাৎ তার মন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে-সেও অরণ্য-নির্জনতায় চলে যাবে।
২৫৯	১	সন্দেহ নেই যে, ফ্রাঞ্জ কাফ্‌কা'র সাহিত্যকীর্তি মধ্যে মধ্যে *মেটামরফোসিস* সর্বাধিক পঠিত আখ্যান।	সন্দেহ নেই যে, ফ্রাঞ্জ কাফ্‌কা'র সাহিত্যকীর্তির মধ্যে *মেটামরফোসিস* সর্বাধিক পঠিত আখ্যান।